রোগীর প্রতি উপদেশ

বা

হাঁপানি, অর্শ, ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ প্রভৃতি যাবতীয়
পুরাতন ও অসাধ্য রোগের একমাত্র প্রতিকার।

বিনা কষ্টে, বিনা ঔষধে, এবং বিনা ব্যয়ে সর্ব্বপ্রকার রোগ হইতে নিশ্চয়রূপে ও
নিঃসন্দেহরূপে আরোগ্য হইবার, স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার, এবং দীর্ঘজীবন লাভ
করিবার অতি সহজ সাধ্য উপায় সকল নানা মত, যুক্তি ও দৃষ্টান্ত
সহকারে চিকিৎসকবিদগ্ধ

শ্রীসতীশচন্দ্র লাহিড়ী, বি, এ, কর্ত্তৃক বিবৃত।

"পাঁপাকল্কির চমৎকার গুণ সম্যকরূপ হৃদয়ঙ্গম কখন হয়? যখন শক্তি যায়।"

সুতরাং

"দেহের মঙ্গলের জন্য প্রকৃতিকে অবাধে আধিপত্য স্থাপন করিতে দাও।"

তজ্জন্য

"প্রকৃতির পথ ধরিয়া চল"

তাহার সুফল

"শত বৎসর পরমায়ু অনায়াসে লাভ কর।"

মুর্শিদাবাদ সৈদাবাদ কণিকা প্রেস হইতে প্রকাশিত।

সন ১৩১৪ সাল।

মূল্য [illegible] টাকা।

সূচীপত্র

নিবেদন।

রোগী এবং সুস্থ ব্যক্তি যাহাতে দেহটী অটুটভাবে রাখিতে পারেন, সেই পথ এই পুস্তকে দেখান হইয়াছে। সকলেই নিরাময় দীর্ঘজীবন আকাঙ্ক্ষা করেন, কিন্তু কি করিলে সেইটী পাওয়া যায়, অনেকেই তাহা জানেন না, অথবা জানিয়াও করেন না। কারণ, স্বাস্থ্যের জন্য সামান্য কষ্ট স্বীকার করিতে অনেকেই কুণ্ঠিত হয়েন, এমন কি, ইচ্ছা পূর্ব্বক স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া অকালে মৃত্যু বা জরা আনয়ন করিতেছেন! একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিতেছেন, "প্রত্যেক মনুষ্য আপন আপন স্বাস্থ্য স্ব-ইচ্ছায় এবং স্ব-চেষ্টায় যে পরিমাণ রক্ষা করিতে পারে, তাহা কোন চিকিৎসকই তাহার হইয়া পারিবে না"। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন মনুষ্যই তাহা করে না, সুতরাং তাহার বিষময় ফল সর্ব্বদেশেই অতি ভয়ানক রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এত চিকিৎসা, এত ঔষধ, এত ডাক্তার, এত কবিরাজ, কিন্তু রোগের স্রোত প্রবল হইতে প্রবলতর চলিয়াছে! এমন লোক নাই যার ব্যারাম নাই! অজীর্ণ বা ডিস্‌পেপ্‌সিয়া, অর্শ বা অন্নাশয়, কাশি অথবা হাঁপানি, অথবা প্রমেহ, এই সকল রোগের কোন একটাকে লইয়া আছেন! পেটের, পাকস্থলের, মূত্রযন্ত্রের অথবা হৃদ্‌পিণ্ডের, ইহাদের কোন না কোন একটীর অসুখ আছেই। শরীর সচ্ছন্দে আছে, এ কথা কেহই বলিতে পারেন

না। ম্যালেরিয়া, কলেরা, বসন্ত ও শারীরিক দুর্ব্বলতা ইত্যাদি রোগ সমুদয় রাজ্যস্থাপন করিয়াছে! এমত অবস্থায় এরূপ একটী উপদেশ গ্রন্থের অত্যাবশ্যক বোধে ইহা প্রচার করিলাম। পাঠ করিয়া এবং উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া ভাল মন্দ বিচার করিবেন। সত্যজ্ঞানে ইহা প্রচার করিলাম। অতি সহজ পরীক্ষায় ইহার সত্যতা সর্ব্বসাধারণ উপলব্ধি করুন।

শরীরের প্রকৃতভাবের বিপরীতকে রোগ বলে; ইহার সাহায্যে সেই বিপরীত ভাবকে দূরে রাখিয়া নিজের জীবন নিজের হাতের মুঠির মধ্যে প্রত্যেকেই রাখিতে পারিবেন; রোগ আদৌ শরীরকে স্পর্শ করিতে পারিবে না, এবং স্পর্শিলেও প্রকৃতভাবের প্রভাবে আপনিই দূরীভূত হইবে। আত্ম-নির্ভরতা শিখিবার ইহা প্রথম ও প্রধান সোপান। সর্ব্ব সাধারণ যাহাতে সেইটী শিখিতে পারে তজ্জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি; এবং জন সাধারণ যে কতদূর পরের বা শূন্যের উপর নির্ভর করে, ও তজ্জন্য কি পরিমাণ অনিষ্ট হয় তাহা পদে পদে দেখাইয়াছি। স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তৎসম্বন্ধে প্রত্যেকেই যে কতদূর উদাসীন, এবং সেই উদাসীনতায় যে কত অনিষ্ট ঘটাইতেছে, এবং ইহাও বলিলে অত্যুক্তি হয় না যে, যে সকল অনেকানেক বিষয় লইয়া প্রত্যেকেই অহর্নিশি চিন্তা করিতেছেন সেগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার চিন্তার সহিত তুলনায় যে কত তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর, এবং চিকিৎসকের হাতে আত্মসমর্পণ করিবার পূর্ব্বে নিজের অবস্থা নিজে বুঝিয়া ব্যবস্থা করা যায় কি না, এই সকল কথা বিস্তারিত ভাবে বলিয়াছি।

সকলের, বিশেষতঃ মা জননীগণের, বোধ সৌকর্য্যার্থে চলিত কথাই অবলম্বন করিয়াছি, সুতরাং ভাষা বা ব্যাকরণ দোষের প্রতি সবিশেষ লক্ষ্য করি নাই; এবং আরও অনেক ত্রুটী থাকিতে পারে। তাহা সত্বেও যদি বক্তব্য বিষয় বুঝাইয়া এক জনকেও এই পথের পথিক করিতে পারি, "অকাল মৃত্যু কপাল দোষে" এই সর্ব্বনেশে অন্ধবিশ্বাস একটী হৃদয় হইতেও যদি সমূলে উৎপাটিত করিতে পারি, এবং "মানো যদি স্বাস্থ্যবিধি, বাঁচ্‌তে পার শতাবধি," এই বিশ্বাসটী তৎস্থানে বদ্ধমূল করিতে পারি, শ্রম সফল মনে করিব।

ঔষধের অপকারিতা সম্বন্ধে যে সকল কথা বলা হইয়াছে, তাহা ভুক্তভোগী রোগীর মত। আমিও ত্রিশ বৎসর রোগে ভুগিয়া, নানামতে রোগের সেবা করিয়া, ঔষধের বিশেষ পরীক্ষা করিয়া, ঐ মত অবলম্বন করিয়াছি। প্রকৃতি যে সময় যেটী চায়, ঠিক সেইটী তাহাকে সেই সময় দেওয়া, অন্তররাজ্যে প্রবেশ না করিয়া কেবল পুঁথিগত বিদ্যা অনুসারে হয় না। এই পুস্তক সাহায্যে আপন আপন অন্তর-রাজ্যে স্থূলভাবে প্রবেশ করিয়া দেখুন, চিকিৎসকের ব্যবস্থা ও প্রকৃতির আকাঙ্ক্ষা এই দুইয়ের মধ্যে কত বৈষম্য! চিকিৎসা-সঙ্কটের এই ঘোর দুর্দ্দিনে পশ্চা-লিখিত উপদেশগুলি রোগীর চক্ষু ফুটাইবে; বালক, বৃদ্ধ, ও যুবককে স্বাস্থ্যের পথে আলো ধরিয়া লইয়া যাইবে।

আপনি (পাঠক মহাশয়) রোগী কি না, তাহা এই পুস্তক পাঠে বিশেষরূপে অবগত হইবেন। এবং সুস্থদেহী যদি কেহ থাকেন,

এবং তাঁহার হস্তে দৈবাৎ যদি এই পুস্তকখানি পতিত হয়, এবং তিনি বিমনা হইয়া, ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া বিরক্তি সহকারে যদি ইহা পাঠ করেন, তিনিও দর্পণে প্রতিবিম্বের ন্যায় স্পষ্ট দেখিবেন, অজ্ঞাতসারে আত্ম-হত্যার পথে কত দূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছেন! তখন প্রত্যেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃতির প্রদর্শিত পথে আসিতে চেষ্টা করিবেন, প্রত্যেক চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ টাকার উপকার পাইবেন, যাহা পাইবার জন্য আকাশ পাতাল অন্বেষণ করিয়া বেড়াইতেছেন, যাহা কখন কোন ডাক্তার বা কবিরাজের নিকট পান নাই এবং পাইবার সম্ভাবনাও খুব কম।

পরিশেষে কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইতেছি যে, মদগ্রজ শ্রীপ্রকাশচন্দ্র লাহিড়ী এল, এম, এস, ডাক্তার মহাশয় এবং কবিরাজ শ্রীশ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় আমাকে যথেষ্টরূপে সাহায্য করিয়াছেন। এবং যে সমুদয় মহানুভাগণের মতাবলম্বনে এই পুস্তক প্রণীত হইল, পুস্তকের ২১৬।২১৭ পৃষ্ঠায় তাহার একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা দিয়াছি। সকলের নিকট চিরঋণী রহিলাম। ইতি সন ১৩১৪ সাল, ভাদ্র মাস।

সাহানগর ;
মুর্শিদাবাদ। } শ্রীসতীশচন্দ্র লাহিড়ী।

Estd:-1919.

রোগীর প্রতি উপদেশ।

-oo-

"পথ্যবিহীন রোগীর শত সহস্রপ্রকার ঔষধেও কোন উপকার হইবে না।" এই কথাটি নূতন নহে, আপনি অনেকবার শুনিয়াছেন; এবং পথ্যাদির নিয়ম অর্থাৎ সুপথ্য কি কি, ও কুপথ্য কি তাহাও বোধ হয় আপনার অবিদিত নাই। সুতরাং ঐ সম্বন্ধে কয়েকটী প্রশ্ন করিতেছি, ঠিক্ ঠিক্ উত্তর দিয়া বাধিত করিবেন।

১। আহার করিতে আপনার কয় মিনিট সময় লাগে? (একটী ঘড়ি সম্মুখে রাখিয়া আহার করিতে বসিলে সময়টী ঠিক বলিতে পারিবেন)।

২। আহারের সময় কয়বার জলপান করেন ও পরে কয়বার? এবং প্রত্যেক বারের পরিমাণ কত? (একটি মাপ্‌সই গ্লেলাস ব্যবহার করিলে জলের পরিমাণ ঠিক বলিতে পারিবেন)।

৩। সকালে, বৈকালে ও রাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ কয়বার আহার করেন, ও কি কি জিনিস আহার করেন?

৪। আহারের পরিমাণ কত হইবে? (প্রত্যেক বারের)।

৫। দাস্ত কিরূপ হয়? একবারে পরিষ্কার রূপে মল নির্গত হইয়া যায়, না থাকিয়া থাকিয়া বাহির হয় ও তজ্জন্য কুন্থন দিতে হয়, ও বসিয়া থাকিতে হয়? পশু পক্ষীদের মলত্যাগ বোধ হয় আপনি দেখিয়াছেন। তাহাদের মলত্যাগ কেমন সহজে ও একেবারে হইয়া যায়, মলত্যাগের পর তাহাদের মলদ্বার যেমন পরিষ্কার ছিল তেমনি থাকে, সেইরূপ আপনার দাস্ত সহজে ও একেবারে ও বিনা কুন্থনে বাহির হইয়া যায় কি না, এবং দাস্ত শেষ হইলে মলদ্বারে মল লাগিয়া থাকে কি না।

৬। মলত্যাগ করিতে কয় মিনিট সময় লাগে?

৭। দিবা রাত্রে সর্ব্বশুদ্ধ কয়বার দাস্ত হয়?

৮। দাস্ত শক্ত, পাতলা, না কতক শক্ত ও কতক পাতলা হয়। অতিশয় দুর্গন্ধ আছে কি?

৯। স্নানের নিয়ম কিরূপ? কোন সময় স্নান করেন?

১০। পরিশ্রম কিরূপ, অর্থাৎ কি কাজ করেন।

১১। নিদ্রা কেমন হয়? স্বপ্ন দেখেন কি?

১২। উপবাস করেন কি?

১৩। সুন্দরী ও যুবতী স্ত্রীলোক দেখিলে মনে কিরূপ ভাব হয়? ও সে ভাব কতক্ষণ থাকে? এক বার দেখিয়া পুনশ্চ দেখিবার স্পৃহা হয় কি?

১৪। স্ত্রী সহবাসের নিয়ম কিরূপ; অর্থাৎ কোন সময়ে এবং মাসে কয়বার স্ত্রী গমন করেন?

১৫। আপনার বয়স কত?

১৬। সর্ব্বদা গাত্রে জামা যোড়া থাকে কি?

১৭। রাত্রে শয়ন কালে ঘরের সমুদয় দরজা ও জানালা বন্ধ থাকে কি?

১৮। নিশ্বাস ও প্রশ্বাস কিরূপ হয়? দুইটাই সমান, না একটি ছোট একটি দীর্ঘ। ছোট বড় হইলে কোনটী ছোট ও কোন্‌টি দীর্ঘ?

১৯। কি রোগ আপনার হইয়াছে? ও সেই রোগে আপনার কি কি কষ্ট হইতেছে?

২০। প্রস্রাব কয় বার হয়? রং কিরূপ?

২১। ধূমপান, অহিফেন, মদ্য, অথবা কোন প্রকার নেশার বশীভূত হইয়াছেন কি?

এতগুলি প্রশ্নের উত্তর দিতে আপনার নিশ্চয়ই বিরক্তি বোধ হইবে, অতএব ১৬।১৭।১৮ ও ১৫। এই পাঁচটী সহজ প্রশ্নের উত্তর দিবেন, তাহা হইতেই আপনার অবস্থা বুঝিতে পারিব। তবে এতগুলি প্রশ্ন করার তাৎপর্য্য কি? এখন একটী একটী করিয়া মীমাংসা করা হউক।

১। চর্ব্বণ।

একজন বলিলেন, "আহার করিতে আবার সময় কি লাগে, বসিতে যা দেরি!" আর একজন বলিলেন, পাঁচ মিনিট, কেহ বলিলেন দশ মিনিট, ঊর্দ্ধ সংখ্যা পনর মিনিটের অধিক লাগে না। ইহাতে বুঝা গেল যে, কেহ কেহ আহার মুখে দিয়াই গলাধঃকরণ করেন, এবং কেহ কেহ উহা বার কয়েক মুখের ভিতর আলোড়িত করিয়া উদরসাৎ করেন। রীতিমত চর্ব্বণ করিয়া মুখের দলাকে মাখনের মত নিষ্পেষিত এবং আস্বাদরহিত করিয়া শতকরা একজনও আহার করেন কি না সন্দেহ।

অভ্যাসের দোষ চিরকাল থাকিয়া যায়। পড়ার জন্য শিশুরা তাড়না খায়, কিন্তু তাহারা তাড়াতাড়ি খাইয়া স্কুলে যায় তজ্জন্য কেহ কিছুই বলেন না। এমন কি, মাতা তাঁহার সন্তানদের খাওয়াইবার সময় বলেন "যে ভাল ছেলে হবে সে সকলের আগে খাবে।" সেই তাড়াতাড়ি খাওয়ার অভ্যাস চিরকাল থাকিয়া যায়। তাহার ফলে কি হয়? দন্ত ও মুখের লালা যদি ষোল আনা কাজ না করে তবে তাহাদের কার্য্য পাকস্থলীকে করিতে হইবে। পাকস্থলী এইরূপ অতিরিক্ত কার্য্য এক দিন দুই দিন, অথবা এক বৎসর দুই বৎসর, অথবা অবস্থা বিশেষে আরও কিছুকাল অতি কষ্টে করিতে পারে, তাহার পর আর পারে না; ক্রমশঃ পেটের পীড়ার সূত্রপাত হইতে থাকে; কোষ্ঠ-

বদ্ধ, অজীর্ণ, পাত্‌লা দাস্ত ও আনুসঙ্গিক আরও কত কি দেখা দেয়। চিকিৎসক আসিয়া ব্যবস্থা করিতে থাকেন; দর্শনীতে এবং ঔষধের মূল্যে মাসে মাসে বিস্তর টাকা খরচ হইতে থাকে। একটী অশ্ব স্বাভাবিক অবস্থায় অনায়াসে দশ ক্রোশ বেশ দৌড়িতে পারে; আমার প্রয়োজন মত তাহাকে মদ খাওয়াইয়া যদি প্রত্যহ পঁয়ত্রিশ ক্রোশ দৌড়াইয়া লই তবে সে অশ্ব কয় দিন বাঁচিতে পারে? পাকস্থলীও ঔষধের জোরে সেইরূপ কার্য্য করে, কিন্তু কয় দিন? জীবনীশক্তি ক্রমেই কমিতে থাকে, তখন অল্পে আর কাজ হয় না, ঔষধের মাত্রা ক্রমেই বাড়াইতে হয়, শেষে পাকস্থলী বিনা ঔষধে, অর্থাৎ উত্তেজিত না হইলে আর কার্য্যই করিতে পারে না। রোগী এমত অবস্থায় একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে এবং চিকিৎসক ও আত্মীয় স্বজনের অতীব চিন্তার কারণ হয়। চিকিৎসক এখন অহিফেন, অথবা মদ্য, অথবা তেজস্কর ব্রাণ্ডি, অথবা তাঁহার ব্রহ্মাস্ত্র সদৃশ ঔষধি দিয়াও কোন ফল পাইতেছেন না। সুতরাং বলেন, "ওহে, পশ্চিমে যাও কাজ কর্ম্ম ছাড়, কিছু দিন বেড়িয়ে এস" (অর্থাৎ "প্রাকৃতিক নিয়মে থাক, ঔষধে আর ফল হইবে না।") যত প্রকার ঔষধ ছিল তাহার সমস্তই চিকিৎসক রোগীর শরীরের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, শরীর এক্ষণে এত ভগ্ন হইয়াছে যে, আর পরীক্ষা করা চলে না, অথবা রোগ এমন কঠিন ও জটিল হইয়া পড়িয়াছে, যে, তাহার ঔষধ পাঁজি পুঁথি হাতড়াইয়া মেলে না, অথবা সামান্য একটি সারাইতে গিয়া গুরুতর একটা হইয়া দাঁড়াইল, তখন চিকিৎ-

সক মহাশয় নিরস্ত হইলেন। রোগীও মনে করিল, "চিকিৎসায় আমি ক্রটী ত করিলাম না, এখন পশ্চিমে যাই" ; তথায় যাইয়া অপেক্ষাকৃত ভাল জল ও বায়ুর গুণে কিছু উপকারও হইল, ফিরিয়া আসিল এবং মনে করিল রোগ ভাল হইয়াছে। কিছু দিন বেশ চলিল তারপর আবার সেই চিকিৎসক ডাকা ও ঔষধ ও অর্থব্যয় আরম্ভ হইল। এবং শেষে পুনরায় পশ্চিমে যাওয়া। অর্থাভাবে কেহ কেহ বিরক্ত হইয়া ঔষধ ত্যাগ করিয়া সময়ে সময়ে ভাল থাকেন, আবার কিছু অর্থাগম হইলেই ভুলিয়া যান কেন ভাল ছিলেন ; সুতরাং ব্যারাম দেখা দেয়; এবং উহা ঔষধ দ্বারা নিবারণ করিতে গিয়া পুনরায় আস্তে আস্তে পোষণ করিতে থাকেন। ঔষধ ও চিকিৎসকেরউপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া কিরূপে রোগটিকে পোষণ করিতে থাকেন তাহা পরে ক্রমে ক্রমে বুঝাইয়াছি।

এই প্রকার ব্যাপার ত আজীবন হইতে থাকে, তথাপি মনে উদয় হয় না, "কেন এরূপ কষ্ট হইতেছে ?" এক পয়সায় একটী হাঁড়ি ক্রয় করিবার সময় হাঁড়িটী সাতবার বাজাইয়া লওয়া হয়, এবং উহা আশানুরূপ কাল স্থায়ী না হইলে হাঁড়ি বিক্রেতাকে কতই ভৎর্সনা করিয়া থাকেন, অথচ চিকিৎসক ও ঔষধে এত টাকা দিয়া একবারও মনে হয় না "ঔষধ শরীরের আনুকুল্য করিতেছে, না বিরোধী হইতেছে।" এক দিন ভাত না খাইয়া বাঁচিয়া থাকা সম্ভব হইতে পারে, কিন্তু ঔষধ না হইলে এক দণ্ডও চলে না এই ভুল বিশ্বাস এবং দেহরূপ কলটিকে কি করিয়া চালা-

হইতে হয় তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা, এই দুইটী কারণে জন সমাজের এবং দেশের মহা অনিষ্ট হইতেছে।

মহাশয়, বুঝিতেছেন কি, রোগের মূল কারণ কোথায়? এবং তাহার চিকিৎসা কোথায়? প্রত্যহ আপনি রীতিমত চর্ব্বণ না করিয়া খাইয়া রোগের বীজ বপন করিতেছেন, সে দিকে দৃষ্টি নাই; ঘরে ময়লা হইতে দিয়া এবং তাহা থাকিতে দিয়া বিষ প্রয়োগে মশা মারিতে গেলে কি মশা মরে? মূলে আপনি পাঁচ দশ অথবা পনর মিনিটের অধিক কাল ধরিয়া আহার করিবেন না, আপনার রোগ সারিবে কি প্রকারে। আহার করাটা কি এতই বিরক্তি জনক কাজ যে তাহাতে পনর মিনিটের অধিক সময় ব্যয় করা যায় না! এত অর্থনাশ, এত শারীরিক ক্লেশ হইতেছে, তবুও অভ্যাসের দাস পূর্ব্ববৎ! আহারের উপর জীবন, তথাপি সেই আহার ক্রিয়া প্রকৃতি বিরুদ্ধ! মুখ হইতে আরম্ভ হইয়া দাস্ত হওয়া পর্যন্ত খাদ্য বস্তুর পরিপাক ক্রিয়া হয়। মুখের কার্য্যটী অবহেলা করিলে অবশেষে কি রূপ কষ্ট পাইতে হয় তাহা সংক্ষেপতঃ প্রথমে বলিয়াছি, অতএব প্রত্যেক গ্রাস এমন করিয়া চর্ব্বণ করিতে হইবে যেন খাদ্যের প্রত্যেক কণা সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত ও লালার সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরে প্রবেশ করে।

আহার চর্ব্বণের উপর জীবন এবং গিলিয়া খাইলে মরণ, এই রূপ মনে করিয়া আহার করিবেন। একটী কণাও যদি গোটা

অথবা শুষ্ক অবস্থায় উদরে প্রবেশ করে, তজ্জন্ত পাকস্থলীকে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিতে হইবে, এবং তাহার ফলে আপনাকে ভুগিতে হইবে এই রূপ বিবেচনা করিয়া আহার করিতে বসিবেন।

পাশ্চাত্য দেশের এক জন প্রধান চিকিৎসক বলেন "আহার মুখে দিয়া ক্রমাগত চর্ব্বণ কর, যতক্ষণ আস্বাদ পাইবে ততক্ষণ উহা চর্ব্বণ করিবে, চর্ব্বণ করিতে করিতে মুখের দলা নিষ্পেষিত ও আস্বাদ রহিত হইয়া আপনিই লালাযোগে কণ্ঠে এবং কণ্ঠের নিম্নদেশে নামিয়া যাইবে, তোমাকে জোর করিয়া বা কষ্ট করিয়া উহা গিলিতে হইবে না"। বাস্তবিক চিন্তা করিয়া দেখুন, চর্ব্বণ করিয়া খাওয়াই ভোজনের সুখ কি না। আমার কোন আত্মীয়ের ছয় বৎসরের একটী শিশু অতি ধীরে ধীরে আহার করিত, তাহাকে খাওয়াইয়া দিতে প্রায় একঘণ্টা সময় অতি-বাহিত হইত, তাহা অতীব বিরক্তি জনক বোধ হইত; শিশুকে ধম্‌কাইয়া শীঘ্র শীঘ্র খাইতে বলা হইত; সাত আট বৎসর বয়সের সময় সে তাড়াতাড়ি গিলিয়া খাইতে শিখিল। এক বৎসরের মধ্যেই তাহার শরীর অনেক পরিমাণ লাবণ্যহীন হইয়া গেল। আর একটী ঐরূপ শিশুর কথা মনে পড়ে; ভয়ে ভয়ে দুই তিন দলা গিলিয়া খাওয়ার পর একটি দলা মুখে লইয়া সে উঠিয়া গিয়া একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিত; সেই সময়ের মধ্যে ঐ দলাটীকে খুব ধীরে ধীরে খাইয়া আসিত; ক্রমে ক্রমে তাড়াতাড়ি খাওয়া অভ্যস্ত হইল। তখন জননী বলেন "এত দিন

পরে ছেলে আমার খাইতে শিখিল"। ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া খাওয়াই ত খাদ্যের সুখ, কিন্তু সে সুখ হইতে জননীই তাঁহার সন্তানকে ঐরূপে অজ্ঞতাবশতঃ বঞ্চিত করেন, এবং সেই সঙ্গে শিশুর জীবনের সুখ পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দেন। পরে যখন সন্তানের অসুখ হয়, জননীর মুখ শুকাইয়া যায়; তখন তাঁহার মনেও হয় না যে, তিনিই তাঁহার সন্তানের খাদ্য সুখের সহিত জীবনের সুখ হরণ করিয়া লইয়াছেন। প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণ করিতে তিনিই অজ্ঞান বশতঃ শিক্ষা দিয়াছেন, তাহার কুফল নিবারণ করিতে আরও প্রতিকূলাচরণ করিয়া একেবারে সম্পূর্ণরূপে প্রকৃতির বিপরীত অবস্থায় আনয়ন করিয়াছেন।

বৃহৎ বৃহৎ কাষ্ঠ খণ্ড যদি ক্রমাগত একটি অগ্নিকুণ্ডের উপর নিক্ষেপ করেন, তবে সে অগ্নি নিবিয়া যায়, আবার সেই কাষ্ঠখণ্ডকে কুঠারাঘাতে খণ্ড খণ্ড করিয়া অগ্নিকে দেওয়া হইলে অগ্নি আরও প্রজ্বলিত হয়; সেইরূপ জঠরাগ্নি প্রজ্বলিত রাখিতে হইলে দন্তদ্বারা আহারের দলাকে অগ্রে নিষ্পেষিত করিয়া পরে উদরে দিতে হইবে। উদরের মধ্যে দন্তের ন্যায় এমন কোন একটা যন্ত্র নাই যদ্দারা আপনার খাদ্যবস্তু উদরের মধ্যে চর্ব্বিত হইবে। অর্থের জন্য, কামনার জন্য কতকষ্ট সহ্য করেন, আর জীবনের জন্য কি এই টুকু করিতে পারিবেন না? অর্থচিন্তা, আপনার আত্মীয় স্বজনগণের জন্য চিন্তা মজ্জাগত ও আত্মগত করিয়া ফেলিয়াছেন, আর সর্ব্বসুখের মূলাধার যাহা, তাহাকে কি আত্মগত করিতে পারিবেন না? সর্ব্বদা মনে করিবেন, অন্য বিষয় চিন্তার সঙ্গে সঙ্গে, যে, "আহার

ক্রিয়া অদ্য কিরূপ করিয়াছি"। খাইতে বসিয়া প্রতিজ্ঞা করিবেন; "প্রত্যেক গ্রাস এক শত বার আস্তে আস্তে মুখের ভিতর চর্ব্বণ করিব," এবং আহার মুখে দিয়া ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিবেন ও এক দুই করিয়া চর্ব্বণগুলিকে গণিতে থাকিবেন। এইরূপে একশত চর্ব্বণ পর্য্যন্ত গণিয়াও যদি আহার সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত, আস্বাদ রহিত ও লালা মিশ্রিত না হয় তবে আরও চর্ব্বণ করিবেন, অর্থাৎ যতক্ষণ মুখের দলা লালা মিশ্রিত এবং সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত এবং আস্বাদরহিত না হয় ততক্ষণ চর্ব্বণ করিতে হইবে। যাঁহাদের সমুদয় দন্ত পড়িয়া গিয়াছে, তাঁহারা মাড়ীর সাহায্যে যে যে খাদ্যবস্তু নিষ্পেষিত করিতে পারেন, সেই সেই খাদ্যবস্তু উক্তরূপে চর্ব্বণ করতঃ আহার করিবেন। এইরূপ সাত দিন করিয়া দেখিবেন, কি অত্যাশ্চর্য্য ফল লাভ করেন। দেখিবেন, প্রকৃতির কি অদ্ভুত ক্ষমতা! তখন বুঝিবেন, রোগের প্রতিকার আপনার নিজের কাছেই আছে, এবং তাড়াতাড়ি খাওয়ার কু-অভ্যাস ছাড়িবার চেষ্টা করিবেন ও আস্তে আস্তে অধিক সময় ধরিয়া চর্ব্বণ করিয়া খাওয়ার সুঅভ্যাস আরম্ভ করিতে থাকিবেন; আর দিন দিন উপলব্ধি হইবে, "হায়, অনর্থক এত অর্থব্যয় করিয়াছি! অন্ধের ন্যায় চলিয়াছি এবং চালিত হইয়াছি! নিজের পায়ে দাঁড়াইতে জানিতাম না"! ক্রমশঃ আত্মনির্ভরতা আসিবে ও শেষে উহা এতই প্রবল হইবে যে, বিনা চিকিৎসকের সাহায্যে পীড়ার হস্ত হইতে উদ্ধার পাইবেন। শরীরে স্ফূর্ত্তি আসিবে এবং মনে হইবে, "কেন মনুষ্যের পূর্ণ পরমায়ু পাইব না?" বাস্তবিক চিন্তা করিলে

মনে হয় যে, আজ কাল মনুষ্যের পঞ্চাশ বৎসরের অধিক না বাঁচার কারণ প্রকৃতির বিপরীত ভাবে জীবন যাপন ব্যতীত আর কিছুই নহে। কয়জন লোক অর্দ্ধ, তিনপোয়া, অথবা পূর্ণ এক ঘণ্টা ধরিয়া আহার করেন? এবং তাহার মধ্যেই আবার কয়জন দন্তের চর্ব্বণ ক্রিয়া সম্যক্ রূপে হয় এমন উপযুক্ত খাদ্যদ্রব্য ভোজন করেন? কয়জন লোক দাঁত থাকিতে দাঁতের মর্য্যাদা করে? এই প্রকৃতি বিরুদ্ধ কর্ম্মের ফল বিষয় চিন্তা করিতে করিতে একজন ডারউইন (Darwin) মতাবলম্বী চিন্তাশীল ব্যক্তি বলিয়াছেন যে, কতিপয় সহস্র বৎসর পরে মনুষ্য দন্তহীন জীব হইবে। চীনদেশে একটি চলিত কথা আছে "A man digs his grave with his own teeth" অর্থাৎ, "যে খুব না চিবিয়ে খায় গিলে, সে যায় অকালে কাল কবলে।" তদ্ব্যতীত লোভে পড়িয়া অতিরিক্ত ভোজন ও কুপথ্য সেবন তো আছেই; এসকল কথা পরে ক্রমশঃ বলা যাইবে।

একটী লোক তাঁহার বৈষয়িক কোন বিশেষ কার্য্যের অনুরোধে একটী পার্ব্বত্য প্রদেশে গিয়াছিলেন, তথায় জন মনুষ্য নাই; আহারও কিছু মেলে না; তাঁহাকে মটর ও অন্যান্য রবিশস্য খাইয়া জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল, প্রাতে মটর গালে দিতেন। মুখের রসে উহা ভিজিয়া নরম হইলে তখন চর্ব্বণ করিয়া খাইতেন। তিন মাস কাল এই রূপে তথায় অবস্থান করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। দেশে গিয়া পূর্ব্ব অভ্যাস মত আহারাদি করায় মধ্যে মধ্যে অসুখ হইতে লাগিল, তখন তিনি বুঝিতে পারিলেন

যে, পার্ব্বত্য প্রদেশে যেরূপ সুস্থ শরীরে ছিলেন সেরূপ আর কখনও থাকেন নাই। তখন উপলব্ধি করিলেন, প্রকৃতির অনুযায়ী আহার হইয়াছিল বলিয়া সেই পার্ব্বত্য প্রদেশে ভাল ছিলেন। সেই অবধি তিনি রন্ধন না করিয়াও খাওয়া যাইতে পারে এমন খাদ্য যথা, শস্যাদি ও ফলমূলাদি, ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করতঃ এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া আহার আরম্ভ করিলেন; ক্ষুধা অনুসারে খাইতেন, এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে কখনও খাইতেন না; পিপাসা হইলে জল এবং আবশ্যক মত দুগ্ধ পান করিতেন। এইরূপ ভাবে যে কয় জন জীবন যাপন করিয়াছেন তাঁহারা প্রত্যেকেই সুস্থ শরীরে প্রায় এক শত পঞ্চাশ বৎসর বাঁচিয়াছেন। অতএব প্রত্যেকেরই উচিত যেন মুখে এক গ্রাস আহার দিয়া একশত বার ধীরে ধীরে উহা চর্ব্বণ করেন, এবং একঘণ্টা কাল ধরিয়া আহার করেন। এইরূপ করিলে অনেক চিন্তা, অনেক অর্থব্যয়, এবং শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন। চর্ব্বণের আবশ্যকতা ও উপকারিতা সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা এবং কোন্ কোন্ জিনিস আহার করা উচিত, ও কত পরিমাণ আহার করা আবশ্যক, অর্থাৎ পথ্যাদির অন্যান্য নিয়ম ক্রমশঃ বলা যাইতেছে।

২। জলপান।

—০—

কথায় বলে "খাওয়ার দোষে ব্যারাম হয়"। খাওয়ার দোষে তত নয় যত খাওয়ার প্রক্রিয়ার দোষে। প্রথমতঃ রীতিমত চর্ব্বণ করিয়া আহার করার অভ্যাস নাই। রীতিমত চর্ব্বণ করিয়া আহার করিলে প্রত্যেকেরই আহারের পরিমাণ বোধ হয় অর্দ্ধেক কমিয়া যায়। পাশ্চাত্যদেশে কোন একটী যুদ্ধের সময় এক দল অবরুদ্ধ সৈন্যের রসদ ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, অবশিষ্ট রসদে অধিক দিন চলিবে না দেখিয়া সৈন্যাধ্যক্ষ এই আদেশ দিলেন, "প্রত্যেক সৈনিককে অর্দ্ধেক খোরাক দাও, আহার করিতে যতক্ষণ সময় লাগিত, এক্ষণে সেই সময়টি আহার ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করিয়া পূরণ করা হউক"। আজ্ঞামত সৈন্যগণ অর্দ্ধেক খোরাক পাইয়া ধীরে ধীরে চর্ব্বণ করতঃ অনেকক্ষণ ধরিয়া আহার করিতে লাগিল। ফলে শরীরের কোনই হানি হইল না; অধিকন্তু চিরকালের অভ্যস্ত অতিরিক্ত আহারের জন্য পাকস্থলীর যে একটী অতিরিক্ত কার্য্য ছিল, তাহা এই অর্দ্ধেক খোরাক রীতিমত চর্ব্বিত হওয়ায় থাকিল না, সুতরাং জীবনীশক্তি অপ্রতিহত হইয়া শরীরে অধিক স্ফূর্ত্তি ও বল আনয়ন করিল। কিন্তু এই অতিরিক্ত খাদ্যের বোঝা প্রত্যেকেই বহন করিতেছেন। বহন না করিতে পারিলেই মহা চিন্তা ও উদ্বেগ উপস্থিত হয়। অতিরিক্ত মোট ঔষধ

দিয়াই হউক বা যে কোন অস্বাভাবিক উপায়েই হউক, বহন করিতেই হইবে! এই রূপ ভারাক্রান্ত হইয়া যদি কেহ চল্লিশ বৎসর বা পঞ্চাশ বৎসর অথবা কেহ কেহ ৬০ বৎসর বা ৭০ বৎসর চলিতে পারে, তবে ভারটী সরাইয়া লইয়া জীবনীশক্তিকে অপ্রতিহত রাখিতে পারিলে কেন তাহার দ্বিগুণ চলিতে পারিবে না? আহারের প্রক্রিয়ার দোষের সহিত সর্ব্বপ্রকার ব্যারামের কারণ উপস্থিত হয়।

দ্বিতীয়তঃ আহারের সময় ঘটী ঘটী জল পান করা, অথবা খাদ্যকে লালার সাহায্যে উদরস্থ না করিয়া জলের বা ঝোলের সাহায্যে উদরস্থ করা। এখানেও মূল কারণ কুশিক্ষা ও অভ্যাস দোষ। জননীদিগকে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় যে, ছেলেদের যত শীঘ্র খাওয়াইতে পারেন ততই যেন তাঁহারা আপনাদিগকে খুব কাজের লোক বিবেচনা করেন। ছেলে হয়তো ভাতের দলা মুখে করিয়া বসিয়া আছে, কিম্বা সম্ভবতঃ লালা নির্গমনের জন্য ধীরে ধীরে মুখের ভিতর আলোড়িত করিতেছে, মাতা বিরক্ত হইয়া অথবা অধীর হইয়া তিন চারি ঢোক জল খাওয়াইয়া অথবা ব্যঞ্জন যোগে তরল করিয়া, সেই দলা গলাধঃকরণ করাইলেন। এই রূপে শৈশব কাল হইতে ভাত খাইবার সময় জল খাওয়ার কুঅভ্যাস যে হইল তাহা আর জনমে ঘুচিল না। এখন "রোগের জ্বালায় মরিলাম গেলাম" বলিয়া চীৎকার করিলে কি ফল হইবে? চিকিৎসক আনয়ন করিয়া অকাতরে অর্থব্যয় করিতে পারেন, আর আহারের সময় জলপানের কুঅভ্যাসটা

ছাড়িতে পারিবেন না ? অবশ্য পারিবেন। প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিলে তাহার কুফল অবশ্যম্ভাবী, এটী যেন সর্ব্বদা মনে থাকে। খাইবার সময় জলপান করিলে কি অনিষ্ট হয় ও তাহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ কেন ? আহার করিবার সময় আমাদের মুখ হইতে যে লালা নির্গত হয়, ও আহারের সহিত মিশ্রিত হইয়া উদরে যায় তদ্দ্বারা খাদ্য দ্রব্য পরিপাক হয়। লিভার (যকৃৎ) ও পাকস্থলী হইতেও ঐ প্রকার পদার্থ নির্গত হইয়া ভুক্ত বস্তুর পরিপাক করে ; এবং অন্ত্র মধ্য হইতে যে রস বাহির হয় তদ্দ্বারা পরিপাক ক্রিয়ার সমাপ্তি হয়। পরিপাক এই তিন প্রকার রসের দ্বারা হয় ; প্রথমতঃ মুখের রস, দ্বিতীয়তঃ লিভার ও পাকস্থলীর, ও সর্ব্বশেষে অন্ত্রমধ্য হইতে যে রস বাহির হয় তাহা দ্বারা পরিপাক ক্রিয়া সম্পূর্ণরূপে হইয়া খাদ্যের মলভাগ, মলদ্বার, প্রস্রাবদ্বার ও লোমকূপ দিয়া বাহির হইয়া যায়, এবং সার ভাগ আমাদের শরীরকে পুষ্ট করে। এই সকল রসকে কথায় বলে "পেটের আগুন ;" এই স্বাভাবিক আগুনকে যদি আপনি ক্রমাগত বাল্যকাল হইতে অস্বাভাবিক রূপে জল দিয়া নির্ব্বাপিত করেন তবে আপনার পরিপাক হইবে কি করিয়া এবং কি প্রকারে আপনি বাঁচিবেন ? এবং কয় দিন বাঁচিবেন ? আহারের সময় জলপান অতীব অপকারী ; তাহাতে সুস্থদেহীরও অজীর্ণ রোগ হইবে, এবং যাঁহারা অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন, তাঁহাদের পক্ষে আহারের সময় জলপান বিষপান তুল্য, ইহা বলাই বাহুল্য। বিজ্ঞান সম্মত এ কথাটী অনেকেই জানেন, কিন্তু কেহ কি সেই মত কার্য্য

করিয়া থাকেন? অথচ ভাল থাকিবার ইচ্ছা সকলেরই ত আছে। শরীরকে সুস্থ রাখিতে কে না চায়?

আমার একটী আত্মীয় নানা রোগে কষ্ট পাইতে ছিলেন, তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন "আমি সকল কষ্ট সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি যদি তদ্দ্বারা ভাল হই"। আমি এক দিন তাঁহাকে কতকগুলি উপদেশ দিয়া বলিলাম,"আপনি কেবলমাত্র এই একটী সহজ নিয়ম পালন করুন যে, খাইবার সময় কখনও জল পান করিবেন না। আহারের অন্ততঃ এক ঘণ্টা পরে পিপাসা না লাগিলেও গরম জল অথবা গরম জল শীতল করিয়া পান করিবেন"। তিনি আমার সম্মুখেই কোন কোন দিন আহার করিতেন, এবং আহার করিতে করিতে বলিতেন, "দেখ আমি খুব চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্চি"। আমি যে দিন সম্মুখে থাকিতাম সেই দিনই তাঁহার চিবাইয়া খাওয়া হইত,অন্য দিন হইত না। দশ বার দিন পরে বলিলেন, "খাওয়ার সময় জল না খেয়ে কিছুতেই থাকিতে পারি না"। পারিবেন কি করিয়া? কথিত নিয়ম মত চর্ব্বণ করিয়া যদি খাদ্যের প্রত্যেক কণা লালার সাহায্যে উদরস্থ করিতে পারিতেন, অর্থাৎ জিহ্বার মূল ও চোয়ালের মূলস্থিত দুইটী স্থান এবং কর্ণের মূলস্থিত চারিটী স্থান এই ছয়টী স্থান (six salivary glands) হইতে চর্ব্বণ ক্রিয়ার সময় যে রস নির্গত হয় সেই রসের সাহায্যে যদি প্রত্যেক কণা উদরস্থ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে মুখের আহার জল সাহায্যে কণ্ঠতলগত করিতে হইত না। উক্ত ছয়টি স্থান বা যন্ত্র হইতে সমস্ত দিন মানে প্রায় দেড় সের লালা উৎপন্ন করিতে পারা যায়। সেই

দেড় সের রস কয়জন বাহির করেন? যিনি যৎ সামান্ত উৎপন্ন করেন তাহাও আবার জলপানের দোষে অর্থাৎ আহারের সময় জলপান করায় জলের সহিত মিশ্রিত হইয়া কার্য্যকরী হয় না। সুতরাং পরিপাকের জন্য এই প্রথম রসের অভাব কে পূরণ করিবে?

অজীর্ণ জনিত নানাপ্রকার রোগে, বিশেষতঃ অম্লরোগে দিনের আহারের মধ্যে জল না খাইয়া উষাপান করিলে বিশেষ উপকার হয়। আমাদের শাস্ত্রে বলিতেছে—

জলস্যসঃ প্রসৃতানষ্টৌ পিবন্ রবৌ অনুদিতে।
বাতপিত্ত গদান্ হত্বা জীবেৎ বর্ষশতং নরঃ ॥•

অর্থাৎ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে অর্দ্ধ সের জল প্রতিদিন পান করিলে বায়ু পিত্ত জনিত সমস্ত রোগ দূর হইয়া মনুষ্য শতবর্ষ আয়ু প্রাপ্ত হয়। যাহাদের কফের ধাতু উষাপান দ্বারা তাহাদের প্রথম প্রথম সর্দ্দি বোধ হইতে পারে কিন্তু নাসিকা বন্ধ করিয়া জলপান করিলে কফ বৃদ্ধি হয় না।

জানিয়া শুনিয়া এবং বুঝিয়াও এই সহজ নিয়মটি তিনি পালন করিতে পারিলেন না। তদুপরি আরও অনিয়ম হওয়ায় (যাহা পরে বিবৃত হইবে) অকালে কালকবলে পতিত হইলেন। অথচ এই লোক অর্থের জন্য শরীরকে যৎপরোনাস্তি কষ্ট দিয়াছেন, কিন্তু জীবনের জন্য আমি যে টুকু করিতে বলিয়াছিলাম তাহা পারেন নাই। সুতরাং কুঅভ্যাস যে কতদূর বদ্ধমূল হইয়া যায় তাহা এই দৃষ্টান্তেই বুঝিতে পারিলেন। এক্ষণে এই কুঅভ্যাসকে

দুর করিতেই হইবে নচেৎ দীর্ঘজীবন লাভের আশা নাই। জল শরীরের একটী প্রধান উপাদান। এক তৃতীয়াংশ স্থল ও দুই তৃতীয়াংশ জলে পৃথিবীর সৃষ্টি হইয়াছে, পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, মনুষ্যের শরীরেও তিন ভাগের দুই ভাগ জল আছে। এবং আর এক ভাগ অন্যান্য উপাদান বিশিষ্ট; জলের পরিমাণই বেশী সেই জন্য জলের আর একটী নাম জীবন; অন্ন না খাইয়া মানুষ ৪১ দিন থাকিতে পারে কিন্তু সপ্তাহ কাল জলাভাবে থাকিলে মরিয়া যাইবে; সুতরাং উহা পান করিতেই হইবে, কিন্তু কখন? পিপাসা হইলে, নচেৎ নয়। ক্ষুধার সময় খাওয়া ও পিপাসা হইলে জলপান করা যে কত উপকারী তাহা কার্য্যতঃ না করিলে কেবল কথায় বুঝান বড় কঠিন। প্রকৃত ক্ষুধায় কেবল মাত্র শুষ্ক রুটীর আস্বাদ বা শুধু অন্নের আস্বাদ যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় ও অমৃতবৎ এবং প্রকৃত তৃষ্ণায় জল যে কিরূপ সুধাবৎ তাহা বাস্তবিক পরীক্ষাদ্বারা অনুভব করিয়া উহার উপকারিতা বিশেষরূপ উপলব্ধি করিয়া বুঝা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। আপনি হয় ত বিরক্ত হইয়া বলিবেন "মহাশয় থামুন, ক্ষুধার সময় খাওয়া ও পিপাসায় জলপান সকলেই জানে,আর উপদেশ দিতে হইবে না"। শুনা থাকিতে পারে কিন্তু নিশ্চয়ই জানা নাই; কার্য্যে যে সমস্তই বিপরীত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে সেই জন্যই তো এত রোগ। দন্ত কার্য্য করিবে না সুতরাং লালার কার্য্য হইবে না; পাকস্থলী অতিরিক্ত কার্য্য করিয়া শেষে অপটু হইয়া পড়ে; ক্রমে ক্রমে ভুক্ত পদার্থও অসময়ে অর্থাৎ ৪০।৫০।৬০

বৎসরে অচল হইয়া পড়ে। কেহই যদি কাজ না করে তবে দেহটা চালাবে কে? ঔষধ? ঔষধে ত যে কয় দিন চাবুক মারিয়া পারে চালাইয়া দেয়; তারপর? তারপর? আজ কাল লোকে কথায় কথায় বলে "নাও নাও ও সব জানা আছে;" ধর্ম্ম বিষয়ের আলোচনাই হউক, সঙ্গীত বিদ্যার চর্চ্চাই হউক অথবা জ্ঞানের চর্চ্চাই হউক, যে কোন বিষয়ই হউক না কেন অমনি বলিবে "ও সব ঢের দেখেছি, শুনেছি ও সব জানা আছে অনেক কাল হইতে!" জানা তো সব আছে, তবে কেন কেবল মাত্র জ্ঞান টুকু ফুটাইতে পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত অধ্যয়ন করিতে হয়, বিশ বৎসর ওস্তাদের নিকট তান পুরার কাণ মোড়া দিতে হয়, ও ধর্ম্মাচার্য্যের নিকট আজীবন কষ্ট করিতে হয়? তাই যদি হয় তবে আহারাদির নিয়ম গুলি অর্থাৎ স্বাস্থ্য-রক্ষা কি করিলে হয়, তাহাও শিখিতে হইবে। দেহ কলটীকে বাল্য-কাল হইতে বেগড়াইতেই শেখা হইয়াছে, চালাইতে কেহই শেখায় নাই, তার উপর ঔষধে শোধরান দূর হোক্, কলটী আরও বেগ-ড়াইয়াছে—এ সব কথা পরে বলা হইবে—সেই জন্য এখন লোকের শরীরের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাই বলিতে-ছিলাম যে, কার্য্যতঃ না করিলে কেবল কথায় বুঝান বড় কঠিন। ব্যারাম হইলে কত তিক্ত কটু ঔষধ অম্লান বদনে সেবন করেন, চিকিৎসকের হাতে আত্ম সমর্পণ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না; যত প্রকার ঔষধের গুলি গোলা আছে, তৎসমুদয় চিকিৎসক আপনার শরীরের উপর মারিয়া পরীক্ষা করিয়া লয়, আপনি

তাহাতে দ্বিরুক্তিও করেন না। তাহার কারণ, আপনি মনেও ভাবেন না, অথবা স্বপ্নেও ভাবেন না যে,আহারের সময় জল পান করা ও রীতিমত চর্ব্বণ না করার মূলে কত শত ব্যাধি নিহিত আছে। গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালিলে কি হইবে? পরীক্ষা করিয়া এক বার দেখুন; কিছু দিনের জন্য প্রতিজ্ঞা করুন যে আহারের সময় জলপান করিবেন না এবং পিপাসা না হইলে জলপান করিবেন না। কিছু দিন এই রূপ করিয়া যখন জ্ঞান হইবে যে, এরূপ করিলে রোগ হইতে এবং ঔষধের খরচ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় তখন অন্ধব্যক্তি দণ্ড হারা হইয়া পুনরায় তাহার লাঠিটী পাইলে যেমন চাপিয়া ধরে সেইরূপ আপনিও ঐ নিয়মটীকে দৃঢ়তার সহিত ধরিয়া থাকিবেন। মন কখনও আর পূর্ব্ব কুঅভ্যাসের দিকে যাইবে না। অতএব কার্য্য করিয়া উহার সুফল উপলব্ধি করিতে হইবে; আর মনে করিতে হইবে "১০০।১৫০ বৎসর পরমায়ু পাইব না এবং শরীর রোগশূন্য হইবে না যদি ঐ নিয়ম পালন না করি।"

অন্ন বা রুটী খাইতে খাইতে যেমন জলপান করিবার ইচ্ছা হইবে অমনি সেই কুইচ্ছাটীকে দমন করিবার জন্য এক টুকরা নাস্পাতি খাইবেন; এইরূপে আহার করিবার সময় নাস্পাতি, আপেল, পাকা পেঁপে, মর্ত্তমান কলা, (কলা রুটীর সহিত খাইবেন) পানিফল, পেয়ারা,আম্র,আতা,বেদানা,আঙ্গুর প্রভৃতি সুস্বাদু ও রসাল ফল খাইলে আহারের সময় জল খাওয়ার কুঅভ্যাসটীও যাইবে, এবং ঐ প্রকার আহারের গুণে নানা প্রকার কঠিন

পুরাতন রোগ হইতে মুক্তি পাইবেন। কোন্ সময় ফল খাওয়া উচিত সে সম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত আছে, কেহ বলেন "সকালে ফল আহারে সোণা ফলে, বৈকালে হীরা ফলে, রাত্রে বিষ," অতএব বৈকালে খাওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। আবার কেহ বলেন, রুটী, অন্ন,সাগু, আরারুট, বারলি, যব প্রভৃতি (all starchy foods) খাদ্যের সহিত ফল আহারে বিশেষ উপকার হয় না, বরং পৃথক ভাবে ফল খাইলে সমধিক উপকার পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে কোন্ মত অবলম্বনে আপনার পক্ষে সুফলপ্রদ হয়।

রুটী খাইলে প্রায় এক ঘণ্টা বা দেড় ঘণ্টা পরে কণ্ঠ শুষ্ক বোধ হইবে ও পিপাসা লাগিবে এবং ভাত খাইলে সম্ভবতঃ আড়াই বা তিন ঘণ্টা পরে ঐরূপ হইবে; অতএব আহারের দুই ঘণ্টা পরে এক পোয়া জল পান করিবেন এবং তাহার পরে যত বার কণ্ঠ শুষ্ক বোধ হইবে ততবার জলপান করিবেন, এমন কি আহারের তিন ঘণ্টা পর হইতে দুই ঘণ্টা পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সময়ের মধ্যে যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় পিপাসা বোধ হয় ও কণ্ঠ শুষ্ক বোধ হয় তবে প্রত্যেক ঘণ্টায় দেড় পোয়া হইতে অর্দ্ধসের পর্য্যন্ত জল ধীরে ধীরে পান করিতে পারেন।

এই নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অতিরিক্ত জলপান হইলেও বিশেষ ক্ষতি হইবে না, বরং কম পরিমাণ হইলে অনিষ্ট হইতে পারে। কারণ, পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে যে, সুস্থ ও সবল দেহে জলের ভাগ ৪৬ সের বা এক মণ ছয় সের, এবং অন্যান্য উপাদানের

ভাগ মোটে ২০।২১ সের। ঐরূপ সুস্থ ও সবল দেহ হইতে প্রত্যহ প্রায় তিন সের জল নব দ্বার ও লোমকূপ দিয়া বাহির হইয়া যায়; অসুস্থ ও দুর্ব্বল দেহ হইতে অপেক্ষাকৃত কম জল বাহির হয়। এবং ঐ ভাগ সামঞ্জস্যের জন্য প্রকৃতির যে পরিমাণ জল আবশ্যক তাহা পিপাসা হইলেই জানা যায়। মনে থাকে যেন আহারের দুই ঘণ্টা পরে যে জল খাইবেন তাহা এক পোয়ার অধিক না হয়। এবং সেই দুই ঘণ্টার মধ্যে পিপাসা বোধ না হইলে কদাচ জলপান করিবেন না। ভুক্ত বস্তুর স্বাভাবিক জলীয় অংশ শরীরের পক্ষে যখন প্রচুর হইবে না তখনি পিপাসা বোধ হইবে; এবং সেই পিপাসা বোধই স্বাভাবিক পিপাসা বোধ। অন্যান্য প্রাণীগণের প্রতি দৃষ্টি করিলে স্বাভাবিক পিপাসার অল্পতাই লক্ষিত হয়। কথিত নিয়ম মত চর্ব্বণ করিয়া যদি আহারের প্রত্যেক কণা লালার সাহায্যে উদরস্থ করিতে পারেন তবে পিপাসা বোধ অধিক হইবে না।

আজ কাল নির্ম্মল স্রোতস্বতী নদীর জল অথবা স্বচ্ছ সরোবরের জল পাওয়া দুষ্কর; প্রায় সমুদয় জলাশয়ই কলুষিত এমন কি কলের জলেও দোষ প্রবেশ করিয়াছে, এমত অবস্থায় প্রত্যেক দিনের ব্যবহারোপযোগী জল অগ্নিতে ফুটাইয়া ছাঁকিয়া রাখিবেন।

৩। সাময়িক আহার ও খাদ্যবস্তু।

বোধ হয় আপনি জানেন যে, আজ কাল সাহেবি মতে অনেকেই প্রাতে এক বার, বেলা নয়টায় এক বার, বেলা দুই টায় এক বার, সন্ধ্যার পূর্ব্বে এক বার এবং রাত্রে এক বার এই মোট পাঁচ দফা আহার করেন। এই রূপ তিন চারি বা পাঁচবার যাঁহারা আহার করেন তাঁহাদের বিশ্বাস যে, পেট খালি রাখিলে উৎকট ব্যাধি হইবে। এই বিশ্বাস বশতঃ তাঁহারা পেটকে সর্ব্বদা অল্প বিস্তর বোঝাই করিয়া রাখেন। উপবাসের উপকারিতা এ সকলকে বুঝান বড় কঠিন। যাঁহারা মাসে দুই বার উপবাস করেন তাঁহাদের শরীর এবং ইহাঁদের শরীর আকাশ পাতাল তফাৎ। গড়ে ইঁহাদের পরমায়ু আটত্রিশ বৎসর মাত্র। গ্রহণ এবং বর্জ্জন, এইদুইটি ক্রিয়ার গুণে ও দোষে শরীরটী ভাল রূপে ও মন্দ রূপে চালিত হইতেছে। বর্জ্জন হউক বা না হউক, অনবরত যদি গ্রহণ ক্রিয়া হইতে থাকে তবে সে শরীর অচিরে নষ্ট হইবে। খাদ্যদ্রব্য শরীরে বাঁধিয়া দিলে শরীরের বল হয় না অপিচ উহা ভিতরে যাইয়া হজম হইয়া শরীরে বল উৎপন্ন করে। শরীরের যতটুকু আবশ্যক তাহার অতিরিক্ত খাদ্যই প্রায় লোকে ঐরূপ বিশ্বাস বশতঃই হউক অথবা মরীচিকাবৎ ক্ষুধা যাহাকে দৃষ্টি ক্ষুধা বলে অর্থাৎ যে ক্ষুধায় শুধু রুটি বা শুধু অন্নের আস্বাদ

অমৃতবৎ মিষ্ট লাগে না সেই ক্ষুধা বশতঃই হউক, অথবা অভ্যাস-বশতঃই হউক, অথবা লোভ বশতঃই হউক, উদরে প্রবেশ করাইয়া দেন; উদরের মধ্যে মহা হৈ চৈ লাগিয়া উঠে। ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক হইতে না হইতে পুনরায় খাদ্য চাপাইলে পরিপাক ক্রিয়া সুচারু রূপে না হইয়া বিপর্য্যয় হইয়া যায়। পেটের ভিতরের এই মহা গোলযোগ শীঘ্র জানিতে পারা যায় না। অনেকেই বলেন "খাবার সময় খেতে হয় তাই তো জানি, ক্ষুধাবোধ আবার কি, সব তো হজম হইয়া যায়, তা হলেই হলো"। একটী ঘোটকের পৃষ্ঠে যদি আপনি আরোহণ করেন সে আপনাকে নক্ষত্রবেগে উড়াইয়া লইয়া যাইবে, একটী গাড়িতে যুতিয়া দিলে অতো বেগে দৌড়িতে পারিবে না, মনে করিবে "এ আবার কি একটা টানিতে হইতেছে?" এবং গাড়িতে যুতিয়া যদি তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করেন ও আরও কয়েকটা ভার চাপাইয়া দেন তবে সে চলচ্ছক্তি হীন হইবে। সেইরূপ শরীরও একটি অগ্নিদ্বারা (যাহাকে জীবনীশক্তি বলে) চালিত হইতেছে। গ্রহণ ও বর্জ্জন ক্রিয়া যদি স্বাভাবিক হয় তবে জীবনীশক্তি শরীরকে উড়াইয়া লইয়া যাইবে, শরীর বলিয়া একটা জিনিস আছে সে বোধ বা অনুভব পর্য্যন্ত হইবে না। মৎস্য জলে খেলা করে, ছুটাছুটি করিয়া বেড়ায়, পাখী আকাশে উড়ে দেখিলে এই মনে হয় যে শরীর বলিয়া তাহাদের একটা ভারি কোন পদার্থ নাই যাহাকে জোর করিয়া টানিয়া লইয়া বেড়াইতে হইতেছে। এরূপ কয় জন আছেন যাঁহাদের শরীর এত হালকা যে তাহার অস্তিত্বই

অনুভব হয় না? এরূপ সুস্থদেহী নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শরীরকে একটা ভারি মোট বলিয়া সকলেই অনুভব করেন। আজ কাল যাঁহারা পাঁচ বার আহার করিয়াও আপনাদিগকে সুস্থদেহী মনে করেন, তাঁহাদেরও চব্বিশ ঘণ্টা দিনমানের মধ্যে কোন না কোন সময় শরীর ভারাক্রান্ত বোধ হয়, সে সময়ে কার্য্য থাকিলেও তাহা করিতে অনিচ্ছা হয়; শরীরকে টানিয়া উঠাইতে হয়। শিশুর নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে সে খেলিতে আরম্ভ করে, ক্রমাগত হাত পা ছুড়িতে থাকে, কিছুতেই স্থির হইয়া থাকিতে পারিবে না, স্থির হইয়া যখন থাকিবে তখনি নিদ্রায় অভিভূত হইবে। জাগ্রত অবস্থায় শরীর ভারাক্রান্ত বোধ হইলেই জানিতে হইবে রোগ সঞ্চার হইতেছে। ইহার কারণ অতি-ভোজন। গাছে ক্রমাগত জল সেচন করিলে গাছ মরিয়া যায় কিন্তু এক বার জল ও এক বার রৌদ্র পাইলে অনেক দিন বাঁচে; সেইরূপ এক বার ভোজন করিয়া পুনরায় যতক্ষণ ক্ষুধার অনুভব না হইবে ততক্ষণ কিছুই খাইবেন না। উপবাস প্রকৃতিসিদ্ধ; আহার না হইলে যেমন মানুষ বাঁচিতে পারে না, সেইরূপ উপবাস না হইলেও মানুষ বাঁচিতে পারে না। সর্প এক দিন পেট পুরিয়া আহার করিয়া সাত দিন গর্ত্তে থাকে। এমন কি লৌহনির্ম্মিত ষ্টিম্ এঞ্জিন্‌কেও (Steam Engine) সাত দিন অন্তর এক দিন উপবাস করাইতে হয়, নতুবা উহা চলিবে না। মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম না পাইলে যদি লৌহ নির্ম্মিত এনজিন্ বা কল চলিতে না পারে তবে আপ-

নারা রক্তমাংস গঠিত শরীরকে উপবাস বা বিশ্রাম না দিয়া কয় বৎসর চালাইবেন? যিনি আহার ও উপবাস করেন অর্থাৎ একবেলা যাঁহার আহার যেমন আমাদের দেশের বিধবা স্ত্রীলোকদের, তাঁহার শরীর সর্ব্বদা পাত্‌লা বোধ হইবে ও পূর্ণ পরমায়ু পাইবেন। যাঁহারা অতিরিক্ত খাইয়া থাকেন, উপবাসের ধার দিয়া যান না, ক্ষুধা বোধ নাই বলিলেও হয়, তাঁহাদের শরীর টানিয়া লইয়া বেড়াইতে হয়; তাহার উপর লোভ আছে, অস্বাভাবিক আহার বিহার আছে, যদ্দারা শরীর আরও ভারাক্রান্ত বা রোগাক্রান্ত হয়; ইঁহাদের জীবনীশক্তি অনবরত অতি মাত্রায় খরচ হইতেছে, সুতরাং জীবনের শেষ সীমা পর্য্যন্ত উক্ত ভারাক্রান্ত ঘোটকের ন্যায় পৌঁছিতে পারেন না, তথাপি ঐ পাঁচ দফার একটী দফারও ত্রুটি হয় না; সুতরাং ব্যারামের হাত হইতে নিষ্কৃতি পান না। "গত রাত্রে বড়ই গুরুতর ভোজন হইয়াছে, অদ্য দিনমানে না খাইলেও চলে," অথবা "এ বেলা ক্ষুধা বোধ হইতেছে না সুতরাং এক বেলা না খাইলেও চলে," মুখে অনেকে এইরূপ বলেন, কিন্তু কার্য্যতঃ দিনমানের যে বন্দোবস্ত আছে তাহা করিতেই হইবে। "দিন মানে না খাইলেও চলে"—এ কথাটি কতক্ষণ? যতক্ষণ খাদ্যবস্তু চক্ষুর অন্তরালে থাকে; অথবা আহারের সময় উত্তীর্ণ না হয়। আহার সম্মুখে পাইলেই অথবা আহারের সময় উপস্থিত হইলেই মনে করেন, "আচ্ছা, আজ অমুক পাচক ঔষধ খাইলেই সব জীর্ণ হইয়া যাইবে।" দেখুন, জীবনীশক্তিরূপ কোষাগারের উপর কত টান! অক্ষয় মনে করিয়া অনবরত হ্যাণ্ড নোট (Hand

rate) কাটিতেছেন কি না বিবেচনা করুন দেখি? যে জীবনী-শক্তি এক শত বৎসর ধরিয়া খরচ হইবে, তাহা যথেচ্ছাচারিতায় অতিরিক্ত খরচ হইয়া পঞ্চাশ বৎসর হইতেছে কি না?

বৈজ্ঞানিক এবং শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বলিতেছেন যে, মনুষ্যের চর্ম্ম ৯০০ বৎসর, অস্থি ৪০০০ বৎসর হৃদ্‌পিণ্ড ৩০০ বৎসর, যকৃৎ ৪০০ বৎসর, পাকস্থলী ৩০০ বৎসর মূত্রযন্ত্র ২০০ বৎসর এবং ফুস্‌-ফুস্‌ ৫০০ বৎসর পর্য্যন্ত কার্য্যকরী থাকিতে পারে। মূত্রযন্ত্র সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল যন্ত্র; সুতরাং ঐ যন্ত্রটীর শক্তি অনুসারে প্রত্যেক মনুষ্য ২০০ বৎসর জীবিত থাকিতে পারে যদি ঠিক প্রাকৃতিক নিয়ম মত জীবনযাপন করে। কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়ায় ৫০ বৎসর কু-অভ্যাস বশতঃ প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভাবে জীবনযাপন করায় ৫০ বৎসর, মানসিক বিকৃতি এবং দুশ্চিন্তায় ২৫ বৎসর এবং এক মুষ্টি অন্নের জন্য বর্ত্তমান সময়ে অতিরিক্ত পরিশ্রম বশতঃ ২৫ বৎসর এইরূপে মোটের উপর ১৫০ বৎসর কমিয়া ৫০ বৎসর হইতেছে। তাহার উপর ঔষধের অযথা প্রয়োগে আরও কমিয়া যাইতেছে। অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ত চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন; অগ্নিবল যথেষ্ট না থাকিলে ঔষধ অপকার ব্যতীত অন্যকোন ক্রিয়া করিবে না। চিকিৎসক এই অগ্নিকে উস্‌কা-ইয়া দিয়া "বাহবা" লইতে পারেন, অর্থাৎ প্রশংসা বা যশঃ লাভ করিতে পারেন কিন্তু রোগীর বিবেচনা করা উচিত যে, ইহাতে ইন্ধন শীঘ্র পুড়িয়া গেল, জীবনপ্রদীপ ক্ষণকালের জন্য বেশ জ্বলিল বটে কিন্তু ইন্ধন এক শত বৎসর পর্য্যন্ত চলিল না। শরীরের

অগ্নিকে স্বাভাবিক রূপে রক্ষা না করিয়া উহার সহিত ঔষধরূপে অগ্নি যোগ করিলে শরীরটী দপ্ দপ্ করিয়া ক্ষণেকের জন্য জ্বলিয়া শীঘ্র পুড়িয়া যায়। যাঁহারা বলেন ঔষধ প্রকৃতিকে সাহায্য করে, তাঁহারা কি বলিতে চান্ না যে জীবনীশক্তির ঐ রূপে অযথা খরচ করা হয়? মৃত্যুশয্যায় শায়িত রোগীর উপর ঔষধ প্রয়োগের কি ফল দেখা যায়? তদ্ব্যতীত ঔষধ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কত নূতন রোগী মরিয়া যায় ইহা তো প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়, এবং লোকে বলে, "এক দিনের জ্বরে লোকটা ম'লো ওষুদে কিছুই হ'ল না।" পলতের আগুনে তোপ্ ছোটান যায় বটে, কিন্তু আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে পলতে নিবে যায়; আপনি কি বলিতে চান যে, ইন্ধন অভাবে পলতের অগ্নিটী নিবিয়া গেল, অর্থাৎ আয়ু ফুরাইল বলিয়া রোগী মরিল? চিকিৎসকের বিবেচনা অবিবেচনার কথা এখন ছাড়িয়া নিজেদের কত শত প্রকারের কুপথ্য হইয়াছে ভাবিয়া দেখুন দেখি? অদ্য কুপথ্য করিলাম, অক্ষুধায় খাইলাম, অদ্যই যদি তাহার কুফল হাতে হাতে পাইতাম তবে আর আমাদের সুখের সীমা থাকিত না। কুপথ্যের ফল অনেক দিন পরে হয় বলিয়াই তো যত দুঃখ কষ্ট পাই। কষ্টের সময় মনেও হয় না যে, এক দিন নয়, দুই দিন নয়, এমন কি একশত দিন এক হাজার দিন ঐ রূপ কুপথ্য করিয়াছি; এবং মনে উদয়ও হয় না যে, কত শত দিন সামান্য মাথাধরা, সর্দ্দি বোধ, ভার বোধ, বা কাসি, সামান্য বদ্ হজম ও পেট ভার এবং আরও সামান্য সামান্য পীড়ার সূচনা দ্বারা প্রকৃতি পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইতে

বলিয়াছে; প্রকৃতির ঐ প্রকার শত ডাক্‌কেও উপেক্ষা করিয়া ইচ্ছামত চলিয়াছি। তখন কেবল মনে হয় "হা ডাক্তার জো ডাক্তার"; ডাক্তার দেখিলেই যেন আমি স্বর্গ পাইব ও আমার সমস্ত ব্যাধি দূর হইবে। এমন চিকিৎসক কয়জন আছেন যাঁহারা রোগীকে পথ্যাদির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া স্বাভাবিক অগ্নি রক্ষা করিতে বলেন? তাঁহারা বলিলে কথার গুরুত্ব অধিক হয়। কিন্তু তাঁহাদের শিক্ষাদীক্ষা সমুদয়ই বিপরীত ভাবে হইয়াছে! একটী কাঁটা চালাইয়া আর একটী কাঁটা বাহির করা অপেক্ষা কাঁটাটী আপনি খসিয়া পড়িয়া যাওয়া ভাল নয় কি? জ্বর হইল, দাস্তের বেগ নাই, জোর করিয়া দাস্ত করান হইল, জ্বর গেল, কিন্তু আর একটী কাঁটা ভিতরে থাকিল। অস্বাভাবিক রূপে দাস্ত করানতে শরীর দুর্ব্বল হইল তাহা সারাইতে গিয়া কোষ্ঠ বদ্ধ হইল, আবার জ্বর হইতে পারে সে সম্ভাবনা থাকিল। নির্দ্দোষ হইয়া সারিল না। অথচ দুটী একটি উপবাস করিলে, অর্থাৎ ইচ্ছার বিরুদ্ধে না খাইলে জ্বরটী নির্দ্দোষরূপে সারিয়া যায়। কিন্তু লোকের বিশ্বাস কি? চিকিৎসকের বিশ্বাস কি? অসুখ হইলেও আহার কিছু না কিছু দেওয়া চাই, ক্ষুধা নাই, তৃষ্ণা নাই, পেট বলিতেছে "আমাকে একটু জিরেন্‌ দে", "নিদেন্‌ একটা বেলাও দে," ভুল বিশ্বাস বলিতেছে, "তা কখনই হইবে না; কিছু বোঝাই করিব, তাহা বহন করিতেই হইবে, ঔষধের জোরে তুমি বহন করিবে।" পূর্ব্বে বলিয়াছি মদ খাওয়াইয়া ঘোড়াকে সাধ্যাতীত কাজ করাইয়া প্রথম প্রথম "বাহবা" লইতে পারাযায়, কিন্তু ঘোড়াটী যখন অল্প

দিনের মধ্যে মরিয়া যায়, অথবা অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে, তখন মদের গুণের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম ঔষধে কাজ দেখায় বটে কিন্তু ঐরূপ। ঔষধের উপর বিশ্বাস পূর্ব্বে যেমন ছিল, সেরূপ আজকাল নাই, যাঁহারা একবার দুইবার পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু যাঁহারা বহু বার পরীক্ষা করিয়াছেন তাঁহারা বুঝিয়াছেন ঔষধের কি। বিষময় ফল। "না খাইলে শরীর দুর্ব্বল হইবে" এই মনে করিয়া অক্ষুধা সত্বেও খাওয়া হয়; কিন্তু জানা উচিত, জগতের শিরোমণিগণ কি পরিমাণ আহার করিতেন। অক্ষুধায় কখনই খাইতেন না, এবং ক্ষুধা বোধ হইলে এমন পরিমাণ খাইতেন যাহাতে শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রমের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয়; "ঊনো খেলে দুনো বল" এই কথাটী কার্য্যে পরিণত করিতেন। তাঁহারা বলিয়া গিয়াছেন, যে দিন বেশি খাওয়া হইত সে দিন কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না। যে দিন উপবাস অথবা অল্প আহার হইত, সে দিনকার কাজ কি শারীরিক এবং কি মানসিক উভয়ই অতি উত্তম হইত। এক জন প্রসিদ্ধ চিকিৎসক দয়াপরবশ হইয়া অক্ষম রোগীদের উপকারার্থে গরমজলের নানা উপকারিতার কথা বলিয়াছেন, গরম জলে সংক্রামক পীড়া হইতে পারে না, গরমজল ব্যবহার করিলে অনেক রোগের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ব্যায়াম, ভ্রমণ প্রভৃতির কথাও যৎকিঞ্চিৎ বলিয়াছেন, কিন্তু কি ভাবে আহার আদি করিতে হয়—অর্থাৎ চর্ব্বণ জলপান ও পথ্যাদির সমুদয় নিয়ম যাহা [এ স্থলে বলা হইতেছে—যে নিয়মগুলির

উপর জীবন প্রতিষ্ঠিত—তাহার একটী কথাও বলেন নাই; অনেক বলিলেন অথচ আসল কথা না বলিয়া রোগীকে সেই অন্ধকারেই রাখিলেন। আসল কথা কোন চিকিৎসকই বলেন না, বলিলে তাঁহাদের ব্যবসায় চলিবে কি প্রকারে? প্রকৃত কথা বলিলে স্বার্থে আঘাত পড়ে রোজগার মাটী হইয়া যায়! তাই খুব দামি দামি ঔষধ দিতে হইবে, এবং রোগীর জীবন লইয়া খেলা করিয়া নিজেদের এবং ঔষধ বিক্রেতার উদর পূরণ করিতে হইবে! রোগী যে অন্ধ সেই অন্ধই থাকুক, তাহার রোগ পর্য্যালোচনা করিবার বা রোগের কারণ অনুসন্ধান করিবার কোন দরকার নাই! যদ্ভবিষ্যের ন্যায় শূন্যে নির্ভর করিয়া পড়িয়া মরুক।

এ স্থলে যদ্ভবিষ্যের গল্পটী উল্লেখ করি। কোন একটী সরোবরে তিনটী মৎস্য বাস করিত। একটীর নাম অনাগতবিধাতা, আর একটীর নাম প্রত্যুৎপন্নমতি, এবং তৃতীয়টীর নাম যদ্ভবিষ্য। উক্ত সরোবরের ধার দিয়া জনৈক দৈবজ্ঞ যাইতেছেন এমন সময় একটি কৃষক তাঁহাকে অভিবাদন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আচার্য্য মহাশয়! এবারকার অবস্থা কেমন?" আচার্য্য বলিলেন "আর কেমন! ছয় বৎসরের আহার এখন হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখ, কারণ ছয় বৎসর অনাবৃষ্টি হইবে"। অনাগতবিধাতা অন্যান্য মৎস্যদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "ওহে তোমরা সকলে ঐ দৈবজ্ঞের কথা শুনিলে তো, এক্ষণে কি করা উচিত তাহা ভাবিয়াছ কি"? প্রত্যুৎপন্নমতি বলিল "এখনি কি পুকুরের জল শুকিয়ে

গেল যে অন্যত্র যেতে হবে' ? অনাগতবিধাতা ছয় বৎসর বৃষ্টি না হইলেও জলশুষ্ক হইবে না সেই রূপ একটী অতিশয় প্রশস্ত জলাশয়ে চলিয়া গেল। কিছুদিন পরে উক্ত সরোবরের নিকট দিয়া কয়েক জন ধীবর যাইতেছে আর বলিতেছে "ওহে কল্য অতিশয় প্রত্যুষে এই সরোবরের মৎস্য ধরিয়া অন্যত্র যাইতে হইবে"। যদ্‌ভবিষ্য বলিল "তাই তো! এখন কি করা উচিত" ? প্রত্যুৎপন্নমতি বলিল "কি হয় আগে দেখা যাক্ তারপর বিহিত উপায় করা যাইবে, না দেখিয়া না শুনিয়া হঠাৎ কোন কাজ করা ভাল নয়"। পরদিন যথা সময়ে জেলেরা জাল ফেলিল। প্রত্যুৎপন্নমতি মৃতবৎ আড়ষ্ট হইয়া থাকিল, ধীবর তাহাকে মৃতমৎস্য মনে করিয়া যথাস্থানে রাখিবার জন্য জাল হইতে বাহির করিয়া অসতর্ক ভাবে যেমন ফেলিল তেমনি সে এক লম্ফে গভীর জলে পড়িয়া প্রাণ বাঁচাইল। যদ্‌ভবিষ্য অন্যান্য মৎস্যের সহিত ধৃত হইয়া মারা পড়িল। শরীর রক্ষা বিষয়ে প্রকৃতির আদেশ না শুনিয়া আপনি কতটুকু-রকম বা কতখানি-রকম যদ্‌ভবিষ্য হইয়া আছেন তাহা এই উপদেশ গ্রন্থ পাঠের সঙ্গে সঙ্গে চিন্তা করিবেন।

যে অন্ন ক্ষুধার সময় খাইলে অমৃতবৎ কার্য্য করে সেই অন্ন অক্ষুধায় খাইলে বিষবৎ কার্য্য করিবে এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিবেন ; অক্ষুধায় আহার করিলে তাহার কুফল অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে হজম শক্তি কমিবে কমিবে, সুতরাং ক্ষুধা না হইলে আহার করিবেন না, তাহাতে সাময়িক যে কয় দফা আহারের

নিয়ম করিয়াছেন তাহার ব্যতিক্রম হয় হউক, দুই এক বেলা উপবাস করিতে হয় হউক, তাহাতে বিশেষ লাভ ব্যতীত কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। বিলাতের এক জন প্রধানতম চিকিৎসক এইরূপ উপবাসকে "healthy starvation" অর্থাৎ স্বাস্থ্যজনক অনশন বলিতেছেন।

কোন্ কোন্ বস্তু আমাদের খাওয়া উচিত? বাল্যকাল হইতে ঝাল, ঝোল, অম্বল, ডাইলের ঝোল মৎস্যের ঝোল, মাংসের ঝোল এই সমুদয় খাইয়া আসিতেছি, এখন কেমন করিয়া বলিব যে এই সমস্তই প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভোজন? যে চর্ব্ব্য খাদ্য খাইবার সময় লালা সম্যক্‌রূপ নির্গত হইতে পারে না ও যে চর্ব্ব্য খাদ্য মুখে দিলে দন্তের চর্ব্বণ ক্রিয়া সম্যকরূপে হয় না তাহাকে প্রকৃতি বিরুদ্ধ খাদ্য বলা যাইতে পারে। এখন একটি একটি করিয়া বিচার করিয়া দেখুন। ঝালের ঝোল বা তরকারীর ঝোল, অম্বল, ডাইল প্রভৃতি সমুদয় ব্যঞ্জনই অধিক পরিমাণ জল মিশ্রিত। আমরা যাহা খাই তাহার বার আনা রকম জল, তাহার উপর দুগ্ধ ও পানীয় জল আছে। সুতরাং এত জল এক কালীন উদরে প্রবেশ করাইলে পেটের আগুন নিবিয়া যাইবে না ত কি? যে তিন প্রকার রসের দ্বারা খাদ্য দ্রব্য পরিপাক হয় তাহা আহার করিবার সময় অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, সেই সময় যদি সেই রস অধিক জলের সহিত মিশিয়া যায় তবে পরিপাক ক্রিয়া কিরূপে হইবে? অথচ এই রূপে আহার করিয়া যিনি ৬০ বৎসর বাঁচিলেন, লোকে মনে করিল "এ লোকটা অনেক দিন বাঁচিল।" আজ

কাল একশত বৎসরের মানুষ দেখা যায় না, কিছুকাল পরে ৬৫ বৎসরের মানুষও একটী অদ্ভুত জিনিষ বলিয়া পরিগণিত হইবে। যেখানে বাঁচা উচিত ছিল ন্যূনকল্পে একশত বৎসর, সেখানে দুই একজন ব্যতীত পঞ্চাশের পার কেহ হয় না। অধিকাংশই ৪০।৪৫ বৎসরে খতম হইয়া যায়। গড়ে লোকের পরমায়ু আজ কাল আটত্রিশ বৎসর হইয়াছে এ কথা সকলেই অম্লান বদনে স্বীকার করেন, ওটা যেন একটা অবশ্যম্ভাবী ঘটনা সুতরাং উহার বিষয় চিন্তা করিবার প্রয়োজন নাই! অথবা প্রত্যেকেই হয় তো মনে করেন "ও আটত্রিশ বৎসর আমার পক্ষে হইবে না"। আমাদের মনুষ্য এই স্থানেই পূর্ণ মাত্রায় প্রবঞ্চিত। তাহার কয়েকটী উদাহরণ পুস্তকের শেষ ভাগে চিকিৎসা-সঙ্কটের কথা বলিবার সময় দিব। আপনার একটী পয়সা যদি হারাইয়া যায় অথবা অযথা খরচ হয় তবে সেই একটী পয়সার জন্য মাথা খুঁড়িবেন অহরহঃ চিন্তা করিবেন, কিন্তু দিন দিন যে কত প্রকারে প্রকৃতির বিমুখে চলিয়া স্বাস্থ্য হারাইতেছেন সে দিকে হুঁস নাই, চিন্তাও নাই। শরীর নিহত হইলে অর্থ উপভোগ কে করিবে? কামনার ফলভোগী কে হইবে? কিছু কাল পূর্ব্বে এবং আজ কালও যাঁহারা চিকিৎসার স্রোতে পড়েন নাই তাঁহারাই অধিক দিন সুস্থ শরীরে জীবন যাপন করিয়াছেন, সুতরাং চিকিৎসার স্রোতে পড়িয়া জীবন আরও ছোট হইয়া গিয়াছে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। বাল্যকাল হইতে কেবল মাত্র অর্থ উপার্জ্জনের পথ দেখিয়া শুনিয়া আসা হই-

থাছে, সুতরাং মন,প্রাণ,যত্ন,'চেষ্টা একটী বিষয়েই ধাবিত হইয়াছে, সেই যত্ন চেষ্টার যদি এক চতুর্থাংশ স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য হইত তবে আজ মানুষ আটত্রিশ বৎসর বয়সে মরিত না। স্বাস্থ্যরক্ষার অর্থও এখন বিপরীত হইয়া গিয়াছে। সভ্যতার অনুরোধে প্রকৃতির সম্পূর্ণ বিরোধী পথে চলিয়া দেহ কলকে বেগড়াইয়া চিকিৎসকের হাতে ফেলিয়া দাও, তিনি গুলি গোলা মারিয়া বা কাটাকুটী করিয়া যা হয় করুন; এইরূপ করিলেই আজ কাল স্বাস্থ্যরক্ষা করা হয়! এ সমস্ত চিন্তার বিষয় নয় কি? উপায় হাতে থাকিতে যদি তাহা না করি তবে পরের উপর অথবা কপালের উপর দোষ দিলে হইবে কেন? ঝাঁড়ি চাপা বাঁশের বা বেতের চারার মত আমাদের পাকস্থলীও যে বাল্যকাল হইতে অতিরিক্ত খাদ্যরূপ পাথর চাপা হইয়া আসিতেছে; শরীর কি করিয়াই বা বাড়িবে আর কয় দিনই বা থাকিবে? যাহা খাইলে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসরে বৃদ্ধ হইয়া মরিতে হইবে তাহা না খাইয়া যদি অন্য কোন প্রকার উপায় থাকে তবে তাহা না করি কেন?

বিধবা স্ত্রীলোকেরা মৎস্য মাংস খায় না; সধবা অবস্থায় খাইয়াছে কিন্তু বিধবা হইয়া আর খায় না; দুই এক বৎসর বিধবা হইয়াছে এবং মৎস্য মাংসের সংস্পর্শে থাকে নাই এরূপ একটী স্ত্রীলোকের সমক্ষে যদি আপনি মৎস্য মাংস আনয়ন করেন, সে তখনি নাকে কাপড় দিবে,মৎস্যের দুর্গন্ধ কিছুতেই সহ্য করিতে পারিবে না। আপনি নিজে একবৎসর মৎস্য ত্যাগ করিয়া নিরামিষ আহার করিয়া দেখুন মৎস্যের প্রতি আপনার ঘৃণা হয়

কি না। যদি ঘৃণা হয় তবে কি বুঝিব? বুঝিব যে, মৎস্য মাংস আপনার প্রকৃতিবিরুদ্ধ। ইহাও অনুভব করিয়াছেন যে, কাঁচা মৎস্য বা মাংস দেখিলে খাইবার স্পৃহা তত হয় না যত হয় একটী সুপক্ক ফল দেখিলে। কাঁচা অবস্থায় শস্যাদি ও ফলমূলাদি আমরা অনায়াসে খাইতে পারি এবং দেখিলে তখনি খাইতে ইচ্ছা করে। কিন্তু কাঁচা মৎস্য বা মাংস দেখিলে সেরূপ হয় না। একটী জীবিত পশু বা প্রাণী দেখিবা মাত্র কি তাহার ঠ্যাং খানা বা মুড়োটা খাইতে ইচ্ছা হয়? ইহাতে বুঝিতে হইবে, প্রকৃতি আমাদিগকে যে যে খাদ্য বস্তু দিয়াছেন যাহা দেখিলে প্রকৃতিগত আগ্রহ হয় তাহাই আমাদের আহার করা উচিত।

দন্ত, পরিপাক যন্ত্র, খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় করার যন্ত্র (ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও রসনেন্দ্রিয়) এবং মাতৃদুগ্ধ এই চারিটী ক্ষেত্র অবলম্বন করিয়া এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন যে, মনুষ্যের দন্ত কেবল মাত্র ফল মূল ও শস্যাদি ভক্ষণ করিবার উপযুক্ত, পরিপাক যন্ত্র এবং খাদ্যাখাদ্য নির্ণয় করার যন্ত্রও নিরামিষ খাদ্যের উপযোগী এবং নিরামিষ খাদ্যই মাতৃদুগ্ধের প্রস্রবণ বা ধারা সমভাবে রাখে আমিষ খাদ্য খাইলে তাহা শুকাইয়া যায়। আমিষ খাদ্য মাত্রই রোগ উৎপন্ন করে (মাদক দ্রব্যের প্রসঙ্গে এ কথা বুঝাইয়া বলা হইয়াছে) অতএব নিরামিষ আহার অর্থাৎ শস্যাদি এবং ফল মূলাদি আহার করিতে হইবে।

কি অবস্থায় তাহা খাইতে হইবে? স্বভাবতঃ যেমন পাইব

তেমনি খাইব, রন্ধন না করিয়া খাওয়ার অভ্যাস ক্রমে ক্রমে করিতে হইবে। মনুষ্যের অন্নগত প্রাণ, তুষ্টি পুষ্টি মেধা ও বল এই সকল ভুক্ত অন্নের ফল, কিন্তু সেই অন্নের কিরূপ অবস্থায় আমরা তাহা ভোজন করি? প্রথমতঃ উষ্ণ চাউল প্রস্তুত করিবার সময় ধান্য সিদ্ধ করিতে হয়, সেই সময় অন্নের কতক সারাংশ বাহির হইয়া যায়, দ্বিতীয়তঃ রন্ধন করিবার সময় অন্নের আরও কতক সারাংশ ফেন বলিয়া পরিত্যক্ত হয়; তৃতীয়তঃ দুই তিন বৎসরের পুরাতন চাউল চাই; যাহার সারভাগ সময়ের গুণে এবং পোকা মাকড়ের গুণে অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছে; এরূপ চাউল না হইলে হজম হয় না। পুরাতন চাউল রোগীর পথ্য বটে, কিন্তু আজ কাল যে প্রত্যেকেরই ঐ প্রকার চাউল না হইলে চলে না, কি করিয়া বুঝিব কে রোগী, কে নিরোগী? উক্ত তিন প্রকার কারণ বশতঃ অন্নের সার পদার্থ বাহির হইয়া গেল, অবশিষ্ট থাকে কেবল মাত্র শিটি। সেই শিটি খাইলে, কিইবা মেধা আর কিইবা বল হইবে? চাষারা ভাতের ফেন খায়, উহা ফেলিয়া দেয় না, কারণ তাহারা জানে যে, উহাতেও কতক বলাধান ও ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়। আর কেন না খাইয়াইবা করে কি? বাক্সে পয়সাত নাই যে, মিঠাই লুচি জলপান প্রভৃতি বিষ খাইয়া উদর পূরণ করিবে! বাধ্য হইয়া খাইতে হয়। অতি পূর্ব্বকালে মুনিঋষিগণ ফলমূল খাইয়া দীর্ঘজীবন লাভ করিতেন। সে সময় হইতে অদ্য পর্য্যন্ত কত যে সভ্যতার পরাকাষ্ঠা হইয়াছে, তাহা সমস্ত বিষয়ে উপলব্ধি করিতে পারা যায়; কিন্তু মনুষ্যজীবনের সীমার বিষয় ভাবিলে শরীর কাঁপিয়া

উঠে! চারিদিকের সর্ব্ব বিষয়ের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্যের আয়ুর হ্রাস! এত উন্নতি,এত সুখ,কে ভোগ করিবে,যদি মানুষ অল্পায়ু হইয়া পড়ে! মুনি ঋষিগণ ফলমূল আহার করিয়া যে চিন্তা করিয়াছেন, মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছেন, গ্রীকগণ অনুত্তেজক আহার করিয়া যে কার্য্য করিয়াছে (plain living and high thinking of the Greeks) তাহার এক কণাও আজকাল বাবুরা দিবসে তিন চারিটি মুড়া খাইয়াও (পাঁঠারই হউক অথবা মাছেরই হউক) পারেন না। ইহার কারণ আরও বিশদরূপে "আহারের পরিমাণে" বলা হইবে। মুনিঋষিগণ সামান্য ও অনুত্তেজক আহার করিয়া জগতের নানা উপকার করিয়াও দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়াছেন, আমরা সভ্যতার অনুরোধে এবং শিক্ষার দোষে তদ্বিপরীত আচরণ করিয়া অকালে মরিতেছি। যত প্রমাণ সংগ্রহ করিতে যাইব, ততই পুঁথি বাড়িয়া যাইবে। একটী গৃহ-পালিত পশু এবং বনজাত খাইয়া সচ্ছন্দ রূপে থাকে, এইরূপ আর একটী সেই পশু, এ দুয়ের মধ্যে কোন্‌টা বলশালী হয় ও অধিক দিন বাঁচে? পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে এবং আপনিও পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন বনের পশুটাই বলশালী ও দীর্ঘায়ু হইবে। কারণ অনুসন্ধান করিলে অধিক দূর যাইতে হইবে না। সেইরূপ মনুষ্যও যদি তাহার স্বাভাবিক খাদ্যগুলিকে অবিকৃত অবস্থায় আহার করে, তবে সভ্যতার দাস মনুষ্য অপেক্ষা অধিক বলশালী, দীর্ঘায়ু ও কার্য্যক্ষম হইবে। কোন একটী লোকের এমন উৎকট ও মারাত্মক রোগ হইল যে, চিকিৎ-

ৎসকগণ হতাশ হইলেন, রোগীকে বলিলেন যে, রোগ অসাধ্য, সাবধান ভাবে ও মাত্র ফল আহার করিয়া, যে কয় দিন বাঁচিতে পারেন বাঁচিয়া লউন। এই লোক ফল ও দুগ্ধ আহার করিয়া আরও ত্রিশ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন; এ ঘটনা চিকিৎসকের বুদ্ধির অতীত! সাধারণ মানুষ কি করিয়া ধারণা করিবে যে, কত সল্পাহার শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য এবং একশত বৎসর বাঁচিবার জন্য আবশ্যক! রোগ হওয়া মাত্রই যদি প্রত্যেক রোগীর ঐ প্রকার ব্যবস্থা হইয়া চিকিৎসা হয়, তবে রোগীকেও ঔষধের গোলা গুলি খাইয়া জীবন নষ্ট করিতে হয় না, এবং চিকিৎসকও হাতে কলমে অনেক শিক্ষা পায়, কিন্তু এ প্রকার শিক্ষায় লাভ নাই। রোজগার হয় না। আহারের পরিমাণ কি করিয়া ঠিক করিতে হয়, পরে বলিব। তবে উক্ত উদাহরণ স্বরূপ আরও অনেক উদাহরণ আছে, যাহা দ্বারা এই প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, অবিকৃত আহার দীর্ঘ জীবন লাভের এবং স্বাস্থ্যের সম্পূর্ণ উপযোগী ও তাহাতে জীবনী শক্তির সমধিক পোষকতা করে। বিকৃত আহার অর্থাৎ রন্ধন করিয়া যাহা আহার করা যায় তন্মধ্যে ঝাল মশলা যুক্ত খাদ্য অপেক্ষা ঝাল মশলা বর্জ্জিত খাদ্য অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে জীর্ণ হয় ও জীবনীশক্তির সাহায্য করে। উদাহরণ দ্বারা বুঝাইতেছি।

পাশ্চাত্যদেশের উদাহরণটী আমাদের দেশের অবস্থার অনুরূপ করিয়া সামান্য একটু পরিবর্ত্তিত ভাবে লিপিবদ্ধ করিলাম, পাঠ করিলেই বুঝিতে পারিবেন। কোন

একটী লোক উনত্রিশ বৎসর বয়সের সময় কঠিন রোগাক্রান্ত হইয়া চিকিৎসক কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়া মৎস্য মাংস ত্যাগ করিয়া নিরামিষ আহার ধরিলেন; তিনি যে প্রণালীতে তাঁহার নিরামিষ খাদ্য রন্ধন করিতে বলিতেন, তাঁহার বাটীর স্ত্রীলোকেরা তাহা শুনিত না, হাঁসিয়া উড়াইয়া দিত, আবার উল্টে তাঁহাকে মৎস্য মাংস খাইতে দিত, তিনি বাটীর স্ত্রীলোকদের নিকট আর আহারের কথা বলিতেন না, তাহাদের দ্বারা রন্ধনও করাইতেন না, বাটীর বাহিরের একটী ঘরে বাহিরের একটী লোক নিযুক্ত করিয়া তাহার দ্বারা রন্ধন করাইয়া লইতেন। আতপ চাউল খাইতেন, তাহাতে এমন পরিমাণ জল দিতেন যে, জলও শুকাইয়া যাইত, চাউলও সিদ্ধ হইত, মধ্যে মধ্যে ভূষিযুক্ত আটার রুটীও খাইতেন। সেইরূপ খোসা সমেত গোটা মুগ ও তরকারি পরিমাণমত জল দিয়া পৃথক পৃথক সিদ্ধ করিয়া লইতেন। সমস্তই শুষ্ক আহার, কোনটাতেই জলের অংশ বা ঝোল থাকিত না। এক ঘণ্টা বসিয়া চিবাইয়া চিবাইয়া খাইতেন, বৈকালে অথবা রাত্রে ক্ষুধা অনুসারে মিছিরি, দুগ্ধ ও দুই একটী ফল খাইতেন। পিপাসা হইলে জলপান করিতেন। অর্থাৎ আহারের দুই ঘণ্টা পরে একবার, কিম্বা দুইবার, এবং প্রত্যূষে একবার, এই মোট তিনবার উর্দ্ধ সংখ্যা চারিবার জল পান করিতেন। ক্ষুধা অনুসারে এইরূপ আহার করিয়া এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে না খাইয়া তিনি এত দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছিলেন ও সুস্থ দেহে ছিলেন যে তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণ তাঁহার দলভুক্ত হইয়াছিল। এইরূপ করিলে প্রথমে সকলে হাঁসিবে বটে, কিন্তু

উহার সুফল যখন প্রত্যক্ষ করিবে, যখন বুঝিবে যে, রোগ হইতে মুক্ত হইবার ঐ একমাত্র উপায়, তখন সকলেই ঐ পথের অনুগামী হইবে। পরীক্ষা করিয়া প্রত্যক্ষ করুন, তারপর বিচার করিবেন।

এতক্ষণ কি কি বলিলাম ?

১। এক ঘণ্টা ধরিয়া আহার করিতে হইবে। প্রত্যেক গ্রাস একশত বার চর্ব্বণ করিতে হইবে, যতক্ষণ মুখের দলা মাখমের মত নিষ্পেষিত ও সম্পূর্ণরূপ আস্বাদ বিহীন না হয়।

২। আহারের দুই ঘণ্টা পরে জলপান করিবেন; সন্ধ্যার পূর্ব্বক্ষণ পর্য্যন্ত যত বার পিপাসা লাগিবে, ততবার এক পোয়া বা দেড় পোয়া অথবা অর্দ্ধসের জল ধীরে ধীরে পান করিতে পারেন। প্রত্যূষে সূর্য্যের অনুদয়ে দেড় পোয়া বা অর্দ্ধসের জলপান করিবেন। দুই ঘণ্টা পরে জলপানের অভ্যাসটী ক্রমে ক্রমে করিতে হইবে, অর্থাৎ প্রথমে আহারের ৩০ মিনিট পরে জলপান করিবেন, তারপর ৪৫ মিনিট পরে, তারপর এক ঘণ্টা পরে এই রূপে সময় বৃদ্ধি করিয়া দুই ঘণ্টায় আসিতে হইবে।

৩। সর্ব্বশুদ্ধ দিবারাত্রে দুইবার আহার করিবেন। নিরামিষ ও অনুত্তেজক খাদ্য দ্রব্য আহার করিবেন এবং পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে রন্ধন করিয়া খাইবেন। অর্থাৎ অন্নে বা তরকারিতে ঝোল থাকিবে না। এইরূপ আহার অভ্যস্ত হইলে পরে রন্ধন কালে এমত পরিমাণ জল দিবেন, যাহাতে আহার অর্দ্ধ সিদ্ধ হইবে ও সেই সময় জলও মরিয়া যাইবে। এইরূপ অর্দ্ধ সিদ্ধ খাদ্য এবং মধ্য

মধ্যে ফল মূলাদি আহার যখন অভ্যস্ত হইবে, তখন শস্যাদি, ফলমূলাদি প্রভৃতি কাঁচা দ্রব্য, যাহা দেখিলে খাইতে ইচ্ছা করে এবং খাইতে সুস্বাদু সেই সমুদয় আহার করিবার অভ্যাস আরম্ভ করিবেন। প্রতিদিন এক প্রকার আহার না করিয়া নিম্নলিখিত মতে করিবেন এবং দেখিবেন কোন প্রকার আহারে শরীর সুস্থ থাকে। প্রথম দিন দিবসে রুটি, রাত্রে মুগ ভিজা, বোরা ভিজা ও মিছরি অথবা সাগু ভিজা ও বাতাসা। দ্বিতীয় দিন দিবসে ভাত, রাত্রে মুড়ি, নারিকেল ও আতপ অথবা উষ্ণ চাউল ভিজা। তৃতীয় দিন দিবসে রুটি,রাত্রে খৈ, বাতাসা সর, অথবা সাগুভিজা। চতুর্থ দিন দিবসে খিচুড়ি রাত্রে সাগু অথবা বারলি, অথবা যবের ছাতু। পঞ্চম দিন দিবসে চিড়ে (অল্প জলে ভিজান), রাত্রে ফলমূলাদি ও কিঞ্চিৎ বাদাম অথবা কৃষ্ণতিল। ষষ্ঠ দিন দিবসে আতপ অন্ন, রাত্রে উপবাস। সপ্তম দিন দিবসে পরিমাণমত অর্থাৎ ২।৩ ছটাক বা এক পোয়া সাগু ভিজা, রাত্রে ক্ষুধা অনুসারে ঐ আহার অথবা পানিফল ও শুষ্কফল যথা, কিসমিস, মোনক্কা বা আবজুস, সকরপারা, খোবানি, আঞ্জির, ছোহরা প্রভৃতি। অষ্টম দিন দিবসে চাউল ভিজা ও কৃষ্ণতিল রাত্রে ফলমূলাদি। নবম দিন দিবসে গম ভিজা বা সিদ্ধ ও কৃষ্ণতিল, রাত্রে চিড়া ও দধি ও চিনি। দশম দিন দিবসে দুগ্ধ ও ফল, রাত্রে দুগ্ধ সুজি বা দুগ্ধ ও ফল। একাদশ দিন দিবসে চিড়ে দধি ও চিনি অথবা দধি ও চিনি, রাত্রে উপবাস। খাঁটী দুগ্ধ অভাবে দধিই উত্তম পথ্য। কোন কোন রোগী আবার খাঁটী দুগ্ধ সহ্য করিতে পারেন না,

কিন্তু দধি ভোজনে সুস্থ থাকেন। অম্লরস বর্জ্জিত দধি অথবা ঈষৎ অম্লরস যুক্ত দধি ভোজন করিবেন।

যাম মধ্যে ন ভোক্তব্যং যামযুগ্মং ন লঙ্ঘয়েৎ।
যাম মধ্যে রসোৎপত্তি র্যামযুগ্মাৎ বলক্ষয়ঃ॥

অর্থাৎ বেলা ৯টা ৯॥০ টার পূর্ব্বে ভোজন করিলে রসের উৎপত্তি হইয়া ক্রমশঃ রোগ আনয়ন করে। বেলা ১২টার পর ভোজন করিলে বলক্ষয় হয়। অতএব ১০।১১ টার সময় ভোজন করিতে হইবে। এই আহার সম্পূর্ণরূপ জীর্ণ হইয়া ক্ষুধা বোধ হইলে, রাত্রে আহার করিবেন এবং রাত্রে আহার করিয়া, যদি পরদিন প্রাতে অজীর্ণ বোধ হয় এবং তাহা দাস্তে লক্ষিত হয়, তবে সে দিন বেলা ১২টা পর্য্যন্ত উপবাস করিবেন। এই অর্দ্ধ দিন উপবাসের পর যদি ক্ষুধা বোধ হয়, তবে দ্বিপ্রহরের পর বা বৈকালে আহার করিয়া, সেই দিন রাত্রে আর কিছু খাইবেন না। কিন্তু রাত্রে যদি ক্ষুধা বোধ হয়, তবে কেবলমাত্র দুগ্ধ পান করিবেন। যাঁহাদিগকে কার্য্যানুরোধে প্রাতে ৯টা ৯॥০টার পূর্ব্বে আহার করিতে হয়, তাঁহারা বৈকালে ক্ষুধা বোধ হইলে রাত্রের জন্য যে যে খাদ্য উল্লেখ করিয়াছি, সেই সকল খাদ্য আহার করিয়া রাত্রে শয়ন করিবার পূর্ব্বে ক্ষুধা হইলে দুগ্ধ পান করিবেন, এরূপ স্বাস্থ্যপ্রদ আহারের খরচ যে কত অল্প তাহা পরীক্ষা করিলে বিশেষরূপ বুঝিতে পারিবেন।

রুটী ছাতু প্রভৃতি শুষ্ক আহার অভ্যাস করিতে পারিলে, সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। গম পিশিয়া লইয়া তাহার কিছু বাদ না দিয়া রুটী তৈয়ারি হইবে। গমের ভুষি এবং ডাইলের খোসা হজম হয় না বটে, কিন্তু খাদ্যের সহিত উদরস্থ হইলে সমস্তকে হজম করাইয়া পরিপাক শক্তির সহায়তা করিয়া মলের সহিত বাহির হইয়া যায়। যে খোসাযুক্ত খাদ্য চর্ব্বিত হইলে, খোসা নিষ্পেষিত হইয়া যায়—যেমন গোটা মুগ বা বোরা বা ছোলা বা মটর খোসা সমেত খাইলে উহাদের খোসা নিষ্পেষিত হইয়া যায়, সেই সকল খোসাযুক্ত খাদ্য খোসা সমেত খাইবেন। আলুর খোসা সেরূপ হয় না, সুতরাং উহা খোসা সমেত সিদ্ধ করিয়া নরম হইলে খোসা ফেলিয়া খাইতে হইবে। পাথরের ছোট ছোট টুক্‌রা অনেক পাখীতে গিলিয়া খায়, তাহাতে হজম শক্তি বাড়ে; অনেকে প্রত্যুষে গোটা দশ পনর চাউল মুখে দিয়া জলের সহিত আস্ত গিলিয়া খাইয়া থাকেন; এ অভ্যাসটী খুব ভাল। প্রত্যহ দুইবেলা মৎস্য খাওয়া যাঁহাদের অভ্যাস আছে, তাঁহারা প্রথমে এক বেলা মৎস্য খাইয়া রাত্রে নিরামিষ খাইবেন; তারপর এক দিন অন্তর মৎস্য খাইবেন, এই রূপে ক্রমে ক্রমে ছয় মাসে বা এক বৎসরে মৎস্য মাংস ত্যাগ করিবেন। আমার জানিত একটী লোক বলিতেন "আমার বাটী হইতে যে দিন মৎস্য উঠিয়া গিয়াছে, সেই দিন হইতে ঔষধরূপী চিকিৎসক আমার বাটীতে পদার্পণ করেন নাই।" কিন্তু আজ কাল "ঔষধরূপী" চিকিৎ-

মককে প্রত্যহ গৃহে আনিতে না পারিলে মানুষ, মানুষ বলিয়াই গণ্য হয় না। নিরোগী গরুর বাঁটের দুগ্ধ অর্থাৎ ধারোষ্ণ দুগ্ধ পাইলে ইচ্ছামত পান করিতে পারেন। আহারের সহিত অতি অল্প মাত্রায় খাইয়া আহারের এক ঘণ্টা পরে দুগ্ধের সহিত জল মিশাইয়া পান করিবেন। এক নিশ্বাসে সমস্ত দুগ্ধ পান না করিয়া ধীরে ধীরে উহা পান করিবেন। কাঁচা অপেক্ষা জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ অধিক সময়ে পরিপাক হয়। আহারের যে সাধারণ ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে, তাহার মধ্যে দুগ্ধের বিশেষরূপ উল্লেখ নাই। কারণ দুগ্ধ সকল অবস্থাতেই পরিপাক-শক্তি অনুসারে দিতে হইবে। কিন্তু নিরোগী গাভীর দুগ্ধ আবশ্যক। কারণ দুধের ভ্যাজাল নানারোগের জঞ্জাল শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেয়। অনেকের বিশ্বাস যে, দুগ্ধ জ্বাল দিলে ভ্যাজালের দোষ কমিয়া যায়। কিন্তু এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, দুগ্ধের দোষ জ্বাল দিলে যায় না, বরং জ্বাল দেওয়া দুগ্ধ আরও গুরুপাক হয়। একটি তিন মাসের শিশুর অত্যন্ত পেটের অসুখ হয়। গোয়ালের নিকট দুগ্ধ ক্রয় করিয়া খাওয়ান হইত। অসুখ অত্যন্ত অধিক হওয়ায় সেই দুগ্ধে আরও জল মিশাইয়া জ্বাল দিয়া খাওয়ান হইত, তাহাতেও অসুখ কমিল না। এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে নিরোগী গরুর নির্জ্জলা দুগ্ধ পাওয়া গেল, তাহাতে জল মিশাইয়া জ্বাল দিয়া সেই শিশুকে খাওয়াইবা মাত্র অসুখ ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল, এবং ৩।৪ দিনে অসুখ একেবারে সারিয়া গেল। দুগ্ধে যদি দোষ

থাকে, তবে তাহা জ্বাল দিলেও যায় না, উপরোক্ত দৃষ্টান্তটী তাহাই প্রমাণ করিতেছে। আমাদের শাস্ত্রের কথা একজন চিকিৎসক এইরূপে বলিয়াছেন,——

"গরুর দুগ্ধ টাট্‌কা ধরা, মষের কাঁচায় ঠাণ্ডা করা,
ভেড়ার দুগ্ধ থাকিতে উষ্ণ, ছাগদুগ্ধ জুড়ালে শ্রেষ্ঠ।"

যাঁহারা সামান্য রকম অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন তাঁহারা উক্ত প্রকার দুগ্ধ পান করিয়া দেখিবেন রোগ আরোগ্য হয় কি না। কিন্তু অতি পুরাতন ও কঠিন অজীর্ণ রোগাক্রান্ত রোগী রুটী এবং ফল খাইলে সদ্য উপকার পাইবেন। উপরোক্ত প্রণালীর আহার যাঁহাদের ঘটিয়া উঠিবে না, তাঁহাদের শুধু ভাত, ও সেই সঙ্গে ডাইল সিদ্ধ, পটল সিদ্ধ, আলুসিদ্ধ, কাঁচাকলা সিদ্ধ, মিষ্ট ডাঁটার তরকারী প্রভৃতি শুষ্ক আহার করিলে শরীর ভাল থাকিবে। এবং ইহাও যাঁহাদের ঘটিয়া উঠিবে না, তাঁহারা শুধু ভাত বা রুটী ও সেই সঙ্গে তরকারী ও ব্যঞ্জনাদি যাহা খাইবেন, তাহার জলের অংশ বা ঝোল পরিত্যাগ করিয়া শুষ্ক অংশটুকু আহার করিবেন। হাঁপানি, অর্শ, ম্যালেরিয়া, অজীর্ণ, আমাশয় প্রভৃতি রোগে সময় সময় শুধু ভাত অথবা শুধু রুটী (ভুষিযুক্ত আটার রুটী) অথবা কেবলমাত্র ফল রীতিমত চর্ব্বণ করিয়া খাইবার ব্যবস্থাও করিতে হয়, তাহাতে বিশেষ ফল পাওয়া গিয়াছে, যাহা ঔষধে আশা করা যায় না। যাঁহারা পুরাতন রোগে ভুগিতেছেন, অথচ ঔষধ খাইয়া আহারের বন্দবস্ত ঠিক রাখিতেছেন, অথবা সামান্য অসুখ হইবা মাত্র ঔষধ খাইবার জন্য যাঁহারা ব্যস্ত, তাঁহাদিগকে ঐ কথাগুলির সত্যতা

উপলব্ধি করিতে আমি বিশেষরূপ অনুরোধ করিতেছি। আহারের যে বন্দবস্ত আছে, তাহার অন্যান্য সমুদয় বাদ দিয়া কেবল মাত্র অন্ন বা রুটী পূর্ব্বোক্ত রূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইয়া সাত দিন অথবা পাঁচ দিন অথবা অন্তত: তিন দিনের ফলাফল আমাকে জ্ঞাপন করুন, এ কয়দিন ঔষধ না খাইলে মরিবেন না, আমি অভয় দিতেছি; নিশ্চিন্ত মনে ঔষধের পরিবর্ত্তে এই সামান্য পরীক্ষাটী করিয়া আমাকে জানান্, আপনার শরীরে কোন পরিবর্ত্তন আসে কি না; আমি জানিতে চাই, রোগে ঔষধ ও অন্ন ব্যঞ্জনাদি কি উপকার করে, এবং রোগে ক্ষুধা অনুসারে শুধু অন্ন কি উপকার করে। এখন খাদ্যবস্তুর বিষয় বলিতেছি, তাহাই বলি, ঔষধের গুণাগুণ, ঔষধ শরীরে কিরূপ বিষবৎ কার্য্য করে, তাহা পরে ক্রমে ক্রমে বলিব।

আহার যত শুষ্ক হইবে, ততই দন্তের চর্ব্বণ ক্রিয়া সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে, সুতরাং প্রয়োজনীয় লালা সম্যকরূপ নির্গত হইয়া আহারের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি করিবে, যাঁহারা রুটী ও তরকারি অথবা রুটী ও ফল আহার করেন, তাঁহাদের আহার দন্তের চর্ব্বণ ক্রিয়ার অতীব উপযোগী। যাঁহারা ভাত একেবারে গলাইয়া আহার করেন, ও সেই সঙ্গে ডাইলের ঝোল, তরকারির ঝোল, মৎস্যের ঝোল, মাংসের ঝোল, অম্বল, দুগ্ধ ও পানীয় জল প্রভৃতি দ্রব্য আহার করেন, তাঁহাদের চর্ব্বণ করিয়া খাওয়া হইতে পারে না। সুতরাং এই সংখ্যার লোকই অধিক ব্যারামে কষ্ট পায়। ইহা ব্যতীত তরকারিতে অধিক

মস্লা ও লবণ, টক্ বা ঝাল দেওয়াতেও চর্ব্বণ ক্রিয়া হয় না। কারণ, ঝাল, টক, লবণ অথবা মস্লার আস্বাদ জিহ্বাতে অনুভব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আপনিই এত অধিক জল নির্গত হয় যে, তাহাতে মুখের গ্রাস একেবারে "গল্‌গলে" হইয়া যায় অর্থাৎ চর্ব্ব্য খাদ্যের কণা সকল আস্তই থাকে অথচ মুখ এতই জলপূর্ণ হয় যে, চর্ব্বণ করিবার সুবিধাটী থাকে না; সুতরাং আহার জীর্ণ করিবার উপযোগী রস বা লালা সম্যক্‌রূপ নির্গত হইতে পারে না, কিম্বা কথঞ্চিৎ পরিমাণ নির্গত হইলেও তাহা আস্বাদ-রহিত ও নিষ্পেষিত কণার সহিত মিশ্রিত হয় না, সুতরাং চর্ব্বণের উদ্দেশ্য সফল হয় না। ঝালের কি গুণ, টকের কি গুণ এবং মস্লা, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের গুণাগুণ বলিতে গেলে দ্রব্যগুণের অনেক কথা বলিতে হয়, তাহা এস্থলে বলিবার আবশ্যক নাই। সে সম্বন্ধে সংক্ষেপতঃ মাদক দ্রব্যের প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছি তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে। সুতরাং এমন বস্তু আহার করিতে হইবে, যাহাতে চর্ব্বণক্রিয়া রীতিমত হইবে ও সেই সঙ্গে অল্প অল্প করিয়া লালা নির্গত হইবে, এবং সম্পূর্ণরূপে নিষ্পেষিত ও আস্বাদবিহীন খাদ্যকণার সহিত মিশ্রিত হইবে। অতএব আহার করিতে হইবে—যদি দীর্ঘ জীবন ও সেই সঙ্গে সুস্থ শরীর লাভ করিবার ইচ্ছা থাকে—নিরামিষ ও অনুত্তেজক এবং লবণ, ঝাল ও মস্লা বর্জ্জিত শুষ্ক আহার, রন্ধন করিয়াই হউক অথবা কাঁচাই হউক। যাঁহারা ব্যাধিরোগে কষ্ট পাইতেছেন, কিছুতেই কষ্ট দূর হইতেছে না, তাঁহারা ঔষধের পরিবর্ত্তে দিন কয়েক লবণ ঝাল ও মস্লা

বর্জ্জিত নিরামিষ খাদ্য খাইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখুন, রোগের কষ্ট নিবারণ হয় কি না। অবশ্যই কষ্ট দূর হইবে, তখন ঐরূপ পথ্যই পুনরায় রোগের কষ্টাধিক্যে ঔষধের স্থান অধিকার করিবে,ক্রমে ক্রমে ঐ পথ্যই অবলম্বনীয় হইবে। যাঁহারা ফল, মূল ও শস্যাদি কাঁচা খাইতে পারিবেন, তাঁহাদের পরমায়ু এক শত পঞ্চাশ বৎসর হইবেই হইবে। যাঁহারা উপরোক্ত প্রণালীতে অর্থাৎ ঝাল মস্লা ও লবণ যোগ না করিয়া রন্ধন করিয়া খাইবেন, তাঁহাদের আয়ু এক শত বৎসর হইবে এবং যাঁহারা ঝালে, ঝোলে, অম্বলে ও জলে খাইয়া থাকেন,তাঁহাদের সারাজীবন কষ্ট পাইয়া চল্লিশ বা পঁয়তাল্লিশ বৎসরে অকাল মৃত্যু ধ্রুবনিশ্চয়। অন্ততঃ মাসাবধি, না হয় পনর দিন, না হয় সাত দিন এই প্রণালীতে আহারাদি করিয়া কথাগুলির সত্যতা উপলব্ধি করুন তারপর বিচার করিবেন। পরীক্ষা করিবার সময় আপনার শরীরে একটী পরিবর্ত্তন ক্রিয়ার বিশেষ অনুভূতি হইবে। রোগের উপস্থিত উপসর্গ এই পরীক্ষাতে আশু কমিয়া যাইবে; কমিয়া গেলেও যদি কিছু দিন ঐ পথ্যই ধরিয়া থাকেন, দেখিবেন, বহু কালের ঔষধচাপা রোগও বাহির হইয়া দেহটি রোগশূন্য হইবে। অর্থাৎ আপনি বহুপূর্ব্বে যদি কোন রোগে ভুগিয়া থাকেন ও ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসা করিয়া থাকেন, সেই রোগেরও উপসর্গ অতি সামান্যরূপে এক্ষণে প্রকাশিত হইবে, তদ্দ্বারা বুঝিবেন যে, সে রোগটীও নির্দ্দোষ হইয়া সারে নাই, এত দিনে এই স্বাভাবিক পথ্য করায় জীবনীশক্তি অপ্রতিহত হইয়া সেই আবদ্ধ বিষকে অতি অল্প উপসর্গ স

নির্গত করিয়া দিতেছে। নানা প্রকার রোগে যাঁহারা ভুগিয়াছেন এবং এখনও কোন একটী পুরাতন রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতেছেন তাঁহারা ঐ পরিবর্ত্তনটী বিশেষরূপে দেখিতে পাইবেন অর্থাৎ বিনা কষ্টে ক্রমে ক্রমে অতি সামান্য উপসর্গ সহ আবদ্ধ রোগ সমুদয়ের একটী কয়িয়া স্তর একে একে দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়িবে। ঔষধ যে রোগ চাপিয়া রাখিয়া শরীরকে আরও রোগাক্রান্ত করিয়াছিল, সেই সকল রোগ স্তরে স্তরে কিরূপে এই স্বাভাবিক প্রণালীর চিকিৎসায় বাহির হইয়া যায়, তাহা গ্রন্থ শেষে রোগ বিশেষের উদাহরণ পাঠে জানিবেন। জীবনীশক্তি সতেজ থাকা পর্য্যন্ত মানুষ সহজে এ মত অবলম্বন করিতে চায় না। এবং তাহার আরও একটী কারণ এই যে, তদনুরূপ শিক্ষাও পায় না। যখন জীবনীশক্তি একেবারে কমিয়া যায়, ঔষধে আর ফল হয় না, তখন মানুষ প্রকৃতির পথে আসে। ঔষধ প্রয়োগে জীবনীশক্তি কিরূপ প্রকারে নষ্ট হইয়া মনুষ্যকে অল্পায়ুঃ করিতেছে তাহা পূর্ব্বে একটু বলিয়াছি, পরে আরও বলিব। এ স্থলে একটী স্থূল দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রাকৃতিক চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করি। পাশ্চাত্য মহীতলের প্রধান প্রধান নগরে প্রাকৃতিক নিয়মে সকল প্রকার রোগীকে, বিশেষতঃ টাইফইড্ জ্বর, কলেরা ও বসন্ত রোগাক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসা করিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে এবং এখনও পাওয়া যাইতেছে, এবং বহুকাল স্থায়ী পুরাতন, অতিশয় জটিল ও যাপ্যরোগ গ্রস্ত রোগী এই চিকিৎসায় যে ফল পাইয়াছে এবং এখনও পাইতেছে, সেই ফলের সহিত অন্যান্য প্রণালীর চিকিৎ-

LIBRARY

স্যার ফলের তুলনা করিলে স্পষ্ট দেখা যায় যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় শতকরা মৃত্যু সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসায় অপেক্ষাকৃত কম, এবং স্বাভাবিক চিকিৎসায় সর্ব্বাপেক্ষা কম। অর্থাৎ স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতে গেলে বলিতে হয় যে এলোপ্যাথিক চিকিৎসায় শতকরা প্রায় চল্লিশ জন মরে ও ষাইট্ জন বাঁচে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় শতকরা প্রায় পঁচিশ জন মরে ও পঁচাত্তর জন বাঁচে এবং স্বাভাবিক মতে চিকিৎসায় শতকরা মোটে দশ জন মরে ও নব্বই জন বাঁচে। ক্রমাগত ঔষধ রূপ বিষ ঢালিয়া জীবনীশক্তি অতিরিক্ত খরচ করিয়া ফেলিয়াছে এবং অনবরত অস্বাভাবিক রূপে আহার বিহারাদি করিয়া দেহাগ্নি একেবারে নির্ব্বাণপ্রায় করিয়া ফেলিয়াছে সেই রূপ দশ জন এই চিকিৎসায় মরে। এখন কোন্ পথটী ভাল তাহা বিচার করুন। ইংরাজিভাবাপন্ন আমাদের কবিরাজি চিকিৎসাকে এলোপ্যাথির ভাই ভাবিবেন।

৪। আহারের পরিমাণ।

আপনি বোধ হয় দেখিয়াছেন যে,প্রদীপের মুখে মুখে তেল দিলে উহা ভাল জ্বলে না, এবং তেল একেবারে কমিয়া গেলেও ভাল জ্বলে না; মাঝামাঝি অবস্থায় বেশ জ্বলে। আমাদের জীবন-প্রদীপের বেলায়ও ঠিক ঐরূপ জানিবেন। অতি-ভোজন ও অনশন উভয়ই খারাপ। আহারের পরিমাণ ঠিক মাঝামাঝি হওয়া চাই। প্রদীপে তেল ঢালিবার সময় আমরা চাক্ষুষ দেখি যে, প্রদীপের "এই পর্য্যন্ত" তেল দিলে বেশ জ্বলিবে, সুতরাং তাহার বেশীও ঢালি না, কমও দিই না। আহারের সময় আমরা কি সেইরূপ করি? বেশীও নয় কমও নয়, ঠিক পরিমাণমত কয়জন আহার করেন? একজনও নয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের শাস্ত্রে বলে,"কুক্ষির দুইভাগ অন্নে ভর, এক ভাগ জলে পূর্ণ কর, বায়ু যাতায়াতের জন্য চতুর্থ ভাগ রাখ শূন্য।" বলিতেছে, আদ্ পেটা খাইতে হইবে, সিকি খালি রাখিতে হইবে, আর সিকি জল দিয়া পূর্ণ করিতে হইবে। মনে থাকে যেন,পিপাসা হইলে জলপান করিতে হইবে। আহারান্তে যদি পিপাসা বোধ হয়, তবে জলের পরিবর্ত্তে ডাবের জল পান করিবেন,ডাব না পাইলে,দুই তিন চুমুক জল পান করিবেন। ব্যারামের মূল কারণ অপরিমিত আহার; তাহা থাকিয়া গেল, রোগ ক্রমশঃই সঞ্চারিত হইতে লাগিল; গোড়া ছাড়িয়া আগায় ঔষধ দিয়া জীবনীশক্তি ক্রমশঃ ক্ষয় করা হইতে লাগিল। ইহাই হইয়াছে শোচনীয় ব্যাপার!

আহার করিতে করিতে, নিজের বাটীতেই হউক বা পরের বাটীতেই হউক, যখন অনুভব করিবেন যে, উদর পূর্ণ হইয়া আসিতেছে, আর না খাইলেও চলে, ঠিক সেই সময় আহার বন্ধ করিবেন, তাহাতে দুটো পাঁচটা মুখ-প্রিয় সামগ্রী ত্যাগ করিতে হয়, সেও স্বীকার। কিন্তু মানুষের সে সময় লোভ, মোহ ও অর্থ জ্ঞান এতই প্রবল হয় যে, সে মনে করে না "এই কি শেষ খাওয়া? আর কি খাইতে হইবে না?" সুতরাং পেট ফাটিয়া যায় সেও কবুল, তথাপি হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের টাকার জিনিষ ফেলিয়া নষ্ট করা হইবে না। অথচ সামান্য একটী চড়ুই পাখীকে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, সে ছোট এক দলা ভাত মুখে করিয়া আনিয়া একটী ঘরের জানালায় বসিল, ভাতের দলাটি মুখ হইতে নামাইয়া রাখিল, তাহা হইতে একটী মাত্র ভাত চঞ্চুদ্বয় দ্বারা নিষ্পেষিত করিয়া খাইল, পুনরায় আর একটী ভাত ঐরূপে খাইয়া ঘরের কপাটের উপর বসিয়া ঠোঁট মুছিয়া উড়িয়া গেল। জানালার নিকট যাইয়া দেখিলাম, দুইটী ভাত পড়িয়া আছে। কেন পড়িয়া আছে? পাখীও তো পরিশ্রম করিয়া ভাতটী সংগ্রহ করিয়াছিল, কিন্তু সমস্তটী না খাইয়া উড়িয়া গেল কেন? ইচ্ছার অনুরূপ খাওয়া, ঐ সামান্য প্রাণীগণ হইতে শিক্ষা করুন।

কতটি খাইলে ঠিক পরিমিত আহার হইবে, তাহা নির্ণয় করার আর একটি অতি চমৎকার সংকেত আছে। গোড়ার পাঁচ ও আট সংখ্যক প্রশ্ন দুইটি পাঠ করুন। আপনি যে পরিমাণ আহার করেন, তাহার ফলে যদি আপনার কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, অথবা

দাস্ত অতীব শক্ত বা পাত্‌লা, অথবা কতক শক্ত কতক পাত্‌লা অথবা অতিশয় দুর্গন্ধযুক্ত হয়, অথবা দাস্ত শেষ হইলে মলদ্বারে মল লাগিয়া থাকে, অর্থাৎ উক্ত উপসর্গ সমূহের যে কোন একটি উপসর্গ যত দিন থাকিবে, ততদিন বুঝিবেন, আপনার পরিমিত আহার হইতেছে না এবং অজীর্ণ রোগ আছে যাহা উপেক্ষিত হইয়া ভিতরে ভিতরে আরও নানা রোগের সঞ্চার করিতেছে; এই অবস্থায় জানিবেন প্রকৃতি আপনাকে সতর্ক করিবার জন্য পুনঃ পুনঃ ডাকিয়া বলিতেছে, "সাবধান হও, সাবধান হও, সাবধান হও!" কমাইতে কমাইতে (অর্থাৎ প্রথমে অন্ন বা রুটির পরিমাণ না কমাইয়া উহার সহিত যাহা খাওয়া হয় অগ্রে সেইগুলি কমাইতে থাকিবেন, হয়তো অনেকগুলি বাদ পড়িবে, তারপর অন্ন বা রুটির পরিমাণ কমাইবেন, এই রূপে কমাইতে কমাইতে) যখন দেখিবেন উপসর্গ গুলি একে একে গিয়াছে তখন জানিবেন আপনার আহার ঠিক পরিমাণ মত হইল। উপসর্গগুলির উপর সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে হইবে; কোন্‌টা আছে কোন্‌টা গিয়াছে ও কোন্‌টা যাইতেছে, সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে। পরিমিত আহার হইল কি না তাহা জানিবার আর একটি সঙ্কেত আছে; আহার করিয়া সে দিন মানে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে যদি কোন ইন্দ্রিয়ের উত্তেজনা অনুভব করেন, সামান্য উত্তেজনাও অনুভব করেন তবে জানিবেন আহার অতিরিক্ত হইয়াছে। আজ কাল মৎস্য মাংসাদি উত্তেজক আহার অন্ন বিস্তর যে দিন হয় না, সে দিনকার আহার আহার

বলিয়াই গণ্য হয় না। সে দিন যেন ঘাস খাওয়া হইল, মনে হয়। উত্তেজক আহার সকল রোগের মূল, তাহা পরে মাদক দ্রব্যের প্রসঙ্গে বুঝাইয়া বলা হইয়াছে। যে খাদ্য রোগ আনয়ন করে, তাহা কখনই শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রমের অনুকূল হয় না। পাশ্চাত্য দেশে যতগুলি পরীক্ষা হইয়াছে তাহার প্রত্যেকটীতে নিরামিষ ভোজীর জয় ও আমিষ ভোজীর পরাজয় হইয়াছে। পরীক্ষার যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ শ্রবণ করুন। স্থির করা হইল ৩৫ ক্রোশ পথ এক কালীন হাঁটিয়া কে সর্ব্বাগ্রে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারে। ১৪ জন নিরামিষ ভোজীর প্রত্যেকে সামান্য অগ্র পশ্চাৎ ক্রমে গন্তব্যস্থানে ১৪ ঘণ্টা হইতে ১৬ ঘণ্টায় সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে পৌঁছিল। কিন্তু ৮ জন মাংসভোজীর মধ্যে ৭ জন ১৮।১৯ ক্রোশ মাত্র চলিয়াই অবসন্ন হইয়া প্রতিযোগীতায় পরাঙ্মুখ হইয়া পলায়ন করিল, এবং এক জন মাত্র আমিষভোজী গন্তব্যস্থানে অতি কষ্টে নিরামিষ ভোজীদের সকলের পৌঁছানর এক ঘণ্টা পরে পৌঁছিলেন! পৌঁছিয়াই একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন! সৈনিক পুরুষদের উপর যে সকল পরীক্ষা হইয়াছে তাহাও ঐরূপ সন্তোষজনক। উত্তেজক আহারে মস্তিষ্ক গরম হয়, ভাল নিদ্রা হয় না, চিন্তার কাজ ভাল হয় না। বেন্‌জামিন ফ্রাঙ্কলিন্ বলিয়া গিয়াছেন, যে দিন তাঁহার অতি অল্প আহার হইত সে দিন মানসিক পরিশ্রম খুব ভাল হইত। নেপোলিয়নের আহার তৎকালীন প্রচলিত আহারের তুলনায় অনুত্তেজক ও অত্যন্ত কম ছিল, তবুও ঐ সামান্য আহারে তিনি যে পরিমাণ শারীরিক ও মান-

সিক পরিশ্রম করিয়াছেন, তাহা জগতে অতুলনীয়। পূর্ব্বে বলিয়াছি,অমুত্তেজক আহার করিয়া মুনি ঋষিগণএবং গ্রীকগণ কি অদ্ভুত কার্য্যই করিয়া গিয়াছেন। ক্ষুধার পরিমাণমত আহারের পরিমাণ ঠিক করা একটু কঠিন, কিন্তু ঐ দিকে একটু মন দিলে সহজেই আয়ত্ত করিতে পারা যায়। "অনিচ্ছায় খাইব না, পরের অনুরোধে খাইব না, ক্ষুধা না হইলে খাইব না ইহাতে যদি দুই এক বেলা উপবাস করিতে হয় সেও ভাল" এই নিয়মটী দৃঢ়তার সহিত পালন করিলে আহারের পরিমাণ ঠিক হইয়া যাইবে। সুনিদ্রা না হইলে জানিবেন অপরিমিত অথবা অস্বাভাবিক ভোজন হইয়াছে। এতন্মধ্যে দ্বিতীয় সঙ্কেতটী এবং ইচ্ছার বিরুদ্ধে না খাওয়া সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। লর্ড বেকন্ বলিয়াছেন "এক এক সময় খুব বেশি করিয়া খাইবে, এক এক সময় খুব কম করিয়া খাইবে, এবং এক এক সময় উপবাস করিবে;" চিকিৎসকগণ বলেন যে উপর্য্যুপরি নিমন্ত্রণ খাইয়া বা অতিরিক্ত ভোজন করিয়া উপবাস ও জলপান করা বিশেষ উপকারী। ইহাতেও গ্রহণ বর্জ্জন ক্রিয়ার সামঞ্জস্য হইয়া শরীরের কোন হানি করিবে না। কিন্তু ইহাতে বিপদ এই যে, খাইতে গিয়া খাওয়াতেই ডুবিয়া মরে। কত অল্প আহার সুস্থ দেহ ধারণের উপযোগী তাহা ধারণাতীত। সন্তান যদি দুই এক দিন কম পরিমাণ আহার করে পিতা মাতা আজ কাল তাহাতে অজ্ঞান হইয়া পড়েন,বলেন, "ছেলে আর বুঝি বাঁচ্‌বে না!" পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং পরে উদাহরণ পাঠেও জানিবেন যে, মৃত্যুমুখে পতিতপ্রায় এবং চিকিৎসক পরিত্যক্ত কত রোগী

কেবল পরিমিত আহার করিয়া আরও কত কাল সুস্থ কলেবরে জীবিত ছিলেন। সে সকল হয়তো আপনার জানা না থাকিতে পারে, কিন্তু সকলেই প্রায় জানেন—এবং আমিও পঁচিশ বৎসর যাবৎ শুনিয়া আসিতেছি—মহারাজা জ্যোতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এক বাটী সাগু খাইয়া থাকেন। আপনার কি বিশ্বাস হয় যে এক বাটী সাগু খাইয়া মানুষ বৃদ্ধ বয়সে পঁচিশ বৎসর বাঁচিয়া থাকিতে পারে? যে দিন হইতে মহারাজের কঠিন রোগ হইয়াছে সেই দিন হইতে স্বল্পাহার এবং লঘু অথচ পুষ্টিকর আহার আরম্ভ করিয়া কেমন যত্ন সহকারে জীবন প্রদীপটী রক্ষা করিয়া আসিতেছেন! অত্যন্ত কঠিন রোগেও মানুষ স্বল্পাহার করিয়া থাকিতে পারে তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত সম্প্রতি পরলোকপ্রাপ্ত মুর্শিদাবাদের নবাব, (বর্ত্তমান নবাবের পিতা)। ৪৫ বৎসর বয়সের পর পক্ষাঘাত রোগাক্রান্ত হইয়া অতি সাবধানে তিনি জীবন বাতিটী রক্ষা করিতেছিলেন, এবং ১৬ বৎসর যাবৎ অল্প মাত্র আহার অবলম্বন করিয়া সুবাবাঙ্গলার নবাব কুলের প্রদীপটী কিরূপ ভাবে আস্তে আস্তে জ্বলিয়াছে তাহা দেখিয়া সকলেই যুগপৎ বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইয়াছেন। কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি মাননীয় ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৈনিক আহারের মাত্রা শুনিতে পাই ৬।৭ ছটাকের অধিক নয়। ফরাসী দেশীয় লুই করনারো (Louis Cornaro) নামক এক ব্যক্তি ৩৫ বৎসর বয়সে নানা রোগে জড়িত হইয়া কেবল মাত্র আহারের পরিমাণ ঠিক রাখিয়া ১০৫ বৎসর বাঁচিয়া ছিলেন, তাঁহার দৈনিক

চর্ব্য আহারের পরিমাণ ৪।৫ ছটাকের অধিক ছিল না। ইহা হইতে এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, আহার যতই কেন অল্প হউক না, তাহাই যদি শরীর রক্ষার যথেষ্ট উপযুক্ত হয় তবে সেই আহারই শরীরের পক্ষে বিশেষ হিতকারক।

কিন্তু সচরাচর সকলে যে কয়বার আহার করেন সেই কয়-বারের আহার ওজন করিলে বুঝিতে পারিবেন প্রত্যেক বারের আহারের পরিমাণ ন্যূনকল্পে অর্দ্ধসের বা তিন পোয়া হইবে। ঐ পরিমাণ আহার দিবা রাত্রে দুইবার করিলে মোট এক সের বা দেড় সের এবং তিন চারি বার হইলে মোটের উপর দেড় সের বা আড়াই সের হইবে। ন্যূনকল্পের হিসাবে এই হয়, কিন্তু উহা অপেক্ষাও আবার অধিক আহার হইয়া থাকে। দুই একটী নর রাক্ষস আছে যাহারা এককালীন ১০ সের বা অর্দ্ধ মণ পর্য্যন্ত খাইতে পারে, তাহাদের কথা ধর্ত্তব্য নহে। যাহাই হউক ২৪ ঘণ্টায় যদি অত্যধিক পরিমাণ আহার সম্যকরূপ জীর্ণ হইয়া দাস্ত স্বাভাবিক হয় তবে ত খুব উত্তম। নচেৎ তাহা অগ্রে কমাইয়া রোগের প্রতিবিধান করিতে হইবে; ঔষধ দ্বারা অতিরিক্ত পরিমাণ বজায় রাখিতে গেলে রোগে আরও জড়ীভূত হইবেন। মদের জোরে বা কসাঘাতে অতিরিক্ত কার্য্য করিয়া অশ্বের যে দশা হয় আপনারও সেইরূপ অবস্থা হইবে। এক দিন নয় দুই দিন নয়, ক্রমাগত অতিরিক্ত ভোজন জন্য রোগ হইয়াছে, সুতরাং রোগের কারণটী অর্থাৎ অতি ভোজনটী কমাইয়া পরিমাণ

মত করিতে হইবে। তাহা করিতে পারিলে দেখিবেন রোগের মহৌষধ হইয়াছে।

সুস্থ শরীরে অবস্থানুসারে,অর্থাৎ যে ব্যক্তি যে রকম কাজ করে সেই হিসাবে, ২৪ ঘণ্টায় ১২ ছটাক হইতে ১৮ ছটাক পরিমাণ পর্য্যন্ত চর্ব্ব্য খাদ্য জীর্ণ হয়। ইহার অধিক জীর্ণ হইতে পারে না; সুতরাং রোগীর পক্ষে ঐ পরিমাণ চর্ব্ব্য আহার যে অতীব গুরুতর তাহা বলাই বাহুল্য। বিষম দায়ে পড়িয়া পরিমিত আহার না হইয়া সুস্থ শরীরে যদি ঐটী হয় তবে. ৬০।৭০ বৎসর বয়সের সময় মনুষ্যকে অকর্ম্মণ্য ও জীবন্মৃত হইয়া থাকিতে হয় না! বিলাতের রাজধানী লণ্ডন নগরে যাহারা অর্থাভাবে মাটীর নিচে ঘর ভাড়া করিয়া থাকে, পয়সার অভাবে রুটির খোসা শস্তা দরে ক্রয় করিয়া খায়, পরিত্যক্ত হাড় খুর বিনামূল্যে কুড়াইয়া পাইয়া সিদ্ধ করিয়া ঝোল খায় তাহাদেরই কার্য্য করিবার ক্ষমতা, শারীরিক বল এবং পরমায়ু খুব বেশি; তাহাদের অবস্থা ভাল করিয়া দেন, হাতে পয়সা দেন, খাইয়া মরিয়া যাইবে। পিতার বয়স ৯০ বৎসর ও পুত্রের বয়স ৭০ বৎসর এইরূপ দুইটীকে আমি প্রায় ৭।৮ বৎসর পূর্ব্বে দেখিয়াছি, উভয়েই দস্তুর মত মুনিষ খাটিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে। তাহারা কি খাইত? "এক টুকরা রুটী, জল, ও দুটী একটী ফল" অর্থাৎ পূর্ব্ব কথিত স্বাভাবিক আহার অল্প পরিমাণে হইলেই মনুষ্যের যথেষ্ট হইল। সর্ব্ব বিষয়েই আজ কাল অতিরিক্ত।

অতিরিক্ত হইলেই মাদকতা জন্মায়। এ সব কথা মাদক দ্রব্যের প্রসঙ্গে বলিব। এ স্থলে আর একটি আবশ্যকীয় কথা বলিয়া এ প্রসঙ্গটী শেষ করি।

আহারের পরিমাণ ঠিক হইয়া গেলে দেখিতে হইবে সেই পরিমিত আহার আপনার দেহের দৈনিক ক্ষয় পূরণ করিতেছে কি না। সুস্থদেহীকে যদি এক স্থানে বসিয়া কার্য্য করিতে হয় তবে সের পিছে ১৮ গ্রেণ এলবুমেন বা শ্বেতসার (albumen) আবশ্যক। অর্থাৎ দেহের ওজন যদি ৬৫ সের হয় তবে ৬৫ × ১৮ = ১১৭০ গ্রেণ এলবুমেন খাদ্যের সহিত উদরস্থ হইয়া ২৪ ঘণ্টায় জীর্ণ হওয়া আবশ্যক। উক্ত সুস্থদেহীকে যদি উহার উপর কিছু শারীরিক পরিশ্রমও করিতে হয় তবে ৬৫ × ২১ = ১৩৬৫ গ্রেণ এলবুমেন দৈনিক আবশ্যক। ঐ ওজনের একটী বৃদ্ধ লোকের কিন্তু ৬৫ × ১২ = ৭৮০ গ্রেণ মাত্র আবশ্যক। সুস্থ দেহীর ওজন ৬৫ সেরের অধিক হইলেও দেহের দৈনিক ক্ষয় এবং শক্তি অনুসারে ১৪০০ গ্রেণের অধিক এলবুমেন আবশ্যক হয় না। কম ওজনের লোকের দৈনিক আবশ্যকীয় পরিমাণ এলবুমেন জানিতে হইলে কি করিতে হইবে? আপনার দেহের ওজন যদি ৪০ সের হয় তবে ৪০ × ১৮ = ৭২০ গ্রেণ এলবুমেন প্রতিদিন আবশ্যক। কিন্তু রোগ থাকিলে তাহাও জীর্ণ হইবে না, হয়তো ৪০ × ১২ = ৪৮০ গ্রেণ মাত্র জীর্ণ হইবে। দেহের ওজন যদি ৫০ সের হয় তবে ৫০ × ১৮ = ৯০০ গ্রেণ এবং রোগ থাকিলে

৫০ × ১২ = ৬০০ গ্রেণ এলবুমেন আবশ্যক হইবে। রোগের অবস্থায় কোনরূপ পরিশ্রম না করিলে অতি অল্পই এলবুমেন আবশ্যক হয়। এবং যত দিন দেহের আবশ্যকীয় পরিমাণ এলবুমেন জীর্ণ করিতে পারিবেন না তত দিন পর্য্যন্ত কোনরূপ পরিশ্রম করিবেন না; করিলে (Slow starvation) অর্থাৎ ক্রমিক অনশন জনিত রোগে মৃত্যু ঘটিবে। শরীরের ওজন, শক্তি ও কার্য্য অনুসারে দৈনিক ৭০০ হইতে ১৪০০ গ্রেণ এলবুমেন আবশ্যক ছোট ছেলেদের ৪০ গ্রেণ হইতে ৬০ গ্রেণ পর্য্যন্ত সের পিছে দরকার। ১৮ সের ওজনের একটী ছেলের ১৮ × ৬০ = ১০৮০ গ্রেণ আবশ্যক হইতে পারে। দুগ্ধে শরীর গঠনোপযোগী অন্যান্য উপাদানের সহিত যথেষ্ট পরিমাণ এলবুমেনও আছে বলিয়া দুগ্ধই তাহাদের প্রধান খাদ্য। এক্ষণে নিম্নের তালিকা দৃষ্টে বুঝিবেন আপনার দেহের ওজন অনুসারে এবং কার্য্য অনুসারে কত পরিমাণ এলবুমেন প্রতিদিন আবশ্যক, এবং সেই পরিমাণ এলবুমেন খাদ্যের সহিত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক বারে অথবা দুই বারে উদরস্থ হইয়া জীর্ণ হইতেছে কি না।

এক ছটাক রুটিতে	৬৮	গ্রেণ	এলবুমেন	আছে।
” খাঁটী দুগ্ধে	২৬	”	”	”
” পনির বা শুষ্ক ছানায়	২৮০	”	”	”
” তণ্ডুলে	৪৩	”	”	”
” আলুতে	১৮	”	”	”
” ফলে	১৮	”	”	”

এক ছটাক শুষ্ক ফলে	২৬ গ্রেণ	এলবুমেন	আছে।
" বাদামে	১৮০	"	"	"
" অন্যান্য তরকারিতে গড়ে	১৬	"	"	"
" পেস্তা বাদাম জাতীয় মেওয়া ফলে গড়ে	১৩১	"	"	"
" বিস্কুটে	৮৬	"	"	"

ডাইলের মধ্যে মুগ ও ছোলা এই দুইটী প্রশস্ত। সকল রকম ডাইলে চাউলের প্রায় দ্বিগুণ এলবুমেন আছে কিন্তু চাউলে রোগের বীজ আদৌ নাই, অনেক ডাইলে তাহা আছে। কিন্তু উক্ত দুই প্রকার ডাইল বিশেষতঃ মুগের ডাইল খাইলে কোন অসুখ করিবে না। অন্যান্য ডাইল রোগীর পথ্য নহে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় ডাইল বিশেষতঃ মসুর ও মাস কলাই ইউরিক এসিড (Uric acid) অর্থাৎ রোগের বীজ উৎপন্ন করে বলিয়া তাহাদিগকে বর্জ্জন করাই বিধেয়। (Uric acid) ইউরিক এসিডের বিষয় পরে মাদক দ্রব্যের প্রসঙ্গে বলিব।)

পরিমিত আহারের সহিত অতিরিক্ত এলবুমেন খাওয়া হইতেছে কি না (Over-feeding) কিম্বা কম পরিমাণ এলবুমেন খাওয়া হইতেছে কি না (Under-feeding) অর্থাৎ পথ্যাদি বিষয়ে সমস্ত ভুল (Wrong diet) উক্ত তালিকা সাহায্যে সংশোধন করিয়া লইবেন। অন্ধবৎ চলিবেন না। যাহা

খাইতে অভ্যস্ত হইয়াছেন এবং যে সকল দ্রব্য খাইয়া জীবন পথে চলিতেছেন, তাহাতে শরীর পোষণের আবশ্যকীয় এলবুমেন বা শ্বেতসার আছে কি না, কিম্বা তাহাতে অতিরিক্ত এলবুমেন আছে কি না তাহা জানা বিশেষ দরকার। রোগ হইলে খাদ্যাখাদ্যের বিচার করিয়া কেহই রোগের কারণ অনুসন্ধান করেন না। দুগ্ধ, রুটী, অন্ন তরকারি ও ফল এই সকল অনুত্তেজক খাদ্যে কোন রোগের বীজ নাই, কিন্তু মৎস্য,মাংস,ডিম্ব,ডাইল, ঝাল ও মসলা এই সমুদয় উত্তেজক খাদ্যে সর্ব্বপ্রকার রোগের বীজ আছে। এই কথা গুলি বিজ্ঞান-সম্মত। অতএব যদি রোগের কারণ ধরিতে ইচ্ছা করেন তবে প্রথম শ্রেণীর খাদ্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর খাদ্যগুলিকে বর্জ্জন করিবেন। কিছুকাল পর্য্যন্ত অর্থাৎ অন্ততঃ ছয়মাস কাল পর্য্যন্ত ঐরূপ অনুত্তেজক আহার ধরিয়া থাকিলে উহার সুফল এই বুঝিবেন যে, রোগের উপসর্গ সকল ক্রমে ক্রমে কমিয়া আসিতেছে, অর্থাৎ উপসর্গগুলি পূর্ব্ববৎ প্রবল ও কষ্টদায়ক নাই। এই সময় পুনরায় মৎস্য মাংস, ডিম্ব, ডাইল, ঝাল মসলা প্রভৃতি উত্তেজক খাদ্য একে একে খাইয়া দেখিবেন রোগের উপসর্গগুলি আস্তে আস্তে চোরের মত আসিয়া আপনাকে আক্রমণ করিবে। এবং উপসর্গগুলি ক্রমে ক্রমে প্রবল ও কষ্টদায়ক হইবে।

এরারুট,সাগু,এবং পানিফলে চাউল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ কম এলবুমেন আছে, এবং উহাদের অন্যান্য উপাদান চাউলের তুল্য।

ভুট্টা, জওয়ারি, বাজরা, কাঙ্গনি, যই, যব, বারলি, এই সকল খাদ্যে চাউল অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক এলবুমেন আছে, এবং উহাদের অন্যান্য উপাদান প্রায় চাউলের তুল্য। ঘৃত তৈলাদির উল্লেখ করিলাম না কারণ উহাতে এলবুমেন আদৌ নাই, বসা বা চর্ব্বিতেই উহা পরিপূর্ণ। শরীর রক্ষার উপযুক্ত চর্ব্বি উপরোক্ত সমুদয় খাদ্যেই আছে, সেই গুলি অগ্রে জীর্ণ হউক তারপর ঘৃত তৈলের ব্যবস্থা করা যাইবে।

৫।৬।৭।৮। দাস্ত।

দাস্তই স্বাস্থ্যের মূল। অনেকেই বলেন তাঁহাদের দাস্ত পরিষ্কার হয়, কিন্তু—। দাস্ত যদি পরিষ্কার হইল তবে ত ব্যারাম হইতেই পারে না। দাস্তর প্রতি বিশেষ লক্ষ্য করিয়া বলুন দেখি উহা কিরূপ হয়? গোড়ার ৫।৬।৭।৮ এই চারিটী প্রশ্ন পাঠ করুন এবং বলুন কোন্ উপসর্গ আপনার দাস্তে আছে। একেবারে পরিষ্কার রূপে মল নির্গত হইয়া যাইবে, তজ্জন্য কুন্থন বা বেগ দিতে হইবে না, সহজে ও বিনা পরিশ্রমে মলত্যাগ হইবে, বসিবা মাত্র দাস্ত শেষ হইবে, দুই চারি মিনিটের অধিক সময় লাগিবে না ও মলদ্বার দাস্ত হওয়ার পর অপরিষ্কৃত হইবে না; ছোট ও মোটা বাতির ন্যায় একটি কিম্বা দুইটী নরম ও জমাট মল নির্গত হইবে; রং ঈষৎ বাদামি হইবে ও দুর্গন্ধ নাকে লাগিবে না; এবং এক প্রকার পিচ্ছিল পদার্থ দ্বারা আবরিত থাকিবে। প্রস্রাবের রং ঈষৎ রঞ্জনের রংএর মত হইবে। এই রূপ হইলে জানিবেন আপনি খুব সুস্থদেহী ও ভাগ্যবান। এরূপ ভাগ্যবান কয় জন আছেন? এ সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও চিকিৎসকের অভিজ্ঞতা নিম্নে প্রদত্ত হইল। তিনি বলিতেছেন যে, সভ্য জগতের অধিকাংশ লোক এমন কি শতকরা

৯০ জন লোক মলভাণ্ড দোষজনিত নানা প্রকার রোগে অকালে জরা ও মৃত্যু কবলে পতিত হয়। সর্ব্ব প্রকার রোগের কারণ অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত তিনি ২৮৪ জন রোগীর মৃত দেহ ছেদন করিয়া দেখিয়াছেন যে, কেবল মাত্র ২৮ জন রোগীর মলভাণ্ড স্বাভাবিক অবস্থায় ছিল, অবশিষ্ট ২৫৬ জনের অস্বাভাবিক অবস্থাপ্রাপ্ত সত্ত্বেও তাহাদের জীবদ্দশায় তাহাদের জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে দাস্ত নির্গত হইত, অথচ মৃত্যুর পর শবচ্ছেদে দেখা গেল যে, তাহাদের মলভাণ্ড চারি হইতে ছয় ইঞ্চি লম্বা বড় বড় কীট পোকায় পরিপূর্ণ এবং থলে থলে ডিম ও কীটাণু পরিপূর্ণ। দিন দিন এইরূপ অভিজ্ঞতা লাভের সহিত ইহাও জানিতে পারিলেন যে, যে মল মলভাণ্ডের গাত্রে কঠিন হইয়া জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে তাহা কোন ঔষধেই পরিষ্কার করিয়া বাহির করিতে পারে না। সুতরাং রোগের বীজ থাকিয়া যায়। আপনার মনে হইতে পারে "এ সামান্য আবিষ্কারটী পূর্ব্বে হয় নাই কেন? তদুত্তরে তিনি দুইটি কারণ প্রদর্শন করিতেছেন। প্রথম কারণ এই যে, শবচ্ছেদ কালে মলভাণ্ডটীকে অগ্রেই ছেদন করিয়া উহার দুই মুখ বাঁধিয়া বাহিরে ফেলিয়া দেওয়া হয়। কারণ শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই জানেন যে উহা মলে পরিপূর্ণ ও অতিশয় দুর্গন্ধ যুক্ত এবং উহা শবচ্ছেদগৃহে রাখিলে দুর্গন্ধে শিক্ষা কার্য্য হইবে না। মলভাণ্ডের স্বাভাবিক অস্বাভাবিক অবস্থার বিষয় কাহারও মনে হয় না অর্থাৎ উহা এতই দুর্গন্ধ পূর্ণ যে উহাকে এক মুহূর্ত্তের জন্যও নিকটে

রাখিতে পারা যায় না, এটী উহার স্বাভাবিক কি অস্বাভাবিক, অবস্থা অথবা অতিশয় দুর্গন্ধ পূর্ণই যদি হয় তবে সেই দুর্গন্ধ মল পরিপূর্ণ ভাণ্ড স্বাস্থ্যের হানিকর কি না, এ সকল প্রশ্ন যে কাহারও মনে উদয় হয় না, তাহা ভাবিলে অতি আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়! দ্বিতীয় কারণ, অহং জ্ঞান ও স্বার্থপূর্ণ গোঁড়ামি। কারণ, দাস্তের সামান্য একটু অস্বাভাবিক অবস্থা হইলেই যদি পথ্যের ভুল সংশোধন করা যায় তবে ঔষধ ব্যবহার করিতে হয় না; এবং ঔষধ ব্যবহার না করিয়া রোগ ভাল করিতে চেষ্টা করা মানুষের চলাপথের বিপরীত পথে চলা। বিপরীত পথে চলিলেই লোকে আপনাকে নির্ব্বোধ অথবা হাতুড়ে বলিবে। কিন্তু চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করুন তিনি যে সকল চিকিৎসাতত্ত্বের বিষয় লইয়া আছেন তাহা কি কোন ব্যবসাদার চিকিৎসক কর্তৃক আবিষ্কৃত কিম্বা তদাখ্যাত হাতুড়ে কর্তৃক আবিষ্কৃত হইয়াছে অতএব অসুস্থ অবস্থায় প্রকৃতি অনুযায়ী আহারাদি করিলে স্বাস্থ্য লাভ করিবেন। তখন দিবসে একবার অথবা দুই বারের অধিক দাস্ত হইবে না। বেশি দাস্ত হওয়া ও পাইখানায় বসিয়া কুন্থন দেওয়া নানা রোগের কারণ এ অবস্থায় তাড়াতাড়ি ঔষধ না খাইয়া যদি চিন্তাপূর্ব্বক অতিরিক্ত ভোজন ও কুপথ্য হইতে দূরে থাকিতে পারেন তবে ফল যে কিরূপ শুভজনক ও সুখপ্রদ হয় তাহা বর্ণনাতীত! কেবল মাত্র দাস্তের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহাকে স্বাভাবিক করিতে পারিলে সমস্ত ব্যাধি হইতে

আরোগ্য লাভ করিতে পারা যায়, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এইটী অভ্যস্ত করিতে হইলে স্বাভাবিক আহার করিতে হইবে এবং প্রকৃত ক্ষুধা হইলে আহার করিতে হইবে এবং পাই-খানায় দুবেলা গিয়া বসিয়া থাকিবেন, কুন্থন বা জোর করিয়া বেগ দিবেন না; ক্ষণেক বসিয়া থাকিলেই দাস্ত আপনিই মলদ্বারের নিকট নামিয়া আসিবে, সেই টুকু বাহির করিতে অতি সামান্য বেগ দিবেন। শরীর খুব সুস্থ হইলে বেগ মোটেই দিতে হইবে না। বসিবা মাত্র আপনি দাস্ত নির্গত হইয়া যাইবে। অর্শরোগাক্রান্ত রোগীর এটী মহৌষধ। মল মূত্রের এবং বায়ু নিঃসরণের বেগ হওয়া মাত্রই উহাকে ত্যাগ করিতে হইবে। সুস্থান কুস্থান জ্ঞান দূর করিয়া, সুবিধা অসুবিধার মুখে ছাই দিয়া শত কাজ থাকিলেও তাহা ছাড়িয়া উঠিয়া গিয়া মলমূত্র ত্যাগ করিয়া আসিতে হইবে। মলমূত্রের অসহ্য বেগ কঠিন রোগের লক্ষণ। দেহের স্বাভাবিক অবস্থায় অথবা দেহকে ঐ অবস্থায় আনিবার জন্য স্বাভাবিক নিয়মগুলি পালন করিবার সময়ে যে বেগ হইবে তাহা অসহ্য হইবে না। মলমূত্র ও বায়ু ত্যাগের একটী স্বাভাবিক ইচ্ছা হইবে এবং ঐ ইচ্ছাটী হইবা মাত্র উহা পূর্ণ করিতে হইবে। দাস্ত সম্বন্ধে আরও দুটি একটী কথা পরে "রোগ তত্ত্বে" পাইবেন।

সর্ব্বদা দাস্তর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মনে মনে এই সকল প্রশ্ন করিবেন "শরীরের সমুদয় যন্ত্রের ক্রিয়াগুলি কেমন হইয়াছে? কোন

ক্রিয়া অসম্পূর্ণ হইয়াছে কি না? আজ শরীর কেমন আছে? ভাল না মন্দ"? ভাল থাকিলে তাহার কারণ এবং মন্দ থাকিলে তাহার কারণ চিন্তা ও পর্য্যালোচনা করিয়া অনুসন্ধান করিবেন। আহারাদির (diary) অর্থাৎ প্রতিদিন কি কি আহার করেন ও তাহার ফলে শরীর কেমন থাকে এই সকল কথা একটী খাতায় লেখা আবশ্যক, তবে পর্য্যালোচনা ও চিন্তা করিবার বিশেষ সুবিধা হইবে। অন্ন পানের যত দোষ হয় তাহার ফলে পেটের মধ্যে এক প্রকার বিষ উৎপন্ন হয়; সেই বিষ কতক্ষণ অজ্ঞাত ভাবে থাকে ও কখন ঐ বিষের ক্রিয়া আমরা জানিতে পারি, এবং জানিতে পারিয়াও কত দিন আমরা নিশ্চেষ্ট ভাবে, অবলম্ব রহিতের ন্যায়, শূন্যে নির্ভর করিয়া থাকি, এবং কখন চৈতন্য হয়, ও সে সময় কিরূপ প্রতিকার করা উচিত এই সব বিষয়ের চিন্তা করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। প্রত্যহই যদি আহারাদির কোন না কোন দোষ বা অনিয়ম বাহির করিব এইরূপ একটী বলবতী ইচ্ছা পোষণ করিতে পারেন তবে রোগও আক্রমণ করিতে পারে না এবং অকালে মরিতেও হয় না। আমরা যে প্রণালীতে আহারাদি করিতে অভ্যস্ত হইয়াছি তাহাই করিয়া যাই ইহাতে "যে কয় দিন ভাল চলে তাহাই ভাল" এই যে একটী জ্ঞান আমাদের আছে তাহা যথার্থ ঠিক কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যখন বুঝিব উহা ভুল, তখন উহাকে ত্যাগ করিবার ইচ্ছা যেরূপ বলবতী হইবে সেটুকু হাজার উপদেশ শুনিলে বা পড়িলেও হইবে

না। চিকিৎসক এ সব ভুল দেখাইয়া দিবে না ঔষধ দিয়া ভুলের উপর আরও ভুল করিয়া দিবে, সুতরাং চিকিৎসকের নিকট কোন আশা করা বৃথা। তদ্ব্যতীত চিকিৎসকগণও অনেক বিষয়ে অজ্ঞ। যে নিয়মটী আপনার ভাল লাগে সেইটী ধরিয়া চলুন; এইরূপে চলিতে চলিতে যখন উহার সুফল উপলব্ধি হইবে তখন ঐ পথই আপনার একমাত্র অবলম্বনীয় স্থির করিবেন ও অন্যান্য নিয়মগুলিও পালন করিবার ইচ্ছা অত্যন্ত বলবতী হইবে। দিন কয়েক পরীক্ষাকরিলেই ত জানা যায় আহারের সহিত জলপান করা ভাল, না, পরে পিপাসা হইলে পান করা ভাল; চর্ব্বণ করিয়া মুখের দলাকে মাখন বৎ নিষ্পেষিত ও আস্বাদ রহিত করিয়া আহার করা ভাল, না, ঝালে-ঝোলে-জলে গিলিয়া আহার করা ভাল, সুস্বাদু এবং রসাল ফল আহার করা ভাল, না, বিকৃত আহার ভাল; ফল দেখিয়া উভয়ের তারতম্য বুঝিতে পারিবেন। কোন্‌টী পালন করিলে শরীর স্বাস্থ্যের পথে যায় ও কোন্‌টী অনুসরণ করিলে শরীর রোগের পথে যায়। এইরূপে স্বাস্থ্যের পথ কোন্‌টী তাহা জানিয়াও যদি রোগের পথটীই ধরিয়া থাকি তবে "আজ এ ব্যারাম কাল সে ব্যারাম" এই ভাবে হঠাৎ কোন না কোন রোগে, বা অসাধ্য রোগে জীবন্মৃত হইয়া, অকালে মরিতে ত হইবেই! শরীর আপনার নাখেরাজ মাটি নয় যে চিরদিন একভাবে যাইবে। অথবা লৌহময় নয় যে, আজীবন অত্যাচারেও অটুট থাকিবে। বাল্যকাল হইতে যে সমুদয় অনিয়ম করা হয়, তাহার ফলে কিশোর বয়সে ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্ররোগ দেখা দেয়,সেই সকল কমজোরবিশিষ্ট রোগকে যৌবনের বলের সহিত ঔষধের বলে প্রায়ই চাপিয়া রাখা হয়, এবং যৌবন উত্তীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ক্ষুদ্র রোগ বিরাট মূর্ত্তিতে দেখা দিয়া থাকে। রোগ দূর করিয়া দিবার ক্ষমতা আর শরীরের থাকে না ; সে শক্তির ঔষধ যোগে অতিরিক্ত চালনায় ও অস্বাভাবিক রূপে ঔষধ দ্বারা পরিচালনায় শক্তিটী হীন হইতে হীনতর ও শেষে লোপ হইয়া যায়! বৃক্ষের উপর দিয়া যতই কেন ঝড় বহিয়া যাউক সে তাহার মস্তক উত্তোলন করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিবেই ; সেইরূপ শরীরও অনবরত তাহার স্বীয় প্রকৃতি গুণে ভালর দিকে যাইবার চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু এই সকল বাধা এবং অনিয়ম কত দিন অতিক্রম করিবে? প্রবল ঝড়ে বৃক্ষের ন্যায় উহার অকাল পতন হয়! বাল্যকাল হইতেই যিনি স্বভাবের দিকে স্বভাবতঃ চলিয়াছেন,প্রকৃতির সহিত প্রতিকূলাচরণ করেন নাই তাঁহাকে অকালে মরিতে হইবে কেন? প্রত্যেকেই একটু সতর্কতার সহিত চলিলে অর্থাৎ "এই মুখরোচক তরকারি, বা ব্যঞ্জন বা এই দ্রব্যটী ছিল বলিয়া অদ্যকার এই ভাত কয়টী উঠিল, নচেৎ উঠিত না," এই কৃত্রিম নিয়মের বশবর্ত্তী না হইয়া "ক্ষুধা লাগিলে বাঘে ধান খায়" এই স্বাভাবিক নিয়মটী অনুসরণ করিলে সুস্থ শরীরে অনেক কাল পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারেন এবং অবশেষে পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হইয়া যখন ইহধাম ছাড়িয়া যাইবার সময় উপস্থিত হইবে তখনও মৃত্যু হঠাৎ আক্রমণ না করিয়া অতি মৃদুভাবে তাহার হস্ত দেহযন্ত্রের উপর স্থাপন

করিবে যেন উহার ঝঙ্কার ক্রমে নিস্তব্ধ হইয়া যায় কোনরূপ কষ্ট না হয়। ("and yet, with reasonable care, we can most of us keep this wonderful organisation in health, so that it will work without causing us pain, or even discomfort, for many years: and we may hope that when death comes at last: Time may lay his hand upon your heart gently not smiting it, but as a harper lays his open palm upon his harp to deaden its vibrations'.") অতএব সেই রূপ চলিতে শিখিতে হইবে। অন্ধের ন্যায় চলিলে কূপে পড়িয়া মরিতে হইবেই। বিদ্যালয়ে বালকদিগকে কুস্তি প্রভৃতি ব্যায়াম শিক্ষা দেওয়া হয় বটে কিন্তু পথ্যের নিয়মাদিও যদি সেই সেই সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয় তবে ফল যে কত চিরস্থায়ী ও শুভজনক হয় তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। বিদ্যালয় ব্যতীত আরও কত প্রকার সভা সমিতিতে কত প্রকার শিক্ষা দেওয়া হয় কিন্তু স্বাস্থ্য-সমিতি স্থাপন করিয়া যদি এই নিয়মগুলি কার্য্যে পরিণত করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয় তবে ভিত্তি পাকা হয়। নবনী সমান শিশুদের মনে যাহা অঙ্কিত করিবেন এবং কার্য্যদ্বারা যাহা শিক্ষা দিবেন তাহাই চিরদিনের মত থাকিয়া যাইবে। চিকিৎসকগণ শিশুদের বুঝাইয়া দিবেন, স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে হইবে, অথবা ব্যারাম হইলে, পথ্যের উপর যোল আনা শুভাশুভ নির্ভর করে, এবং তাহা কার্য্যতঃ দেখাইয়া দিবেন এইরূপে পিতা মাতা ও চিকিৎসক

গৃহে এবং শিক্ষক মহাশয় বিদ্যালয়ে শিশুদিগকে এই জ্ঞানটী দিলে অশেষ মঙ্গলের হইবে। চিকিৎসক কি শিক্ষা দিবেন তাহার আভাস পরে ক্রমে ক্রমে পাইবেন।

৯। স্নান।

স্বভাবতঃ শরীর অত্যন্ত গরম হইলে স্নান করা উচিত; যেমন একটী লৌহ খণ্ডকে আগুনে পোড়াইয়া লাল করিয়া ঠাণ্ডাজলে চুবাইলে খুব শক্ত হয়, তেমনি ঠাণ্ডা জলে স্নান করিলে ত্বগেন্দ্রিয় দৃঢ় ও শরীর শীত-সহিষ্ণু হইয়া থাকে। কিন্তু শরীর উত্তেজিত না হইয়া স্বভাবতঃই যে সময় খুব গরম হয়, সেই সময় স্নান করা কর্ত্তব্য। এবং স্নান করিয়া উঠিবা মাত্র

যদি ঠাণ্ডা বোধ হয় অর্থাৎ "গা শীত শীত করে", তবে বিছানায় গরম কাপড়দ্বারা শরীর আবৃত করিয়া প্রায় এক ঘণ্টা থাকিতে হইবে, যতক্ষণ শরীর গরম না হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, কয়দিন অন্তর স্নানকরিলে শরীর স্নানসময়ে, অথবা স্নানের অব্যবহিত পূর্ব্বে বা পরে শীত শীত করে না; সেই কয় দিন অন্তর স্নান করিতে হইবে। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা বিশেষ দরকার; ভিতরে এবং বাহিরে, অর্থাৎ স্বাভাবিক আহার করিয়া ভিতর পরিষ্কার রাখিতে হইবে এবং বাহিরে ত্বগিন্দ্রিয়কে ঘর্ষণদ্বারা কার্য্যকরী রাখা স্বাস্থ্যান্বেষীদিগের আবশ্যক। অনেকে প্রাতঃস্নান না করিলে সে দিন কাজ কর্ম্ম ভালরূপ করিতে পারেন না; একজন বিখ্যাত পাশ্চাত্য ডাক্তার বলেন, ইহাতে লাভ দূর হউক লোক্‌সানের সম্ভাবনাই অধিক। দিনমানের কার্য্যের জন্য শরীরকে প্রাতঃস্নান দ্বারা প্রত্যহ উত্তেজিত করিতে করিতে জীবনীশক্তি ক্রমশঃ দেউলিয়া প্রাপ্ত হয়। যিনি যেমন অভ্যাস করিয়াছেন, তিনি সেই মতই স্নান করেন। দস্তুরমত একটা অসুখ না হইলে স্নান বা আহার বন্ধ করেন না। শিশুরা কিন্তু স্বভাবতঃ স্নান করিতে চায় না, শীতকালেতো জল দেখিলে ভয় করে,জলে নামিতেই চায় না। আমার একটী আত্মীয়ের শৈশব কালের এই অভ্যাসটী থাকিয়া গিয়াছে,জোর জবরদস্তি করিয়া তাঁহাকে স্নান করান হয় নাই, তাঁহার বয়স এখন প্রায় ৪০বৎসর হইবে, কিন্তু স্নান করার নিয়মটী পূর্ব্ববৎ আছে; অর্থাৎ মাসে বড় জোর এক দিন কি দুই

দিন অবগাহন স্নান করেন, অর্থাৎ শরীর স্বভাবতঃ খুব উত্তপ্ত না হইলে স্নান করেন না, এবং প্রত্যহই দিনমানের কাজ কর্ম্ম শেষ হইলে শরীরটী বেশ করিয়া রগড়াইয়া রগড়াইয়া ময়লা তুলিয়া ফেলিয়া অল্প ভিজা গামছা দিয়া গাত্র মুছিয়া ফেলেন; আমি কখন তাঁহাকে কোন প্রকার অসুখ ভোগ করিতে দেখি নাই।

আমাদের শরীরে যে নয়টী ছিদ্র বা দ্বার আছে তাহা ব্যতীত অসংখ্য ছিদ্র সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া আছে, ইহাদিগকে লোমকূপ বলে। শরীরের ব্যাধি ও ময়লা নির্গত হইয়া যাইবার জন্য দেহটী কি অদ্ভুত রূপেই সৃষ্ট হইয়াছে! লোমকূপ দিয়া ঘর্ম্ম বা ময়লা নির্গত হইয়া থাকে। এই ঘাম যাহার বাহির হয় না, জানিতে হইবে তাহার রোগ হইয়াছে, বা রোগের সৃষ্টি ভিতরে ভিতরে হইতেছে।

সুস্থদেহীর ত্বগিন্দ্রিয় স্পর্শ করিলে ঈষৎ উষ্ণ ও আর্দ্র বোধ হইবে তাহার বিপরীত ভাব হইলেই অর্থাৎ রুক্ষ বা খস্‌খসে বা শুষ্ক এবং শীতল বোধ হইলে জানিতে হইবে, রোগের সৃষ্টি হইয়াছে। রোগশূন্য দেহ হইতে দুর্গন্ধ ঘর্ম্ম নির্গত হইবে না; দুর্গন্ধযুক্ত ঘর্ম্ম রোগের লক্ষণ, কিন্তু রোগের এই অঙ্কুর অবস্থায় কে সতর্ক হয়? কয়জন লোক শরীরের আবদ্ধ বিষকে এই সামান্য অবস্থায় বাহির করিয়া থাকেন! এই অবস্থায় স্বাভাবিক আহার অবলম্বন করিয়া গরম জলের ভাপ্‌রা দিয়া সমস্ত শরীর বিশেষতঃ তলপেটকে স্নাত করাইলে ব্যাধি অঙ্কুরেই

মল-মূত্র-ঘর্ম্ম রূপে বাহির হইয়া যায়, আর বিকশিত হইতে পারে না।

এক হাত চওড়া ও আড়ে তিন হাত লম্বা সছিদ্র বেতের খাটে অথবা দড়ির খাটে বা বাঁশের মাচায় সম্পূর্ণ রূপ নগ্ন হইয়া শয়ন করিয়া, অথবা সছিদ্র বেতের চেয়ারে একেবারে উলঙ্গভাবে উপবেশন করিয়া, সমস্ত অঙ্গ এবং চেয়ার বা খাট কম্বল দিয়া সম্পূর্ণরূপে ঢাকিয়া, নিম্নে একটী অথবা দুইটী ফুটন্ত গরম জলের হাঁড়ি রাখিয়া, তাহার ঢাকনা অল্প অল্প খুলিয়া সহ্যমত ভাপ্ লইতে হইবে; অভাব পক্ষে, একটী ফুটন্ত গরম জলের হাঁড়ি কোলের নিকট রাখিয়া একটী কাষ্ঠাসনে বসিয়া ঐরূপে ভাপ্ লইলেও হইবে। ১৫ মিনিট এইরূপ স্নান করিলে প্রত্যেক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হইতে ঘর্ম্ম বাহির হইবে। তখন গাত্র অনাবৃত করিয়া অল্প ভিজা ও খরখরে গামছা দিয়া গাত্র মুছিয়া ময়লা তুলিয়া ফেলিতে হইবে, ও অব্যবহিত পরে সহ্যমত ঠাণ্ডা জলে অল্প করিয়া গা ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে; এবং পরে বস্ত্রাবৃত হইয়া শরীরের উত্তাপ-রক্ষা করিতে হইবে। শরীর অল্প ঘর্ম্মাক্ত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ ভাবে থাকিতে হইবে। রোগ বিশেষে এইটী নানা প্রকারে প্রয়োগ করা যাইতে পারে। রোগ প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে লোম-কূপ বদ্ধ হইয়া যায়, ঘর্ম্ম নির্গত হইতে পারে না; স্নান করার উদ্দেশ্যই লোম-কূপ সকল উন্মুক্ত রাখা। কিন্তু সেই উদ্দেশ্য সাধনের পথে অস্বাভাবিক আহার মহা কণ্টক।

দিনান্তে একবার অল্প ভিজা ও খরখরে গামছা দ্বারা, সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ রগড়াইলেও ছিদ্রগুলি পরিষ্কার থাকে। স্নানের নিয়ম যাহা সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ। সকলেই জানেন যে সময় ক্ষুধা বোধ হয়, সেই সময় স্নান করা কোন মতেই উচিত নয়; কিন্তু কার্য্যতঃ কি দেখিতে পাওয়া যায়? অধিকাংশ লোক স্নান করিয়াই আহার করিতে বসেন। কথায় বলে "ক্ষুধা মেরে যে জন খায়, তার পিত্ত বিগড়ে যায়"; অথচ এটী প্রত্যহ হইতেছে, বিশেষতঃ শীতকালে; সে সময় স্বভাবতঃই শরীরের যন্ত্রগুলি শীতে সংকুচিত হইয়া থাকে, তার উপর আহারের অব্যবহিত পূর্ব্বে স্নান করায় আরও জড়সড় হইয়া যায়, সে দিকে কাহারও ভ্রূক্ষেপ নাই। শীতকালে স্বভাবতঃ ক্ষুধা কম থাকে, অথচ শীতকালেই লোক মৎস্য, মাংস, ঘৃতাদি গুরুপাক দ্রব্য, অধিক পরিমাণে আহার করে, অধিক গরম মসলা যোগে সমস্ত খাদ্য প্রস্তুত করিয়া খায়। একে ক্ষুধা কম, তায় গুরুপাক আহার; ভাল পরিপাক হয় না; রোগের বিষ সৃজন হয়; শীতের প্রভাবে বিষও ঠাণ্ডা হইয়া থাকে; এক বোতল মদ শীতে রাখিয়া দিলে অনেক দিন পর্য্যন্ত ভাল থাকে, গরম পাইলেই যেমন উহা মাতিয়া উঠে, সেইরূপ শীতকালের প্রকৃতি বিরুদ্ধ পানাহারজনিত সঞ্চিত বিষ বসন্তের হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতিয়া উঠে; কলেরা, বসন্ত, প্লেগ প্রভৃতি রোগ দেখা দেয়। হঠাৎ কিছুই হয় না, সমস্তই কারণোদ্ভূত সে দিকে কোন লক্ষ্য নাই; লোকে

বলে "সময়টাই খারাপ"। যত দোষ কপালের আর সময়ের, আপনার যেন কোনই দোষ নাই! যাহা হইয়া আসিতেছে তাহাই হইয়া যাউক ; ভাল মন্দর বেলায় পরমেশ্বর, এ তো বড়ই জুলুম, বড়ই আবদারের কথা! স্নান করার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর শীতল হয়,সেই সঙ্গে শরীরস্থ সমুদয় যন্ত্র ও তাহাদের ক্রিয়া শিথিল হয়,কিছুক্ষণ পরে অন্ততঃ অর্দ্ধ বা এক ঘণ্টা পরে আবার সতেজ হয়, সুতরাং সেই সময় অর্থাৎ স্নানের এক ঘণ্টা পরে আহার করা, উচিত, অথবা আহারের তিন চারিঘণ্টা পরে স্নান করিলেও হইতে পারে। স্নানের সময় বেলা ১০টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত, যে সময় সূর্য্য প্রখর কিরণ দেয় ও শরীর স্বভাবতঃই খুব উত্তপ্ত হয়। কিন্তু দশটার মধ্যেই প্রায় সকলের স্নান শেষ হইয়া যায়। লোমকূপ মুক্ত রাখা যে যে প্রণালীতে হইতে পারে, তৎসমুদয়কে স্নানের অন্তর্গত করা যাইতে পারে। যাহার অবগাহন স্নান মোটেই সহ্য হয় না তাহার ঐ অবগাহন স্নান সহ্য করাইতে হইলে প্রথমে রৌদ্র তাপে থাকিতে হইবে। গাত্রে গরম কাপড় দিয়া সমুদয় গাত্র এবং মস্তক ঢাকিয়া মাথায় ছাতা দিয়া রৌদ্রে বসিয়া থাকিলে ঘর্ম্ম হইবেই, ঘর্ম্ম হইলেই লোমকূপ মুক্ত হইয়া গেল। এইরূপে ঘর্ম্ম হইলে রৌদ্র হইতে উঠিয়া আসিয়া সমস্ত অঙ্গ শুক্না খরখরে গামছা দিয়া মুছিয়া ফেলিতে হইবে ; তার পর অল্প ভিজা গামছা দিয়া খুব জোর করিয়া মুছিতে হইবে। এই সকল কার্য্য ভৃত্যের দ্বারা হইলেই উত্তম। কিছু দিন এইরূপ করিলে অবগাহন স্নান সহ্য হইবে। রোগ বিশেষে সমস্ত

শরীরে ভাপরা দেওয়া, রৌদ্রে থাকা, গরম জল দিয়া (নাভির নিম্ন দেশ হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত) তলপেট আস্তে আস্তে উত্তমরূপে রগ্‌ড়াইয়া রগ্‌ড়াইয়া ধৌত করা, এই সমুদয় প্রক্রিয়াতে স্নানের উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া থাকে। সহ্য হইলে ঠাণ্ডা জলে নতুবা ঈষদুষ্ণ জলে প্রত্যহ বৈকালে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তলপেট অর্থাৎ নাভির নিম্ন দেশ হইতে মলদ্বার এই অংশ টুকু উত্তমরূপে ও আস্তে আস্তে রগড়াইয়া ১০।১৫।২০ মিনিট এমন কি এক ঘণ্টা কাল ধরিয়া ধৌত করিলে স্ত্রীলোকদের নানা প্রকার ব্যাধি এবং যাবতীয় বহুকাল স্থায়ী পুরাতন রোগ আরোগ্য হয়। জননেন্দ্রিয়ের ভিতরে হাত না দিয়া আস্তে আস্তে উপরিভাগ ধুইতে হইবে। স্বপ্ন দোষের এটী ব্রহ্মাস্ত্র। এবং নানা প্রকার রোগে অবস্থা বিশেষে এটী দিবসে ও শয়নের পূর্ব্বে অর্থাৎ ২৪ ঘণ্টার মধ্যে দুই তিন বার প্রয়োগ করা যায়। আহারের একঘণ্টা পূর্ব্বে বা দুই তিন ঘণ্টা পরে প্রয়োগ করিতে হইবে ইহা যেন মনে থাকে। রোগের গুরুতর অবস্থায় এক বেলা মাত্র আহার এবং তৎ সহিত ঐ ধৌত ক্রিয়া করিতে হইবে। লিঙ্গের চর্ম্মাবরণ সম্মুখে টানিয়া তদ্দ্বারা লিঙ্গের ছিদ্রটী আবদ্ধ করিয়া বাম হস্তের তর্জ্জনী মধ্যমা ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা উহা টিপিয়া ধরিয়া ধৌত ক্রিয়া করিতে হইবে। সমুদয় রোগে অনুত্তেজক আহারের সহিত এটী প্রয়োগ করা যায়। এইটী করিবার সময় অন্য অঙ্গ অর্থাৎ পা, পায়ের পাতা অথবা নাভির উপরের অংশ যেন না ভেজে। স্নান

করিবার একটী স্বতন্ত্র ঘর থাকা খুব আবশ্যক। আর এক জন সুপ্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য চিকিৎসকের মতে সাত দিন অন্তর উত্তম রূপে সাবান দিয়া গায়ের ময়লা রগ্‌ড়াইয়া তুলিয়া অবগাহন স্নান করা উচিত। আমাদের দেশে একটী চলিত কথা আছে, "তাত সয়তো বাত সয় না"। অতএব অবগাহন স্নান মাসে দুই চারি বারের অধিক করিবেন না। একটী প্রাচীন ৮৫ বৎসর বয়স্ক কবিরাজ একটী ৩০ বৎসরের বলিষ্ঠ যুবাকে সন্ধ্যার সময় অবগাহন স্নান করিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "কয়বার স্নান করেন?" যুবক উত্তর দিল "দিনে দুই বার স্নান করি।" বৃদ্ধ জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি আমার সঙ্গে সমানে হাঁটিতে পারিবেন"? "যুবক বৃদ্ধের শরীরের দিকে তাকাইয়া বলিল "না আমি আপনার সহিত পারিব না" বৃদ্ধ কবিরাজ বলিলেন "তবে দুইবার করিয়া দিনে স্নান করেন কেন? আমার এই বয়স এখনও আপনার মত অনেক যুবা আমার সহিত জোরে পারে না, আমি বৎসরে দুই চারি বার স্নান করি, আর আপনি প্রত্যহ দুইবার স্নান করেন? কুয়ার দড়ি! কুয়ার দড়ি!!" অর্থাৎ অনবরত জলে ডুবাইলে কুয়ার দড়ির মত শরীর শীঘ্র জীর্ণ হইয়া যায়। উক্ত যুবকটি আমার বিশেষ পরিচিত এবং এখন তিনি সেই বৃদ্ধ কবিরাজের কথার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন। যাহা চিরদিন সহ্য হয় না তাহা করা উচিত নয়।

শরীরকে স্বাভাবিক রূপে যত অধিক উত্তপ্ত করিয়া স্নান

করিবেন ততই উত্তম। পূর্ব্বে বলিয়াছি একটী লৌহখণ্ডকে যত *বেশি উত্তপ্ত করিয়া ঠাণ্ডা জলে ডুবান যায় ততই উহার পরমাণু* সকল পরস্পর কামড়াইয়া ধরে, তাহাতে লৌহটী খুব মজবুত ও টেক্‌সই হয়; তেমনি শরীরকে যত বেশী দিন অবগাহন স্নান না করাইয়া রাখা হয় ততই দেহ উত্তপ্ত হয়। এই রূপে উত্তপ্ত হইয়া ঠাণ্ডা জলে স্নান করিবেন, এবং যত বেশী ঠাণ্ডাজল সহ্য করিতে পারিবেন ততই শরীর দৃঢ় হইবে; এবং ত্বগেন্দ্রিয়ের পরমাণু সকল পরস্পর জমাট বাঁধিয়া থাকিবে। ও শীত হইতে দেহকে রক্ষা করিবে। অনাবৃত দেহে রৌদ্রে [illegible] থাকিয়া পরক্ষণেই কেহ যেন, স্নান না করেন তাহাতে সর্দ্দি গরমি ও আরও নানা ব্যাধি হইতে পারে। যাহাদের অনাবৃত শরীরে থাকা অভ্যাস, তেল মাখিয়া স্নান করা তাহাদের বিশেষ উপযোগী; তাহাতে শরীরকে ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা করে। কিন্তু তৈলমর্দ্দন করিবার পূর্ব্বে দেখিতে হইবে শরীর স্বভাবতঃ উত্তপ্ত হইয়াছে কি না; অবগাহন স্নান সহ্য করিবার উপযোগী উত্তাপ দেহের মধ্যে অনুভূত হইতেছে কি না; সেরূপ উত্তাপ যত দিন বোধ না হইবে তত দিন পর্য্যন্ত অবগাহন স্নান না করিয়া কথিত অন্যান্য প্রণালীর স্নান করিবেন। এই রূপে দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ বৃদ্ধি করিয়া অবগাহন স্নান করিলে এবং প্রত্যহ গাত্রের ময়লা রগড়াইয়া তুলিয়া ভিজা ও খরখরে গামছা দিয়া মুছিয়া ফেলিলে দেহটী

ঠিক চলিবে। এ সম্বন্ধে আরও কয়েকটী কথা শেষে বলিব

১০। পরিশ্রম।

-৩০-

একটী কল ব্যবহৃত হইলে সেটী যত দিন স্থায়ী হয় ব্যবহার না করিয়া ফেলিয়া রাখিলে তদপেক্ষা অল্প দিন স্থায়ী হইবে; কথায় বলে "ফেলে রেখে মরচে পড়ান অপেক্ষা কাজ করিয়ে ক্ষয় করা ভাল"। আমাদের দেহকল সম্বন্ধেও ঠিক সেই রূপ জানিবেন। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম অতিরিক্ত না হয় সে দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতেই হইবে। কিন্তু দেখাযায় প্রায় লোকই অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম কিম্বা অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিয়া শরীর নষ্ট করে। সংসার-চক্রে যিনি যেমন ঘুরিতেছেন তিনি তেমনি ভাবে খাটিতেছেন; অর্থ উপার্জ্জনের জন্য যেরূপ পরিশ্রম হয় তাহাই যথেষ্ট বিবেচিত হয়; যথেষ্ট কেন, অধিকাংশ লোকের পক্ষে তাহা অতিরিক্তই হইয়া থাকে। সকল বিষয়েই একটী বাঁধা বাঁধি নিয়ম আছে। অঙ্গচালনাও নিয়ম মত করিতে হইবে। আমাদের শাস্ত্র মতে বলবান ও স্নিগ্ধভোজীর পক্ষে অর্থাৎ যাহাদের শরীরে খুব জোর আছে,

ও ঘৃত দুগ্ধ তৈলাদি আহার সম্পূর্ণরূপ জীর্ণ হয় তাঁহাদের পক্ষেই ব্যায়াম প্রশস্ত। কিন্তু বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিলেই ব্যায়াম করিতে হইবে, শরীরের পক্ষে সেটী উপযুক্ত হইতেছে কি না, অথবা সেই ব্যায়াম করিয়া শরীর দুর্ব্বল বোধ হইতেছে কি না, অথবা সেই ব্যায়াম ক্ষমতার অতীত হইতেছে কি না, অর্থাৎ প্রত্যহ দেহের ওজন লইয়া সে সকল বিষয় নির্দ্দেশ করার আবশ্যকতা কেহ মনে করেন না। ঘৃত দুগ্ধ তৈল প্রভৃতি স্নিগ্ধ দ্রব্য যে বালক জীর্ণ করিতে পারে না, শরীরে সেরূপ বলও নাই তাহার পক্ষে বিদ্যালয়ের ব্যায়াম অর্থাৎ জিমনাষ্টীক কুস্তি মুগুর ভঁজা প্রভৃতি অত্যন্ত শক্তির উপযোগী ব্যায়ামের ব্যবস্থা করিলে জীবন নষ্টই হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। জীবনীশক্তি অক্ষয় মনে করিয়া এই সময় কি ভয়ানক অত্যাচারই হয়। অতিরিক্ত শারীরিক পরিশ্রম, রাত্রি জাগরণ, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম, বাল্যকাল হইতে যৌবনকাল পর্যন্ত হইয়া থাকে; অর্থাৎ যত দিন দেহের উপর জোর জবরদস্তি চলে তত দিন তাহা ষোলআনা রকমেই হইয়া থাকে। ফলও যাহা হইবার তাহাই হইতেছে সুতরাং "যা রয় সয়" তাই করা ভাল। আহারের একঘণ্টা পূর্ব্ব হইতে এক ঘণ্টা পর পর্য্যন্ত শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম নিষিদ্ধ, কিন্তু এই নিয়মটী কয়জন পালন করেন? আহারের এক মিনিট পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মানসিক পরিশ্রম করেন, আহার করিবার সময়েও কত বিষয়ের চিন্তা করেন এবং আহার করিয়া বিশ্রাম না করিয়াই কার্য্যে বহির্গত হয়েন।

আমাদের শাস্ত্রের কথা একজন চিকিৎসক এইরূপ বলিয়াছেন,—

"খেয়ে উঠেই দৌড়ে যায়,
মৃত্যু তার পশ্চাতে ধায়";
"চিন্তা হতে হয় বিরত,
সর্ব্বদা খায় মনের মত;
রাত্রে সুখে ঘুমে রয়,
তারই দেহ মোটা হয়"।

অর্থাৎ চিন্তা শূন্য হইয়া আহার করিবে এবং ইচ্ছার অনুরূপ অর্থাৎ মনের মত খাইবে; কিন্তু সকলেই লোভে বা মরীচিকাবৎ ক্ষুধায় আকৃষ্ট হইয়া আহার করিবার সময়ও বুঝিতে পারেন, আহারটা ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইতেছে কি না অথবা কতটুকু আহার ইচ্ছানুরূপ এবং কতটুকু ইচ্ছার বিরুদ্ধে হইতেছে। ইচ্ছার বিরুদ্ধে হওয়া সত্বেও আহার করেন, সুতরাং অপরিমিত ভোজন করিয়া ফেলেন। শৈশব কালে সন্তান আপনি যে দিন খায় সে দিন অর্দ্ধেকও খায় কি না সন্দেহ। নিজে যদিও খাইতে শেখে নাই তথাপি বারে বারে অল্প অল্প করিয়া খাওয়া হইলে তাহার মনের মত হয়; কিন্তু জননী তাহাতে বিরক্ত হইয়া হয়তো গলা টিপিয়া ধরিয়া টানিয়া আনিয়া "কোঁৎ কোঁৎ" করিয়া সমুদয় অন্ন একেবারে গেলাইয়া দেন। যাহা দুই বারে কি তিন বারে খাইত তাহা এক বারে খওয়াইয়া দেন। মাতার মনের মত খাওয়ান হইল বটে কিন্তু সন্তানের

উহা মনের মত খাওয়া হইল না; অনুকূল অবস্থার এই কুশিক্ষা প্রতিকূল অবস্থায় পকতা প্রাপ্ত হইয়া একটী একটী করিয়া কুফল ক্রমে ক্রমে প্রসব করে, যাহার শেষ পরিণতি চল্লিশ পঞ্চাশ এবং ষাইট্ বৎসরে অকাল বার্দ্ধক্য অথবা জরা অথবা মৃত্যু!

সুখের নিদ্রা উপভোগ করিতে হইলে রাত্রে লঘু আহার ও অল্প পরিমাণ আহার করা কর্ত্তব্য। আমাশয় ও অজীর্ণাদি রোগ গ্রস্ত বিশেষতঃ হাঁপানি অর্শ ও অম্ল প্রভৃতি কঠিন রোগগ্রস্ত রোগী রাত্রে অনাহারে নিদ্রা যাইবে। এটী আমার বিশেষ পরীক্ষিত মুষ্টিযোগ। অন্ততঃ এক মাস এক বেলা মাত্র আহার করিয়া দেখুন, রোগের কত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত থাকেন এবং দিন দিন দেহে বলসঞ্চার হয় কি না। তাহাও যদি না পারেন তবে রাত্রের অভ্যস্ত আহার ক্রিয়াটী বৈকালে অথবা সন্ধ্যার পূর্ব্বে শেষ করিবেন।

শিশুগণ যে পরিমাণ হাঁটাহাঁটি ছুটাছুটি করে, বালিকা ও স্ত্রীলোকগণ গৃহস্থলীর কাজকর্ম্ম যে পরিমাণ করেন, এবং সংসারে থাকিয়া যাহাকে যেরূপ কার্য্য করিতে হয় তাহাতে ষোল আনা রকম অঙ্গ চালনা হয় না, আংশিক ভাবে হইয়া থাকে। যাঁহারা বাইসিকিলে চড়েন, তাঁহাদের উরুদ্বয় ও পা অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের তুলনায় অস্বাভাবিক মোটা ও দৃঢ় হয়, সেই রূপ কামারের হস্তদ্বয়, এবং যাহারা জিম্‌নাষ্টিক্ করে তাহাদের

বুকের ছাতি ও বাহু অন্যান্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা অধিক দৃঢ় ও অধিক মোটা হইয়া থাকে। ইহার কারণ, যে অঙ্গ বেশী চালিত হইবে সেই অঙ্গেরই দৃঢ়তা তত বেশী হইবে। সুতরাং ষোল আনা রকম স্বাস্থ্যপথে চলিতে হইলে প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ যাহাতে ষোল আনা রকম পরিচালিত হয় তাহা করিতে হইবে।

দাস্ত ঠিক্ স্বাভাবিক যাহাতে হয় তজ্জন্য আহারাদির যে সকল নিয়ম বলা হইতেছে কেবল মাত্র সেইগুলি পালন করিলে হইবে না, সেই সঙ্গে অঙ্গ চালনা ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন অবশ্য কর্ত্তব্য। বিশুদ্ধ বায়ুর কথা পরে বলিব। এস্থলে প্রত্যেক অঙ্গ কি করিয়া চালনা করা যায় তাহারই গুটী কয়েক কথা বলিতেছি।

প্রত্যূষে এবং সন্ধ্যায় ফাঁকা মাঠে অথবা নদীতীরে দেহটি ঠিক্ সোজা করিয়া, দুই হস্ত পিঠের দিকে মুড়িয়া, বুক্ সটান করিয়া, মুখ বুজিয়া ভ্রমণ করিবেন। ধীরে ধীরে পদ বিক্ষেপ করতঃ সাধ্য মত নিশ্বাসের সহিত বিশুদ্ধ বায়ু টানিয়া লইয়া ফুস্ফুসকে স্ফীত করিবেন, অর্থাৎ এক দমে যত বেশী পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু টানিয়া লইতে পারেন ততই উত্তম। উক্ত বায়ুকে ক্ষণেক ধরিয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে দম ছাড়িবেন ; এইটী প্রতিদিন অন্ততঃ মোটের উপর ২০ মিনিট করা চাই, কাপড় ঢল করিয়া পরিধান করিয়া এইটী করিতে হইবে। সোজা হইয়া

শুইয়া, অথবা দাঁড়াইয়া, শয়নের পূর্ব্বে অথবা নিদ্রা ভঙ্গে অথবা ধীরে ধীরে ভ্রমণ কালে অর্থাৎ যখন ভাল লাগে তখনই এইটী ৫।৭ মিনিট অভ্যাস করিবেন। দেখিবেন যেন নিশ্বাস ও প্রশ্বাসের কোনরূপ শব্দ শ্রুতি গোচর না হয়। এইরূপে এ অভ্যাসটী করিতে পারিলে একমাস কাল মধ্যে সুফল প্রাপ্ত হইবেন।

গা, হাত, পা, টিপাইলে যে ফল পাওয়া যায় সেইরূপ বায়ু টানিয়া উহাকে ক্ষণকাল ধরিয়া কণ্ঠদেশ হইতে তলপেট পর্য্যন্ত স্ফীত করিলে অভ্যন্তরস্থ যন্ত্রসমুদয় অন্তরটিপনি পাইয়া অধিক কার্য্যকরী হয় এবং তাহাতে পরিপাক ক্রিয়া সমধিক হয়। পরিপাক শক্তির হীনতা ও ফুস্ফুসের দুর্ব্বলতা এই দুইটী পরস্পর ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে আবদ্ধ, যেমন যমজ ভাই, একটী থাকিলে অপরটিও সেই সঙ্গে থাকিবেই; উপরোক্ত ব্যায়ামটী করিলে ফুস্ফুসের শক্তি বৃদ্ধি হইবেক ও সঙ্গে সঙ্গে পরিপাক শক্তিও বাড়িবে। এই কারণে পাশ্চাত্য দেশের অনেক রমণী কটিদেশ কসিয়া ধরিয়া থাকে সেরূপ পোষাক আর পছন্দ করেন না। আমাদের দেশের বিলাসিনীগণও যদি সেই মত বেশ পরিবর্ত্তন করেন অথবা পরিধেয় বস্ত্র টান্ করিয়া পরিধান করেন তবে মঙ্গল, এবং ইহাও ভাবা উচিত যে পরমেশ্বরের উপর ওস্তাদি করিতে গেলে অর্থাৎ প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাবে থাকিলে কুফল ব্যতীত সুফল হইতে পারে না। শ্বাস প্রশ্বাসের প্রসঙ্গে এ বিষয়ের আলোচনা করিব।

সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া উক্ত প্রকারে গভীর নিশ্বাস লইয়া মুখ বন্ধ করিয়া, দুই হস্ত উর্দ্ধে উঠাইয়া সোজা ভাবে সম্মুখ দিয়া নামাইয়া পশ্চাৎ দিকে যত দূর উঠে উঠাইতে হইবে ; পুনরায় হস্তদ্বয় উর্দ্ধে তুলিয়া সোজা ভাবে পশ্চাৎ দিক্ দিয়া যত দূর নাবে নামাইতে হইবে ; এইরূপে বাহুদ্বয় দুইটী চক্রের মত স্কন্ধদ্বয়ের উপর ঘুরিবে। যতক্ষণ কষ্ট বোধ না হয় অথবা যতক্ষণ ভাল লাগে ততক্ষণ এই সকল ব্যায়াম করিতে হইবে।

উবুড় হইয়া শুইয়া মুখ বুঁজিয়া উক্তরূপে গভীর নিশ্বাস লইয়া করতলদ্বয় এবং পদতলের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বয়ের উপর ভর দিয়া সমস্ত শরীরকে তুলিতে হইবে এবং পুনরায় বিছানায় বা মৃত্তিকায় স্পর্শ করিতে হইবে ; এক নিশ্বাসে দুই এক বার অর্থাৎ যিনি যে কয়েক বার পারেন সেই কয়বার এই ব্যায়ামটী করিয়া ধীরে ধীরে নিশ্বাসটী ত্যাগ করিতে হইবে। ইহাকে ডন্ করা বলে। ইহাতে সমুদয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং অভ্যন্তরস্থ সমস্ত যন্ত্র যথেষ্ট রূপ পরিচালিত হয়। এই ব্যায়ামটি দুর্ব্বলের পক্ষে নহে।

এক নিশ্বাসে যে কয়েক বার পারেন "ওঠাবসা" করিবেন, তারপর নিশ্বাসটী আস্তে আস্তে ত্যাগ করিবেন। যতক্ষণ ভাল লাগে, এবং যতক্ষণ ক্লান্তি বোধ না হয় ততক্ষণ করিতে হইবে ; শ্রান্তি বোধ হওয়া মাত্র বিশ্রাম করিতে হইবে। বিশ্রাম করিয়া যদি ইচ্ছা হয়, তবে পুনরায় করিবেন।

হস্ত দ্বয় ঊর্দ্ধে তুলিয়া দণ্ডায়মান হউন, ঐ ভাবে মুখ বন্ধ করিয়া সম্মুখ দিকে ক্রমে ক্রমে নত হইয়া হস্ত দ্বয়ের অঙ্গুলি পদতলদ্বয় স্পর্শ করিবে। এবং পুনরায় ক্রমে ক্রমে শরীর সোজা করিয়া পশ্চাৎ ভাগে অর্থাৎ পিঠের দিকে যতদূর ধনুকের ন্যায় বক্র হইতে পারে ততখানি বক্রভাব ধারণ করিবেন এবং পরে দুই পার্শ্বে যতদূর পারেন শরীরকে ঝুঁকাইবেন। শেষোক্ত দুইটী ব্যায়াম অর্থাৎ দক্ষিণে ও বামে শরীরকে বক্রভাব করিবার সময় হস্তদ্বয় সুবিধা মত রাখিয়া শরীরকে যত বেশী ঝুঁকাইতে পারেন ততই উত্তম। তারপর সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া হস্তদ্বয় স্বাভাবিক মত ঝুলাইয়া রাখিয়া মস্তককে গলদেশের উপর ঘুরাইতে হইবে।

জলে সাঁতার দেওয়া এবং নৌকার দাঁড় টানা, বারে বারে উপরে উঠা, সিঁড়ীতে "উঠা নামা" করা,হাত ছোড়া, পা ছোঁড়া এ সমুদয় অতি উত্তম, কিন্তু দুর্ব্বলের পক্ষে নহে। দুর্ব্বলের পক্ষে প্রাতে ও সন্ধ্যায় ভ্রমণই একমাত্র প্রশস্ত ব্যায়াম। শ্রান্তি বোধ যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ ভ্রমণ করিতে হইবে।

উপরোক্ত যে কয়েকটী ব্যায়াম করিতে বলা হইল তাহাতেই সমস্ত অঙ্গের যথেষ্ট রূপ চালনা হইবে, কিন্তু যত রকম ব্যায়ামই করুন, তাহাতে দেহের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থির সম্যক্‌রূপ পরিচালনা হয় না। সুতরাং ব্যায়ামের উপকারিতা পূর্ণমাত্রায় পাইতে হইলে অঙ্গ মর্দ্দন একান্ত আবশ্যক। প্রতিদিন অন্ততঃ এক পয়সা খরচ করিয়া গা, হাত, পা, মাথা, অর্থাৎ নখাগ্র হইতে কেশাগ্র পর্য্যন্ত

টিপাইয়া লইতে হইবে। অবস্থাপন্ন স্ত্রীলোকগণ বালিকা চাকরাণী দ্বারা এবং পুরুষগণ বালক চাকর দ্বারা অঙ্গ মর্দ্দন করাইয়া লইবেন। উক্তকার্য্যের জন্য নিরোগীকে এবং আপন হইতে কম বয়স্ককে নিযুক্ত করিবেন। অঙ্গমর্দ্দন ভালরূপ করিতে পারে সেইরূপ ভৃত্য পরীক্ষা করিয়া নিযুক্ত করিবেন। যাঁহারা পীড়িত, অত্যন্ত দুর্ব্বল, অথবা নানাপ্রকার পুরাতন রোগে কষ্ট পাইতেছেন, তাঁহারা কেবল মাত্র অঙ্গ মর্দ্দনেই সম্পূর্ণরূপ ফল পাইবেন; ঔষধে তাহা পাইবেন না।

জীবনীশক্তি যত দিন সতেজ থাকে তত দিন ঔষধের অপকারিতা বুঝা যায় না। আমার পরিচিত এক জন ডাক্তার এক দিন আমাকে বলিলেন "দেখুন, আমি সহরের লোককেও চিকিৎসা করি এবং যাহারা পাড়াগাঁয়ে থাকে তাহাদেরও চিকিৎসা করি, কিন্তু সহরবাসীদের ঔষধে কিছুই হয় না, পল্লীগ্রামবাসীদের ঔষধে আশ্চর্য্য উপকার হয়"। ইহার কারণও তিনি বলিলেন যে, যাহারা ঔষধে অভ্যস্ত তাহাদের উপকার হয় না এবং যাহারা ঔষধ মোটেই খায় নাই তাহাদের পক্ষে ঔষধের উপকার। এ কথা সকলেই জানেন এবং ভুক্তভোগী রোগী বিশেষরূপ জানেন। কিন্তু উভয় পক্ষেই অপকার ব্যতীত উপকারের লেশ মাত্রও হয় না তাহাই বুঝাইতে এ স্থলে একটু চেষ্টা করি।

প্রতিদিন আহারাদির যে দোষ হয় তাহার ফলে পেটের মধ্যে এক প্রকার বিষ অর্থাৎ রোগ সৃজনকারী বিষ উৎপন্ন হয়; কেন হয় এবং কিরূপে রোগের সৃজন হয় অর্থাৎ

রোগতত্ত্বের কথা পরে বলিব। প্রত্যহই খাওয়ার দোষে একটু না একটু বিষ হইতেছে, কিন্তু নবদ্বার ও লোমকূপ দিয়া স্বীয় প্রকৃতিগুণে জীবনীশক্তি ঐ বিষকে প্রত্যহ সাধ্যমত বাহির করিয়া দিতেছে বলিয়া কুপথ্যের অপকারিতা শীঘ্র জানিতে পারা যায় না। অথবা জানিতে পারিয়াও উপেক্ষাই করিয়া যাই। রোগের অঙ্কুর অবস্থা এবং বিকাশ অবস্থাকে পর্য্যায় ক্রমে কষ্টহীন অবস্থা এবং কষ্টদায়ক অবস্থা বলা যায়। কষ্টহীন অবস্থাকে রোগ বলিয়া বিবেচনাই করি না। সুতরাং ক্রমে ক্রমে ও অল্পে অল্পে রোগের আক্রমণ বুঝিতে পারিয়াও কোনরূপ প্রতিকারের চেষ্টা করি না। কুপথ্যের কুফল এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হয় বলিয়া শীঘ্র জানিতে পারা যায় না। কিন্তু এইটী কখন্ জানিতে পারি? যখন শয্যায় ছট্ পট্ করি, গা, হাত, পা জ্বালা করে, মাথা ধরে, গা বমি বমি করে, খাইতে অনিচ্ছা হয়, নিদ্রা হয় না এবং আরও কত উপসর্গ সহ জ্বর হয় তখন বুঝিতে পারি যে উপেক্ষিত বিষ ক্রমে ক্রমে অত্যন্ত সঞ্চিত হইয়া রোগের মূর্ত্তি ধরিয়া খুব জোর করিয়াছে; এত জোর, যে, নবদ্বার এবং লোম কূপের ক্রিয়াকে বন্ধ করিয়াছে, দেহের স্বাভাবিক ভাবকে উলটাইয়া দিয়াছে; তথাপি জীবনীশক্তির উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারে নাই, কারণ, জীবন দেহে যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ জীবনীশক্তির জয় বলিতে হইবে; জীবনীশক্তির পরাজয় ঘটিলে মৃত্যু বুঝিতে হইবে। দেহে জীবনথাকা

পর্য্যন্ত জীবনীশক্তি উক্ত বিষকে তাড়াইবার অনবরত চেষ্টা করিবে, এবং এ স্থলেও বিষকে নির্গত করিতে দস্তুরমত সংগ্রাম করিতে হইতেছে; এমন সময় যদি রোগের কারণ সমুদয় অর্থাৎ বিষ যে ইন্ধন পাইয়া কার্য্য করিতেছে সেই সকল প্রকৃতি বিরুদ্ধ আহার বিহার রূপ ইন্ধন সরাইয়া লওয়া হয়, অর্থাৎ ক্ষুধা না হওয়া পর্য্যন্ত লোভ সম্বরণ করিতে পারা যায়, "জ্বরাদৌ লঙ্ঘনো পথ্যম্" এই কথাটী কার্য্যে পরিণত করিয়া উপবাসরূপ পথ্যকে ধরিয়া থাকিতে পারাযায় এবং অবস্থা বিশেষে আবশ্যক মত ভাপড়া দিয়া বিষকে ঘর্ম্মরূপে নির্গত করিতে পারা যায়, এবং পথ্যাদির সমুদয় নিয়ম পালন করিতে পারা যায় তাহা হইলে বিষের ক্রিয়া কমজোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তির প্রভাব অনুভূত হইবে, দেহের স্বাভাবিক ভাব, যাহা এতক্ষণ উলটাইয়া গিয়াছিল, আস্তে আস্তে আসিবে, এবং জীবনীশক্তির তারতম্য অনুসারে এক দিন, দুই দিন, বড় জোর তিন দিনে রোগের উপশম হইবে। পুরাতন রোগ হইলে জীবনীশক্তির রোগ দূর করিবার ক্ষমতা কমিয়া যায়, উপরোক্ত রূপে রোগের উপশম হইলেও শরীরে বিষ থাকিয়া যায় যাহা পুনরায় সঞ্চিত বিষের সাহায্যে রোগ রূপে দেখা দেয়; এমত অবস্থায় দাস্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, এবং রোগের উপসর্গ গুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া গরম জলের ভাপড়া দিয়া দেহকে স্নান করাইতে হইবে অথবা তলপেট ধৌত করার ব্যবস্থা করিতে হইবে

যদ্দ্বারা শরীরের বিষ মল মূত্র ঘর্ম্ম রূপে বাহির হইয়া যায়। স্নানের প্রসঙ্গে এ সকল কথা বলা হইয়াছে।

কিন্তু সুখপ্রদ ভাবে অর্থাৎ শরীরে খুব সুখ অনুভব হয়, একটুও কষ্ট বোধ না হয় এইরূপ ভাবে উক্ত রোগের অবস্থায় গা হাত পা টিপাইয়া ও মর্দ্দন করিয়া লইলে একটী সঞ্জীবনী শক্তি সর্ব্বদেহে জাগিয়া উঠে, এবং রোগের বিষকে বাহির করিয়া দেয়। কিন্তু সচরাচর কি দেখিতে পাই? চিকিৎসক ঔষধ ব্যবস্থা করেন, রোগী একে একে প্রত্যেক উপসর্গের নাম লইয়া চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করে "এ সব উপসর্গ সেরে যাবে তো?" চিকিৎসক বলেন "সব সেরে যাবে"। রোগী আশ্বস্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করে "কি খাব"? খাওয়ার ব্যাপার লইয়াও কিছুক্ষণ তর্ক বিতর্ক হওয়ার পর যা—হোক্ একটা—কিছু খাওয়ার ব্যবস্থা হয়। ক্ষুধা থাক্ বা না থাক্, নাক্ চোক্ বুজিয়া কিছু না কিছু গলাধঃকরণ করিতেই হইবে। তাহার পূর্ব্বেই অবশ্য ঔষধ পেটে পড়িল। প্রকৃতি বিরুদ্ধ আহারোদ্ভূত এক বিষের ক্রিয়ার সহিত যুদ্ধ করিতেই জীবনীশক্তি অস্থির হইয়াছে এমন সময় ঔষধ রূপ আর একটী প্রকৃতি বিরুদ্ধ দ্রব্য পেটে পড়িল। ঔষধ বিষের নামান্তর মাত্র। অতি মাত্রা হইলে বিষ বলে এবং অল্প মাত্রায় হইলে ঔষধ বলে; আপনি একশত্রুর সহিত যুদ্ধ করিতেছেন এমন সময় যদি আর একটী শত্রু আসিয়া আপনাকে আক্রমণ করে তাহাতে আপনার যেমন অবস্থা হয় ঔষধরূপ বিষ উদরস্থ হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে জীবনীশক্তিরও ঠিক সেইরূপ অবস্থা হয়। শত্রু যদি প্রবল হয়, অর্থাৎ বটীকা বা আরক যদি বজ্র সদৃশ হয়, অর্থাৎ ঔষধ যদি খুব তেজস্কর হয় তবে প্রকৃতই বজ্রাহত হইতে হয়, রোগী মরে। এরূপ তো প্রায়ই হইতেছে; অবস্থা না বুঝিয়া, রোগীর অগ্নি ও বল বিশেষ রূপ না বুঝিয়া, জীবনীশক্তির কি পরিমাণ প্রভাব এবং উহা প্রকৃতি বিরুদ্ধ আহারোদ্ভূত বিষের সহিত যুদ্ধ করিতে করিতে কত পরিমাণ দমিত হইয়াছে, এ সব বিবেচনা না করিয়া বজ্র সদৃশ ঔষধ দিলে রোগী মরিবে না ত কি? অথচ লোকে বলিবে "ওঃ এমনি রোগ হ'ল যে ফট্ করে মরিয়া গেল, ঔষধ মোটে ধরিল না।" পল্‌তের আগুনে তোপ্ ছুটিয়া গেল সেই সঙ্গে পল্‌তে নিবে গেল সে দিকে কেহ লক্ষ্য করিল না! অতি মাত্রায় ঔষধ প্রয়োগ, ঔষধের গুণাগুণ বিশেষ রূপ না জানিয়া প্রয়োগ, ও রোগীর অবস্থার দিকে না তাকাইয়া উহা না বুঝিয়া পুঁথিগত বিদ্যা অনুসারে ঔষধের মাত্রা প্রয়োগ প্রভৃতি নানা কারণে লোকের অপঘাত মৃত্যু ঘটিতেছে। চিকিৎসা শাস্ত্র, ব্যবসায়ে পরিণত করিলে একটী রোগীর জন্য কে চিন্তা করিবে? দিনান্তে শত সহস্র রোগীর শ্রাদ্ধ করিয়া রোজগার করিতে হইবে! ধন্য ব্যবসায়! ধন্য লোকের প্রবৃত্তি! ধন্য তাহার আস্থা ও বিশ্বাস! মানুষ! তুমি এত ব্যবসাদারের চালাকি ও ফাঁকি ধরিতে পার কিন্তু চিকিৎসা ব্যবসার ফাঁকি টুকু ধরিতে পার না? তাহা পারিবে না। কারণ এ স্থলে তুমি আপনার দ্বারাই অগ্রে প্রবঞ্চিত হইয়া চিকিৎসকের নিকট

গিয়াছ। পদে পদে তোমারই ভ্রম সংশোধন করিয়া কি চিকিৎসক চিকিৎসা করিয়া থাকেন? তাহা হইলে এত ঔষধের প্রয়োগ হইত না; এত রোগের স্রোত বহিত না, তোমার শরীরেরও আজ এত দুরবস্থা হইত না! চিকিৎসক হয়তো জানেন যে, তুমি তোমার ভ্রম সংশোধন করিতে পারিবে না, অতএব ও বিষয় লইয়া কোন উচ্চবাচ্য করেন না; তোমাকে খাতির করিয়া তিনি অন্নসংস্থানের জন্য পুঁথিগত বিদ্যা অনুসারে ঔষধব্যবস্থা করিয়া বা বিক্রয় করিয়া আপনাকে দোষ হইতে খালাস জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে থাকেন। তুমি যত বারই তাঁহার নিকট যাও তত বারই ঐ প্রকার দায়িত্ব রহিত ব্যবস্থা পয়সা দিয়া লইয়া থাক। ইহাতে তোমার দায়িত্ব যে কত অধিক তাহা তুমি একবারও ভাব না। ঔষধটী ঢক্ করিয়া গিলিয়া খাইয়া তুমি আপনাকে সব দোষ হইতে খালাস মনে করিয়া থাক। তোমার দায়িত্ব অপেক্ষা চিকিৎসকের দায়িত্ব আরও অধিক। সেরূপ দায়িত্বজ্ঞান পূর্ণ চিকিৎসক যদি পাও তবে জানিবে তুমি অতি ভাগ্যবান। আমি শুনিয়াছি, কোন বিখ্যাত চিকিৎসক পরিষ্কার জল এবং সরিষা প্রমাণ চিনির গুলি ঔষধ বলিয়া রোগীকে দিতেন, এবং পথ্যের নিয়মগুলি বিশেষ করিয়া পালন করিতে বলিতেন। শতকে বা হাজারে ঐরূপ এক জন চিকিৎসক যদিও বা থাকেন কিন্তু তিনি একক কি করিয়া লোকের মতি গতি ফিরাইবেন? আমার জ্ঞানে অর্থাৎ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমি ঐরূপ চিকিৎসক একটীও দেখি নাই। যে রোগীর বরাত ভাল অর্থাৎ যাহার ভাগ্যে আপাততঃ মৃত্যু

নাই, অর্থাৎ রীতিমত চিকিৎসিত হইয়া দগ্ধিয়া দগ্ধিয়া ধনে প্রাণে যাহাকে মরিতে হইবে, কপালগুণে তাহার বেলায় ঔষধের মাত্রা এমন হয় যাহাতে জীবনীশক্তি একে বারে ভূতলশায়ী না হইয়া ক্ষণ কালের জন্য পাথর চাপা হইয়া থাকে; তাহার ভাগ্যে মৃদু ঔষধ পড়ে। জীবনীশক্তির প্রবাহ রোগ তাড়াইবার জন্য যে রূপ প্রবল বেগে বহিতেছিল, ঔষধ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে উহা ক্ষণকালের জন্য স্তম্ভিত হইয়া যায়, প্রবাহের বেগ আবদ্ধ হওয়ায় উহা কম বলিয়া বোধ হয়, সুতরাং শরীরের উত্তাপ বা জ্বর অথবা অন্যান্য উপসর্গও কম বলিয়া বোধ হয়; রোগী মনে করে এটী ঔষধের গুণ; শরীরকে স্বচ্ছন্দে রাখাই হইল জীবনীশক্তির স্বভাব; উহার প্রবাহকে ঔষধরূপ পাথর চাপা দিলে প্রবাহ ততই বেগের সহিত পাথরের উপর চোট্ মারিবে, পাথরটী যখন সরিয়া যাইবে, অর্থাৎ ঔষধের যতক্ষণ ক্ষমতা ততক্ষণ বেগ আট্‌কাইয়া রাখার পরে যখন আর ক্ষমতা থাকিবে না তখন জীবনীশক্তি আরও বেগে প্রবাহিত হইয়া পূর্ব্বের সমস্ত উপসর্গ গুলি বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করিবে, তাহার ফলে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ প্রকাশিত হইবে। ঔষধের জোর কমিবার সঙ্গে সঙ্গে রোগের বৃদ্ধি হয় এরূপ ত চাক্ষুষ দেখিতে পাওয়া যায়। লোকে বলে "থে'কে থে'কে জ্বর হচ্চে" অথবা "থে'কে থে'কে ব্যারামটী দেখা দিচ্ছে"। যাঁহারা ঔষধে অভ্যস্ত, অথবা যাঁহারা অহিফেন বা মদ্য ঔষধরূপে ব্যবহার করেন তাঁহারা উপরোক্ত কথার সত্যতা খুব উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

চিকিৎসক কিছু খাবার ব্যবস্থা করিয়াছেন, সে ব্যবস্থাটীও রোগের উপর ঔষধরূপপাথর চাপা দিয়া কার্য্যে পরিণত করা হয়। যে বিষকে তাড়াইবার জন্য এত চেষ্টা হইতেছে সেই বিষ নির্গত না হইতেই পুনরায় বিষের বীজ বপন করা হয়। যাহার জীবনীশক্তি খুব সতেজ, সে রোগের বিষ, ঔষধের বিষ এবং রোগ অবস্থাতেও অল্প বিস্তর কুপথ্যের বিষ এই তিন প্রকার বিষকে দিন কয়েক চিকিৎসকের কথামত বা নিজের অবস্থা বুঝিয়া ক্ষুধা আদি বিবেচনা করিয়া অল্প আহার এবং লঘু আহার করিয়া পরাজিত করে এবং আরোগ্য লাভ করে। পাড়াগাঁয়ের লোকের জীবনীশক্তি খুব সতেজ বলিয়া শীঘ্রই তাহারা রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করে। এবং এই সকল ক্ষেত্রে চিকিৎসক বলিয়া থাকেন "ঔষধ আশ্চর্য্য উপকার করিয়াছে!" জীবনীশক্তিকে যদি উক্ত তিন শত্রুর সহিত বার কয়েক যুদ্ধ করিতে হয় তবে উহা দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, কুপথ্যের বিষ ক্রমাগত সঞ্চিত হইতে থাকে, জীবনীশক্তি সেই বিষকে সম্পূর্ণরূপে বাহির করিয়া দিতে পারে না। চিরজীবন বিষ লইয়া ঘর করিতে হয়, "শরীরং ব্যাধি মন্দিরং" হয়। সহরবাসীদের এই অবস্থা। প্রত্যেকেরই যে এই দশা তাহা আমি বলিতেছি না, অথবা পাড়াগাঁয়ে থাকিলে যে ব্যারাম হইবে না তাহাও বলিতেছি না। যিনি হামেসাই চিকিৎসকের সহিত সাক্ষাৎ করেন, মাসে অন্ততঃ দুই এক বার শরীরের উপর ঔষধ প্রয়োগ করেন, অচিরে তাঁহার শরীর ব্যাধির মন্দির হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। সহরে এত প্রলোভন যে, সখ

করিয়া অনেকে ঔষধের গুণ পরীক্ষার জন্য নানা প্রকার হজমীর ঔষধ খাইয়া থাকেন, চক্ষু ভাল থাকে সেই রূপ চস্‌মা ব্যবহার করেন; ফলে ক্ষুধা এবং চক্ষু উভয়ই যায়। পাড়াগাঁয়ে এ সব প্রলোভন নাই, চব্বিশ ঘণ্টা নিশ্বাসের সহিত ধুলি সেবন বা ধূম্‌ ও গ্যাস্‌ সেবন করিতে হয় না; পাড়াগাঁয়ের লোকেরা অনেকটা প্রকৃতির অনুযায়ী থাকে বলিয়া ভাল থাকে। এই কারণে স্বাভাবিক নিয়মে থাকিয়া রোগের চিকিৎসা সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। ইহার উদাহরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। এবং পরেও বিশেষ বিশেষ রোগ উল্লেখ করিয়া দিব। এক প্রকার তিনটী রোগীকে যদি আপনি তিন প্রকার মতে, অর্থাৎ একটীকে, এলোপ্যাথিক মতে, একটীকে হোমিওপ্যাথিক মতে এবং আর একটীকে স্বাভাবিক মতে চিকিৎসা করিয়া স্বাভাবিক মতের চিকিৎসার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপকারিতা বুঝিতে পারেন, তবে কেন আপনি অন্য চিকিৎসা করিবেন? পাশ্চাত্য দেশের অনেক লোক ও অনেক চিকিৎসক স্বাভাবিক মতে চিকিৎসা করেন, সে দেশের স্রোত আমাদের দেশে এখনও ভাল করিয়া আসে নাই। কিন্তু কতিপয় প্রধান ও স্বনাম ধন্য এ দেশের চিকিৎসক ছিলেন এবং আছেন যাঁহারা হাজার হাজার টাকা মাসে রোজগার করিয়াছেন ও করেন, তাঁহাদের ঔষধে আদৌ বিশ্বাস ছিল না এবং নাই। কিন্তু সাধারণ লোকের ঔষধে বিশ্বাস আছে বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বসমক্ষে আপন আপন বিশ্বাসের কথা বলিতে সাহস পান নাই।

লক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছেন এমন একটী ডাক্তার একটী কবিরাজের নিকট গিয়া বলিলেন "ওহে তোমাদের কি ঔষধ আছে দাওতো, আমারতো এই.এই অসুখ"। কবিরাজ বলিলেন "মহাশয় যে কুপথ্য করেন তাহাতে কি ঔষধ চলে ?" ডাক্তার বলিলেন "বটে, তবে আর তোমার ঔষধ কি ? কুপথ্য করিব, গোটা ইলিষ মাছ খাইব, আমার প্রিয় খাদ্য খাইব তাহার উপর তোমার ঔষধে যদি কিছু না হইল তবে তো আমার কাছেও অনেক ঔষধ আছে, তোমার নিকট আসিবার দরকার ?" কুপথ্যই উক্ত ডাক্তারের মৃত্যুর কারণ হইল। ভাবুন দেখি, জানিয়া শুনিয়া যদি চিকিৎসকই নিজের বেলায় পথ্যের নিয়ম মানিয়া চলিতে না পারেন, সাধারণ লোক কুপথ্যের হাত হইতে কি করিয়া অব্যাহতি পাইবে ? শরীরং ব্যাধি মন্দিরং এবং ব্যাধি দূর করিতে ঔষধ ব্যতীত আর কিছুই নাই, বা হইতে পারে না, এই বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া পথ্যের দিকে লক্ষ্য না করিয়া, প্রতিকার নিজের কাছে থাকিতেও তাহা না দেখিয়া, মানুষ কেবল বাহিরে হাতড়াইয়া মরে। ঔষধে কোনই উপকার হয় না, এ কথা মহামতি ও তত্ত্বদর্শী নেপোলিয়ান তাঁহার জীবনের অনেক স্থলে বলিয়াছেন। পুনরায় এ বিষয়ের অবতারণা করিব।

১১। নিদ্রা।

মাত্র একটী কথায় অনেক স্থলে লক্ষ টাকার উপকার হয়, আবার ঐ রূপ একটী কথায় এমন ক্ষতি হয় যাহা লক্ষ টাকাতেও পূরণ হয় না। কর্ম্মসূত্রে আবদ্ধ হইয়া, সংসার-চক্রে পড়িয়া স্বীয় কর্ম্ম দোষে রোগগ্রস্ত হইয়াছে, স্বকীয় কর্ম্মের কুফলের দিকে দেখিতেছে না, কর্ম্ম ব্যতীত থাকিতে পারে না, কর্ম্ম করিয়াই যাইতেছে, রোগ প্রতিকার করিয়াও সারিতেছে না, অথবা রোগ এক এক বার উপশমিত হইতেছে আবার কর্ম্মফলে বাড়িয়া যাইতেছে, এমন অবস্থাপন্ন একটী সচ্চরিত্র, একাগ্রতা বিশিষ্ট, দয়াবান এবং সর্ব্বগুণোপেত মানব যদি হতাশ হইয়া বলেন "শরীরং ব্যাধি মন্দিরং", তবে সাধারণ লোক উক্ত কথার অর্থ কিরূপ ভাবে লইবে? কর্ম্মবীর নেপোলিয়ন যদি বলেন "মনুষ্যের দুই ঘণ্টা নিদ্রাই যথেষ্ট", তবে নেপোলিয়ন উপাসকবৃন্দ উক্ত কথার অর্থ কিরূপ ভাবে লইবেন? বায়রণ যদি বলেন "চিরনিদ্রা ত এক দিন হইবে, তাহার পূর্ব্বে যত পার দিন রাত জেগে কাজ কর", তবে সাধারণ লোক উহার অর্থ কিরূপ করিবে? সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত এবং জীবনে অনাস্থাবান মহা সাধু পুরুষ ও সাক্ষাৎ ভগবান বুদ্ধদেব যদি ভক্তের অনুরোধে শূকরমাংস আহার করিয়া প্রাণত্যাগ করেন,

রামকৃষ্ণ পরমহংসের মত সাধু পুরুষ যদি যদৃচ্ছা ভোজন করেন, বিজয় গোস্বামী যদি জানিয়া শুনিয়া বিষ ভক্ষণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তবে উপাসকমণ্ডলীও আহার সম্বন্ধে "যদৃচ্ছা লাভ"-মত চালাইবেন। কিন্তু যিনি জীবনকে তুচ্ছ বিবেচনা করেন না, জীবন অমূল্য রত্ন মনে করেন, যাহার একটু ক্ষয় হইলে আর পূরণ হইবে না, তিনি বলিবেন না "শরীরং ব্যাধি মন্দিরং", তিনি দুই ঘণ্টা নিদ্রা যাইতে বলিবেন না অথবা চিরজীবন জাগিয়া থাকিতে বলিবেন না, অথবা যদৃচ্ছা পানাহার করিতে বলিবেন না। তিনি বলিবেন যে, রোগ, শোক, পরিতাপ, বন্ধন ও বিপদ এ সমুদয় আত্ম-অপরাধ বৃক্ষের ফল; তিনি আত্ম-অপরাধ অর্থাৎ জীবনের পথে চলিতে চলিতে যে সকল ভুল হয় তাহাই দেখাইয়া সংশোধন করিতে বলিবেন। "মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ" ইহার অর্থ এই যে, সাধুদিগের ও মহাজনদিগের সাধু হৃদয় এবং মহোচ্চভাব লইয়া জীবনকে উন্নত কর; তাঁহাদের জীবনের খোসা লইয়া কি হইবে? দেহের অস্তিত্বই হইল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষের হেতু; সেই দেহকে যিনি নাশ করেন তিনি সমস্তই নিহত করেন, এবং সেই দেহকে যিনি রক্ষা করেন তিনি সমস্তই রক্ষা করেন।

সারাদিনের পরিশ্রমের পর রাত্রে নিদ্রা যাইতে হইবে, এই হইল প্রাকৃতিক নিয়ম; কিন্তু এ নিয়ম ঠিক মত কয়জন পালন করেন? চিকিৎসকগণও কি এ নিয়ম পালন করিয়া থাকেন?

রাত্রি জাগিয়া তাঁহারা পরের ভাল করিতে যান, এবং যিনি যে পথে চলিতেছেন তিনি সেই পথেই চলিতে চলিতে আসল পথটী ভুলিয়া গিয়াছেন। আমাদের শাস্ত্রে বলে,নিদ্রার সময় নিদ্রাভিভূত থাকিলে ধাতুর সাম্যতা হয়, তন্দ্রাভাব দূর হয় এবং শরীরের পুষ্টি, কান্তি, বল, উৎসাহ ও অগ্নি দীপ্তি হয়। এক রাত্রি জাগরণ করিলে তাহার কুফল চল্লিশ রাত্রি ভোগ করিতে হয়, এই কথাটী এক দিন বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয় বলিয়াছিলেন, আমি তৎক্ষণাৎ হাসিয়া বলিলাম "এই তো সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিয়া যাত্রা শুনিয়া দশ-টার সময় ক্লাশে আসিলাম, খাওয়া দাওয়া কিছুই হয় নাই, কষ্ট আবার কি? আপনি যদি বলেন ত আপনার সম্মুখে আরও এক রাত্রি জাগিয়া দেখাইয়া দেই"। শিক্ষক মহাশয় এখন স্বর্গে, কিন্তু তাঁহার সেই একটী কথা চিরদিন মনে থাকিবে। স্বাস্থ্য-তত্ত্ববিৎ জনৈক পণ্ডিত বলেন, "প্রথম রাত্রের এক ঘণ্টা নিদ্রা শেষ রাত্রের দুই ঘণ্টা নিদ্রার সমান, অতএব প্রথম রাত্রেই নিদ্রা যাইবে ইহার অন্যথা যেন না হয়"। বিলাতের জনৈক সর্ব্ব-প্রধান বিচারপতি প্রত্যেক বৃদ্ধ সাক্ষীকে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিতেন, ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পাইতেন, কিন্তু প্রত্যেক বৃদ্ধ সাক্ষী বলিত "সকাল সকাল নিদ্রা যাই এবং অতি প্রত্যূষে শয্যা হইতে উঠি"। নিদ্রার আবশ্যকতা এবং উহার উপকারিতা সম্বন্ধে জগৎকবি সেকস্‌পিয়ার যেরূপ বলিয়াছেন সেরূপ বোধ হয় কেহ বলিতে পারেন নাই। "চিন্তা জ্বরে জর্জ্জরিত হইয়া যদি দেহের প্রত্যেক গ্রন্থি ও সূত্র ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় তবে তৎসমু-

দয়কে বয়ন করিয়া যোড়া দিতে এক মাত্র নিদ্রা ব্যতীত আর কিছুতেই পারে না। কর্ম্ম জীবনের দৈনিক মৃত্যু, অর্থাৎ নিদ্রার পর মানুষ নবজীবন লইয়া উঠে। হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রমের ক্ষত নিদ্রা বিধৌত করিয়া দেয়। দুশ্চিন্তায় পাগলের মত হইয়াছে, অন্তরে শত বৃশ্চিক দংশনের বেদনা অনুভূত হইতেছে, তথায় এক মাত্র প্রলেপ নিদ্রা। প্রাতঃকালের সূর্য্য পিতার ন্যায় আদেশ করেন "মানুষ, যাও তোমার কাজে," সমস্ত দিন কাজের পর সন্ধ্যা দেবী মাতার মত ডাকেন "আয় বাছা আমার কোলে"। জীবন পোষণের জন্য যাহা যাহা আবশ্যক তন্মধ্যে নিদ্রাই সর্ব্ব প্রধান"। নিদ্রা সম্বন্ধে উক্ত কথা গুলি কবি এমন লোকের মুখ হইতে বাহির করিয়াছেন যাহার ক্ষণ কালের জন্য নিদ্রা ছিল না। আমি কথঞ্চিৎ মাত্র বলিতে সক্ষম হইলাম। ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ এবং মর্ম্মগ্রাহী পাঠক ম্যাকৃবেথ পাঠে জানিতে পারিবেন। অহরহঃ দুশ্চিন্তায় থাকিয়া নিদ্রাকে নিহত করিলে অকালে মৃত্যু হইবে।

রাত্রে যিনি স্বপ্ন দেখেন, জানিতে হইবে যে, তিনি কোন প্রকার চিন্তায় সর্ব্বদা ব্যস্ত, অথবা রাত্রে অতি ভোজন করেন। গভীর নিদ্রায় স্বপ্ন আসেনা, এবং চিন্তা শূন্য হইয়া নিদ্রা গেলে নিদ্রাও গভীর হইবে। যাঁহারা অহিফেন সেবন করেন তাঁহারা এমন শান্তিদায়িনী নিদ্রা হইতে চিরবঞ্চিত; তাঁহাদের তন্দ্রা হয়, নিদ্রা হয় না। আহারের কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইবে যাহাতে সুনিদ্রা হয়। হা করিয়া অর্থাৎ মুখব্যাদন করিয়া নিদ্রা

যাওয়া ব্যারামের লক্ষণ, অনেকে জাগ্রত অবস্থায় মুখ বুঁজিয়া থাকেন কিন্তু নিদ্রা গেলেই মুখ খুলিয়া যায়। নিদ্রা কালে একজনকে নিরীক্ষণ করিতে বলিবেন, হা করিয়া নিদ্রা যান কি না সে বলিয়া দিবে। নাসারন্ধ্র ব্যতীত মুখ দিয়া শ্বাস প্রশ্বাস হওয়া শ্বাস-নলির কোন না কোন দোষের লক্ষণ। সর্ব্বদাই মুখ বুঁজিয়া থাকার অভ্যাস করিতে হইবে। আহারাদি সন্ধ্যার পূর্ব্বে শেষ হইয়া যায় তাহাই করিবেন, সন্ধ্যার পরে রাত্রি আট টার সময় আহার শেষ করিয়া অন্ততঃ দুই ঘণ্টা জাগিয়া থাকিতে হইবে। কারণ, একজন চিকিৎসক বলেন "খেয়ে উঠেই নিদ্রা যায় কুপিত কফ তার অগ্নি নিবায়"। অথচ অনেকেই এনিয়ম-টীর দিকে লক্ষ্য করেন না। সন্ধ্যার পূর্ব্বে আহার শেষ করিয়া রাত্রি নয়টা দশটা পর্য্যন্ত সঙ্গীতাদি সৎ কথা শ্রবণ করিয়া মনকে চিন্তা শূন্য করিয়া নিদ্রা যাইতে হইবে, শয্যায় শুইয়াও যদি মন ইতস্ততঃ ধাবিত হয় তবে ঈশ্বরের চরণে আত্ম সমর্পণ এবং ঐ চরণ একাগ্র চিত্তে ধ্যান কর্ত্তব্য, ক্ষণেক পরে মন প্রশান্ত হইবেই। আপনি নিদ্রা আসিবে। এরূপ করিয়াও যদি নিদ্রা না আসে তবে ইষ্টনাম অথবা যে কোন দেব দেবীর নাম উচ্চৈঃস্বরে লইবেন কিম্বা অন্য দ্বারা ঐ নাম উচ্চারিত করাইয়া একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিবেন, নাম শুনিতে শুনিতে আপনিই নিদ্রা আসিবে। রাত্রে শয়ন কালে দিবসের সমস্ত কাজ কর্ম্মের এবং আহারাদির পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিতে হইবে কোনটী ভাল হইয়াছে ও কোনটী মন্দ হইয়াছে। আহারের পরিমাণ ঠিক

রাখিলে নিদ্রার ব্যাঘাত হইবে না। বৈকালের বা রাত্রের আহারের সহিত সুস্বাদু ও রসাল ফল খাইলে গভীরনিদ্রা হইবে। পাকা আতা ফল সুনিদ্রাকারক। যে সময় যেফল পাইবেন, রাত্রিতে খাইবেন, দেখিবেন যেন অতিরিক্ত না হয়। প্রস্রাবের বেগে নিদ্রা না ভাঙ্গে সেইরূপ আহার করিতে হইবে। কেবল যে সুনিদ্রার জন্য এই কথা বলিতেছি তাহা নহে; মূত্রাশয়ে অনেকক্ষণ মূত্রের বেগ আবদ্ধ থাকিলে অতি কঠিন রোগ এবং পাথরী পর্য্যন্ত হইতে পারে। অন্ন আহার করিলে বৈকালে বা সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে খাওয়া উচিত, ফল মূল খাইলে রাত্রি ৮ টায়; অথবা বৈকালে ফল মূলাদি আহার করিয়া রাত্রে একটু দুগ্ধ পান করিবেন। মল মূত্রের বেগে রাত্রে নিদ্রার ব্যাঘাত না হয় সেইরূপ আহার সময় মত করিবেন। সুনিদ্রার জন্য বৈকালে বা রাত্রে লঘু আহার একান্ত আবশ্যক। ময়দার প্রস্তুত খাদ্য দিবসে খাইবেন; রাত্রে বা সন্ধ্যার পূর্ব্বে উহা আহার করিবেন না। প্রত্যেক বার আহারের পর শত পদ মাত্র ভ্রমণ করিয়া বাম পার্শ্বে অর্দ্ধ শায়িত অবস্থায় দশ মিনিট কাল থাকিতে হইবে, এবং অবস্থা বিশেষে আরও কিছু কাল থাকিতে হইবে অর্থাৎ যাঁহারা অতি কঠিন অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন তাঁহারা প্রত্যেক আহারের পর বস্ত্রাবৃত হইয়া ঐ ভাবে থাকিবেন যতক্ষণ শরীর ঘর্ম্মাক্ত না হইবে। শরীর ঘর্ম্মাক্ত হইলে জানিবেন পরিপাক ক্রিয়া সুচারু রূপে হইতেছে, নচেৎ ঐ ক্রিয়ার ব্যাঘাত হইয়া রোগ আক্রমণ করিবে। উক্তরূপ লঘু আহার করিয়াও যদি নিদ্রার

ব্যাঘাত হয়, অথবা অজীর্ণাদি কোন প্রকার রোগের উপসর্গ দেহ হইতে দূরীভূত না হয়, তবে একবার মাত্র দিবসে আহার করিয়া রাত্রে অনাহারে নিদ্রা যাইবেন। তাহাতে সমুদয় উপসর্গ ক্রমে ক্রমে দেহে হইতে বিচ্যুত হইবে। এইরূপে রোগ সমূলে উৎপাটিত হইলে পরে দেহে বলসঞ্চার হইবে; এবং ক্ষুধা বৃদ্ধি হইবে। তখন রাত্রে কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিবেন।

তূলার পুরু বিছানায় বা গদিতে শয়ন করিলে শরীর উত্তপ্ত হইয়া সুনিদ্রার ব্যাঘাত করে। শরীর সমান ভাবে থাকে না; কোন অংশ উচু ও কোন অংশ নিচু, এই ভাবে থাকায় সুপ্ত অবস্থায় মৃদুভাবের রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হইয়া সুনিদ্রার ব্যাঘাত করে, এই কারণে পুরু বিছানায় না শুইয়া সমতল ও শক্ত বিছানায় শয়ন করা উচিত। এবং বস্ত্রাবৃত থাকিলে বস্ত্র যাহাতে চল ভাবে থাকে অর্থাৎ গলা এবং মাজা কসিয়া না থাকে সে দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিবেন। অন্ততঃ দুই প্রস্ত বিছানা থাকা দরকার, চারি প্রস্ত থাকিলে আরও ভাল। এক প্রস্ত ৭।৮ দিন ধরিয়া ব্যবহার কর্ত্তব্য; ইত্যবসরে অন্যগুলি রৌদ্রে ও হাওয়াতে শুকাইবে। তক্তপোষের উপর শয়ন করা উচিত, কারণ মেজেতে বিছানা পাতিয়া শয়ন করিলে শরীরের চারিদিকে বায়ুর চলাচল হইতে পারে না, এবং তদ্ব্যতীত ভূমিতে বা মেজেতে শয়ন করিলে মৃত্তিকোত্থিত বাষ্প বা গ্যাস নিশ্বাসের সহিত শরীরে প্রবেশ করিয়া অসুখ জন্মাইতে পারে; এবং সর্প বৃশ্চিকাদি

হিংস্রক জন্তু দংশন করিতে পারে; তক্তপোষের উপর শয়ন করিলে সেটি হইতে পারে না। মনে করিবেন না যে, জাগ্রত অবস্থাতেও আমি আপনাকে মৃত্তিকা হইতে বিচ্যুত ভাবে থাকিতে বলিতেছি; জীবনের প্রধান চারিটী হেতু হইল মৃত্তিকা, জল, বায়ু এবং সূর্য্য। সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঐ চারিটী হেতু হইতে যাঁহারা যত অধিক বিচ্ছিন্ন হইয়াছেন, তাঁহারাই তত অধিক রোগে জড়িত হইয়াছেন।

ছোট ছেলে ১২ ঘণ্টা, বালক বালিকা ৯ ঘণ্টা, এবং বয়স্ক লোকেরা ৭। ৮ ঘণ্টা নিদ্রা যাইবে। নিদ্রাকালে যথেষ্ট বিশুদ্ধ বায়ু লওয়া চাই। এই কারণে মাথা ঢাকিয়া নিদ্রা যাওয়া ভাল না, জানালা দরজা বন্দ করিয়া নিদ্রা যাওয়াও ভাল নয়; গাত্রে শীত না লাগে, অথচ জানালা অল্প খোলা থাকে ও বিশুদ্ধ বায়ুর চলাচল হয় সেইরূপ ঘরে শয়ন করিবেন। শাশি আঁটা ঘর অপেক্ষা খড় খড়ে যুক্ত দরজা জানালা যে ঘরে থাকে সেই ঘর ভাল; খড় খড়ে বা পাখি খুলিয়া শয়ন করিবেন। শীত লাগিলে গায়ে কাপড় বা লেপ দিবেন তথাপি দরজা জানালা একে বারে বন্দ করিয়া বিশুদ্ধ বায়ুর চলা চল বন্দ করিবেন না। বিশুদ্ধ বায়ুর প্রসঙ্গে এসকল কথা বলিব। নিদ্রান্তে প্রত্যুষে উঠিয়া মুখ ধুইয়া দৈনিক কার্য্যাদি সমাপ্ত করিয়া সন্ধ্যার সময় পুনর্ব্বার মুখ ধুইয়া দাঁত মাজিয়া ফেলিবেন। ফুলখড়ি অথবা ঘুঁটের ছাই দিয়া বা কোন ক্ষার পদার্থ দ্বারা দন্তের ভিতর ও বাহির মাজিয়া ফেলিলে দন্তের ময়লা থাকিতে পারে না; দন্ত অনেক

কাল ভাল থাকে ; ঐ ময়লা থাকিতে দিলে দন্তের অকাল পতন হয়। দাঁতনে দন্তের ভিতর পরিষ্কার হয় না ; রোগগ্রস্ত ব্যক্তি দাঁতন ব্যবহার না করিয়া ফুকখড়ি ব্যবহার করিবেন। জীব জন্তুর দন্ত এবং যে শিশু প্রকৃতি অনুযায়ী আহার করে অর্থাৎ মৎস্যাদি উত্তেজক আহারে সম্পূর্ণরূপ অভ্যস্ত হয় নাই তাহার দন্ত সর্ব্বদাই পরিষ্কার থাকে, দাঁত মাজিতে হয় না। দন্তের ও মুখের ময়লা দ্বারা বুঝা যায় আহার স্বাভাবিক হইতেছে কি না।

১২। উপবাস।

-oo-

উপবাসের আবশ্যকতা ও উপকারীতা সম্বন্ধে পূর্ব্বে বলিয়াছি, কয়েকটি কথা বলা হয় নাই। শরীরের বলের উপর লক্ষ্য রাখিয়া উপবাস করিতে হইবে। বলক্ষয় করিবার জন্য উপবাস নয়, বল সঞ্চয়ের জন্য উপবাস, এই কথাটী মনে রাখিবেন। আমাদের শাস্ত্র মতে মাসে ৪টা উপবাসের বিধি আছে; ২টি একাদশী এবং আমাবস্যা ও পূর্ণিমার উপবাস। একাদশীতে অনেকে একবেলা গুরুতর আহার করেন ; তাহাতে অপকার ব্যতীত উপকার হয় না। আবার অনেকে একাদশী করিয়া সমস্তদিন অনাহারে থাকিয়া দৈনিক কার্য্যাদি এবং শারীরিক পরিশ্রমও করিয়া থাকেন, সেটাও ভুল। যিনি উপবাস করিয়া সমস্ত দিন কোন রূপ পরিশ্রম না করিয়া থাকিতে পারিবেন তিনিই উপবাসের সুফল পাইবেন।

এবং সমস্ত দিন বিশ্রাম অস্তে যদি বৈকালে, সন্ধ্যায় অথবা রাত্রে ক্ষুধা বোধ হয় তাহা হইলে অল্প মাত্রায় লঘু আহার করা একান্ত আবশ্যক। যাঁহারা কার্য্যে লিপ্ত থাকেন তাঁহারা প্রতি রবিবারে দিবাভাগে বা রাত্রে শরীরের অবস্থা অনুসারে এবং ক্ষুধা বিবেচনা পূর্ব্বক একবেলা উপবাস করিতে পারেন। আমি একজনকে রাত্রিতে অক্ষুধা হওয়ায় ও পেট ভার থাকায় উপবাস করিতে বলিয়া ছিলাম, তিনি রাত্রে উপবাস করিয়া পর দিন বলিলেন যে, রাত্রে না খাইয়া প্রাতঃকালে বিছানা হইতে উঠিতে কষ্ট হয়। কষ্ট হইলে জোর করিয়া উঠিয়া কষ্ট পাইবার দরকার নাই; জীবনীশক্তি যুদ্ধের পর যতক্ষণ বিশ্রাম চায় তত ক্ষণ দিবেন।

১৩।১৪।১৫। কাম।

সর্ব্বপ্রথমে আত্মরক্ষা করা, তারপর বংশবৃদ্ধি করা, মনুষ্যের স্বভাব। আত্মরক্ষার পথে লোভ প্রধান অন্তরায়, এবং সেই পথের আর একটী মহাকণ্টক, কাম। মনুষ্যের যত শত্রু আছে, তাহার মধ্যে লোভ আর কাম এই দুইটী শ্রেষ্ঠ, ঐ দুইটী হইতেই সকল প্রকার অনিষ্ট হইয়া থাকে। উহাদিগকে জয় করা বড় কঠিন। কিন্তু আহারাদির যে সমুদয় নিয়ম বলা হইয়াছে ও হইবে, সেই নিয়ম

মত চলিলে লোভ সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সহিত শরীর সুস্থ রাখিবার জন্য যিনি যত্নবান হইবেন, তিনি লোভ এবং লোভের অনুবর্ত্তী কামকেও সীমাবদ্ধ রাখিতে পারিবেন। কাম বৃত্তি উত্তেজিত হইবার কারণ যতক্ষণ অপসারিত না হইবে, ততক্ষণ উহার হাত এড়াইতে পারিবেন না, বরফে ডুবিয়াই থাকুন অথবা অনলে ঝলসিয়াই থাকুন। প্রধান কারণ, যথেচ্ছ পানাহার। এই কারণের দিকে কাহারই লক্ষ্য নাই। কামবৃত্তির সাম্যভাব সুস্থতার লক্ষণ, এবং উহার অস্বাভাবিক উত্তেজনা রোগের লক্ষণ, যেমন স্বাভাবিক দাস্ত সুস্থতার লক্ষণ এবং অস্বাভাবিক, দাস্ত রোগের লক্ষণ, এসকল কথা কেহই জানিতে ইচ্ছা করেন না, অথবা জানেন না।

যথেচ্ছ পান ও আহারের ফলে অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক উত্তেজনা হয়, সমস্ত দেহে উহা অনুভব হয়, এবং শরীরের যে সকল অগ্রাংশ আছে তথায় ঐ উত্তেজনার বিশেষ রূপ অনুভূতি হয়। ছোট ছেলেদের এবং বালকদের অস্বাভাবিক রূপে ইন্দ্রিয় চালনা এবং বয়স্কদের অতিরিক্ত স্ত্রীগমনের মূলে উক্ত কারণটী নিহিত আছে। সময় সময় অনেকে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বৃত্তিটীকে দমন করিয়া রাখেন, কিন্তু কারণ থাকায় অর্থাৎ যথেচ্ছাহার ও অতিরিক্তাহার কারণগুলি উৎপাটিত না হওয়ায় পুনরায় স্খলিত হইয়া পড়েন। যে অস্বাভাবিক কামবৃত্তি সাধারণতঃ দেখা যায় তাহা হইতে সুস্থদেহীর কামবৃত্তি সম্পূর্ণ প্রভেদ। সুস্থ দেহে অস্বাভাবিক উত্তেজনা হইবে না; কামবৃত্তি যদি কিছু কালের মত

চরিতার্থ না হয় তাহাতেও কোন অসুখ বোধ হইবে না। প্রকৃতই যিনি সুস্থদেহী এবং অনুত্তেজক ও স্বাভাবিক বা প্রকৃতি অনুযায়ী আহার করিয়া দেহ ও মন পবিত্র রাখিয়াছেন তিনিই উক্ত কথা বেশ বুঝিবেন।

পিতা মাতা যেমন হইবেন সন্তানও তেমনি হইবে। ছেলেরা পড়া শুনায় মন নিবিষ্ট করিতে পারে না, সর্ব্বদাই মন অন্য বিষয়ে আকৃষ্ট হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত চাল চলন খারাপ, কথা বার্ত্তা ভাল নয়, এবং হয়তো অত্যন্ত রাগী বা জেদী হয়। সকলেই বলেন, "আজ কালকার ছেলেরাই এমনি", কিন্তু এরূপ খারাপ হওয়ার অন্য কারণ আছে কি না তাহা কেহ বলেন না, অথবা অনুসন্ধানও করেন না। যথেচ্ছ পানাহারের কুফলে মস্তিষ্কের ক্রিয়া খারাপ হয় ও সমস্ত চালচলন বেগড়াইয়া যায়। পিতা মাতা এবং শিক্ষক বেত প্রহার ও নানা প্রকারে শাসন করিয়াও কিছুই করিতে পারেন না। অনুত্তেজক আহার পরিমাণ মত করাইয়া মন্দ ছেলেকে ভাল করা যায় কি না তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখুন। অনুত্তেজক আহার দিয়া এবং আবশ্যক মত ভাপড়া দিয়া স্নান করাইয়া ও তলপেট রগড়াইয়া ধুইয়া শরীরের অস্বাভাবিক পানাহারোদ্ভূত বিষকে, অথবা পিতা মাতা হইতে অর্জ্জিত বিষকে, দূর করিয়া পরীক্ষা করুন সন্তান শান্ত ও ধীরপ্রকৃতি হয় কি না। আমাদের দেশের বিধবা স্ত্রীলোকের যে আহারের ব্যবস্থা আছে, স্বাস্থ্যান্বেষীদের সেই অনুসারে চলা উচিৎ।

সৈন্ধবং কদলী ধাত্রী পনসাম্র হরিতকী।
গোক্ষীরং গোঘৃতং চৈব ধান্য মুদ্গা তিলা যবাঃ॥

অর্থাৎ সৈন্ধব, কদলী, আমলকী, পনস (কাঁটাল), আম্র, হরিতকী, গোদুগ্ধ, গোঘৃত, ধান্য, মুগ, তিল ও যব বিশেষ প্রশস্ত। আহারান্তে অল্প পরিমাণ হরিতকী ভক্ষণ অতি উপকারী। তাম্বুল চর্ব্বণ নিষিদ্ধ। কারণ তাম্বুল উত্তেজক। মুখ শুদ্ধির জন্য হরিতকী যেমন, তেমন আর কিছুতেই মুখকে শুদ্ধ, পরিস্কার ও দুর্গন্ধহীন রাখিতে পারে না। ডাইলের মধ্যে মুগ, ছোলা ভাল। মাষকলাই ও মসুর উত্তেজক। ছোলার ডাইল গুরুপাক, ঘৃতও গুরুপাক; অগ্নি বিবেচনা করিয়া এই গুলি আহার করিতে হইবে। ঘৃত দুগ্ধাদি স্নিগ্ধ দ্রব্য ও অন্যান্য গুরুপাক খাদ্য যথা আলু, কফি, ছোলা প্রভৃতি দাস্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া, অর্থাৎ স্বাভাবিক দাস্তের একটুও ব্যতীক্রম না হয় তাহা দেখিয়া, আহার করিতে হইবে। এইরূপ করিলে দেহ ও মন পবিত্র হইবে। এই সময় দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া কুচিন্তাকে তাড়াইলে চিরদিনের মত তাড়াইতে পারিবেন। মনের উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারিবেন। তখন বাহ্যিক প্রলোভনের বস্তু হইতে এবং স্ত্রীলোকাদি হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পারিবেন। আলস্য, ঔদাস্য, খরতর দৃষ্টির অভাব এবং পিতা মাতার আরও অনেক দোষ নিবন্ধন ছেলেরা অল্প বয়সেই খারাপ হইয়া যায়।

ছয় সাত বৎসর বয়স হইতেই সন্তান দিগকে পৃথক পৃথক বিছ-

নায় রাখিবেন। অন্য ছেলে বা খেলার সাথির সহিত কদাচ এক সঙ্গে শয়ন করিতে দিবেন না। আপনাপন শৈশবাবস্থার কুসঙ্গের বিষয় মনে করিয়া সন্তান দিগকে কুসঙ্গ হইতে সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন, না করিলে চিরজীবন দগ্ধ হইবেন। উনিশ কুড়ি বৎসর পর্য্যন্ত ছেলেকে চক্ষের উপর রাখিবেন। কুসঙ্গের কুফল ভয়ানক। জীবন পথের কুযাত্রী অনেক মেলে, সুযাত্রী পাওয়া ভার। নাটক নভেল প্রভৃতি কুভাবাপন্ন পুস্তক ছেলের হাতে যেন না পড়ে। পিতামাতাদিগকেও নিজেদের চরিত্র ঠিক রাখিতে হইবে, তবে ছেলেও ঠিক পথে চলিবে। ছেলেরা যেমন দেখে তেমনি শেখে; যাহাতে তাহারা সর্ব্বদা ভাল দেখিতে পায় পিতা মাতাকে সেইরূপ ভাবে থাকিতে হইবে। ছেলে সর্ব্বদা আদর্শ চরিত্র দেখিতে পাইলে যেরূপ সুফল হয় সেরূপ অন্য কিছুতেই হইতে পারে না। কুসঙ্গ সর্ব্বদা পরিত্যজ্য। কুগ্রন্থ অধ্যয়ণ, কুচিত্র দর্শন, কুবাক্য কিম্বা কুসঙ্গীত শ্রবণ, এ সমস্তই কুসঙ্গের মধ্যে পরিগণিত। পিতা মাতা ঐ সমস্তকে বাটীর সীমানায় আসিতে দিবেন না। স্কুলে যদি ঐগুলি হইতে ছেলেকে রক্ষা না করিতে পারেন তবে বিদ্যালয় হইতে যে উপকার আশা করেন তাহা ফলিবে না। আমাদের শাস্ত্রে আছে "মরণং বিন্দু পাতেন জীবনং বিন্দু ধারণাৎ"। যিনি অবিচলিত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে পারেন তাঁহার শারীরিক ও মানসিক বীর্য্য লাভ হয়। স্কুলে যদি ব্রহ্মচর্য্যের পরিবর্ত্তে কুসঙ্গে পড়িয়া কুশিক্ষা পায় তবে ছেলের ইহকাল পরকাল উভয়ই মাটী হইবে। পাশ্চাত্য দেশের একজন পণ্ডিত চিকিৎসক বলেন

যে, জননেন্দ্রিয়ের ব্যবহার স্থগিত রাখিলে শরীরিক ও মানসিক তেজ এবং আধ্যাত্মিক জীবনের বিশেষ উৎকর্ষ লাভ হয়। তাহাতে শরীরের পবিত্রতম রক্তবিন্দুগুলি যাহা তেজোরূপে পরিণত হয় প্রকৃতিই তাহার সদ্ব্যবহার করিয়া থাকেন। প্রকৃতি দেবী সেই রক্ত বিন্দুগুলি দ্বারা মস্তিষ্কের শক্তি সুতীক্ষ্ণতর এবং স্নায়ু ও মাংস-পেশী দৃঢ়তর এবং অধিকতর জীবনীশক্তি পরিপূর্ণ করিয়া থাকেন। প্রবল রোগ হইলে প্রাণের দায়ে সুরাপায়ীকে, কামাতুরকে অথবা দুর্দ্দান্ত লোভী বা অতিরিক্তাহারী পেটুক্‌কেও কয়েক দিনের জন্য সংযত হইতে হয়; লোভ সম্বরণ করিতে হয়; সেই সময় দেখা উচিত কি পরিমাণ উচ্ছৃঙ্খলতার সহিত জীবন কাটি-য়াছে, রোগের সময় কিরূপ সংযত হইতে হইয়াছে, সেইরূপ ভবিষ্যৎ জীবন শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া থাকিলে অর্থাৎ একটা বাঁধাবাঁধি নিয়মের মধ্যে রাখিতে পারিলে অনেক মঙ্গল হইবে। যিনি যে পরিমাণে ব্রহ্মচারী হইবেন তাঁহার সেই পরিমাণে হৃদয় প্রফুল্ল, মস্তিষ্ক সবল, শরীর শক্তিমান, মন ও মুখশ্রী স্নিগ্ধ ও সুন্দর হইবে; এবং যাহার যে পরিমাণে বহ্মচর্য্যের অভাব হইবে তাহার সেই পরিমাণে হৃদয় বিষণ্ণ, মস্তিষ্ক দুর্ব্বল, শরীর নিস্তেজ ও মুখশ্রী রুক্ষ ও লাবণ্যশূন্য হইবেই। অনেক ভ্রষ্টচরিত্র ব্যক্তিকে দেখা যায় যে, তাহারা নানা প্রকার অতি পুষ্টিকর দ্রব্যাদি আহার করিয়া বাহিরে শরীর সতেজ রাখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সহস্র চেষ্টা করিলেও প্রকৃত পক্ষে সতেজ রাখিতে সমর্থ হয় না, অন্তঃসার বিহীন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় অর্থাৎ

ইন্দ্রিয় চরিতার্থের সহিত ঔষধ সেবন করিলে কি ভয়ানক কুফল হয় তাহা পরে বলিব। মানসিক দুর্ব্বলতা সম্বন্ধে একজন পাশ্চাত্য দেশের চিকিৎসক বলিয়াছেন—ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিদিগের মানসিক বিকৃতি বুদ্ধি বৃত্তির বিশেষতঃ স্মৃতিশক্তির দুর্ব্বলতা দ্বারা লক্ষিত হয়। ইন্দ্রিয়সংযমের অভাব নিবন্ধন অনেক যুবককে মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা, ধারণা শক্তির অভাব, স্মৃতিশক্তির হ্রাস, মনের ঔদাস্য, চিত্তের চাঞ্চল্য, স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, উদরাময়, হৃদকম্প, অরুচি, শিরঃপীড়া প্রভৃতি নানা বিধ দুশ্চিকিৎস্য রোগে বিশেষ কষ্ট পাইতে দেখা যায়।

স্ত্রীলোকাদি প্রলোভনের বস্তু হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিতে হইবে। কাম দমন করিতে হইলে কুচিন্তার প্রতি খড়্গহস্ত হইতে হইবে। ভিতরে কুচিন্তাকে স্থান দিলে পাপের আর বাকী থাকিল কি? ইহাই ত পাপের ভিত্তি। কুচিন্তা দূর করিতে পারিলে চারিদিক পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এমন লোক আছেন যাঁহারা কোন কুক্রিয়া করেন না কিন্তু কুচিন্তার দ্বারা সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন। তাহা দূর করিবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু কিছুতেই যেন তাহা ছাড়াইতে পারিতেছেন না। একব্যক্তি এইরূপ কুচিন্তাপীড়িত হইয়া ডাক্তার লুইসের নিকট চিকিৎসার জন্য উপস্থিত হন, তিনি তাঁহাকে এই কয়েকটী উপদেশ দেন—"মনে স্থির সিদ্ধান্ত করিবে যে,কুচিন্তা নিতান্তই ভয়াবহ ও অনিষ্টজনক, তাহা হইলে যেই কুচিন্তার উদয় হইবে অমনি চকিত হইবে। চেষ্টা করিয়া তৎক্ষণাৎ অন্য বিষয়ে মনকে নিযুক্ত

করিবে। কুচিন্তা দূর করিতে প্রকৃতই ব্যাকুল হইলে মনের ভিতরে এমন একটা ভয় জন্মাইতে পারিবে যে, নিদ্রিতাবস্থায় কুচিন্তা উপস্থিত হইলেও তৎক্ষণাৎ তুমি জাগ্রত হইবে। (কতকগুলি লোক ইহার সাক্ষ্য দিয়াছে।) জাগ্রত অবস্থায় শত্রু প্রবেশ করিলে তৎক্ষণাৎ সচকিত হইবে এবং বিশেষ কষ্ট না করিয়াও দূর করিয়া দিতে সক্ষম হইবে। যদি এক মুহূর্ত্তের জন্যও দূর করিয়া দিতে পারিবে না বলিয়া সন্দেহ হয়, লম্ফ দিয়া উঠিয়া অমনি শারীরিক কোন বিশেষ পরিশ্রমের কার্য্য আরম্ভ করিয়া দিবে। প্রত্যেক বারের চেষ্টাই পরের চেষ্টা সহজ করিয়া দিবে এবং দুই এক সপ্তাহ পরেই চিন্তাগুলি আয়ত্তাধীন হইবে।

এতদ্ব্যতীত স্বাস্থ্যের বিধিগুলি পালন করিবে। অলস ও অতিরিক্তাহারী ব্যক্তিগণই ইন্দ্রিয় লালসা হইতে কষ্ট পায়। খুব পরিশ্রম করিবে কিম্বা ব্যায়াম অথবা ভ্রমণ করিয়া দিনের মধ্যে দুই তিন বার বিশেষ রূপে ঘর্ম্ম বাহির করিবে। লঘুপাক পুষ্টিকর ও অনুত্তেজক পদার্থ আহার করিবে। রাত্রি অধিক না হইতে নিদ্রিত হইবে এবং প্রত্যুষে গাত্রোত্থান করিবে। নিদ্রার পূর্ব্বে এবং গাত্রোত্থানের সময়ে প্রভূত পরিমাণে শীতল জল পান করিবে এবং নির্ম্মল বায়ুপূর্ণ স্থলে নিদ্রা যাইবে।"

এই উপদেশ অনুসারে কার্য্য করিয়া সেই ব্যক্তি এবং আরও অনেকে এই পাপ হইতে মুক্ত হইয়া নানা প্রকার কঠিন রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছে। সুতরাং অনুত্তেজক আহার কাম দমনের প্রধান সহায়। আমাদের শাস্ত্রে বলিতেছে—

কটম্ল লবণাত্যুষ্ণ তীক্ষ্ণ রুক্ষ বিদাহিনঃ।
'আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখ শোকাময় প্রদাঃ॥

অর্থাৎ তিক্ত,অম্ল,লবণ,অত্যুষ্ণ, তীক্ষ্ণ (মরীচাদি), রুক্ষ, বিদাহি (সর্ষপাদি) পদার্থ রাজস ব্যক্তিদিগের বাঞ্ছনীয় আহার, ইহার দ্বারা দুঃখ, শোক, রোগ উপস্থিত হয়।

ডাক্তার লুইস্ ডিম্ব, কর্কট, মৎস্য, মাংস, সর্ষপ, মরীচ, লবণ, অতি মিষ্ট ও গুরুপাক পদার্থ এবং অধিক মস্‌লা দ্বারা প্রস্তুত খাদ্য জিতেন্দ্রিয়ত্ব সাধনের বিশেষ প্রতিকূল বলিয়াছেন।

অতএব উক্ত উত্তেজক আহার ত্যাগ করিয়া অনুত্তেজক আহার অবলম্বন করিলে কাম সীমাবদ্ধ হইয়া থাকিবে। তখন অস্বাভাবিক উত্তেজনা হইবে না। তখন "মাসে এক বছরে বারো, তাতেও যত কমাতে পারো" এই কথাটীর অর্থ বুঝিতে পারিবেন।

কোন্ সময় স্ত্রীগমণ করা উচিৎ? ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তিও ইচ্ছা করেন যে, তাঁহার সন্তান যেন নিরোগী হয়। কিন্তু এই ইচ্ছাটী ফলবতী করিতে হইলে কি করা উচিত? শরীর যে সময় সুস্থ এবং তেজপূর্ণ থাকে সেই সময় স্ত্রীগমণ করা কর্ত্তব্য। সে সময়টী কোন সময়?

ছুরি, কাঁচি সান্ দেওয়া বোধ হয় আপনি দেখিয়াছেন। সানের চাকাটী যে দিকে ঘুরিতে থাকে ঠিক তাহার বিপরীত দিকে অর্থাৎ চাকার গতিটী রোধ করিয়া ছুরিটী ধরিলে যেরূপ

অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্বিপরীত ভাবে ধরিলে অর্থাৎ চাকার গতির অনুকূল ভাবে ছুরিটী ধরিলে সেরূপ অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয় না। পৃথিবীর গতির সহিত সূর্য্যেরও ঠিক ঐরূপ সম্বন্ধ। যখন সূর্য্যের রশ্মি পৃথিবীর গতির প্রতিকূলে পতিত হয় তখন পৃথিবী এবং পৃথিবীর সমুদয় প্রাণী তেজ পরিপূর্ণ হইয়া যায়। প্রাতঃকালে এইরূপ হয়, কারণ, সেই সময় সূর্য্যের রশ্মির সহিত পৃথিবীর সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে। এই জন্য প্রাতঃকালকে সঞ্জীবন কাল (Period of animation) বলে, এবং সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের রশ্মি পৃথিবীর গতির অনুকূলে পতিত হয়। অর্থাৎ প্রাতঃকালের ন্যায় সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকে না, সেই জন্য সন্ধ্যাকালে পৃথিবী ও পৃথিবীর সমুদয় জীব নির্জীব ও ম্রিয়মান হইয়া থাকে। এই কারণ সন্ধ্যাকালকে বিরাম কাল (Period of relaxation) বলা যায়। শেষ রাত্রি হইতে বেলা ১২টা পর্য্যন্ত সঞ্জীবন কাল এবং বেলা ১২টা ১টা হইতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত বিরাম কাল। অন্যান্য প্রাণীগণের প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দেখা যায় তাহারা সময়োচিত কার্য্য করে, কিন্তু মনুষ্য তদ্বিপরীত আচরণ করে। জীবজন্তুগণ আহার, বিহার, পরিশ্রম প্রভৃতি সমুদয় উত্তেজনা পূর্ণ কার্য্য দিনমানের প্রায় প্রথম ভাগেই সমাধা করে। দিনমানের শেষ ভাগে তাহারা বিশ্রাম করে। অন্ততঃ বংশরক্ষার জন্য এই প্রাকৃতিক নিয়মটী অনুসরণ করা উচিত।

১৬। পরিচ্ছদ।

-০৩০-

আবরণ, আভরণ এবং শীত নিবারণের জন্য পরিচ্ছদ আবশ্যক। প্রাকৃতিক নিয়ম অক্ষুণ্ণ থাকে, অর্থাৎ সমস্ত শরীরে সর্ব্বদা সমভাবে রক্তের চলাচল হয় সেই দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া শরীর আবৃত করিতে হইবে। এইটী কার্য্যে পরিণত করিতে হইলে কটিদেশ এবং কণ্ঠদেশ বন্ধন করিয়া বস্ত্র পরিধান করা হইতে পারে না; কারণ, তদ্দ্বারা কি প্রকারে রোগ জন্মে তাহা শ্বাস প্রশ্বাস ও বিশুদ্ধ বায়ুর প্রসঙ্গে বলিব। আহার সম্বন্ধে যেরূপ অতিরিক্ত দেখা যায়, পরিচ্ছদ সম্বন্ধেও সেইরূপ। অতি সামান্য ব্যয়ে কিরূপে স্বাস্থ্যরক্ষা করা যায় তাহা অবশ্য এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া বুঝিবেন। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে রোগের স্রোত আসিয়াছে তাহাও বুঝিবেন। এবং যিনি প্রকৃত পক্ষে স্বাস্থ্য অন্বেষণ করিবেন তিনি "খাওয়া পরার" অত্যাবশ্যক অংশগুলি রাখিয়া অনাবশ্যক গুলি পরিত্যাগ করিবেন। আহারাদির যে সকল নিয়ম বলা হইতেছে সেই মত চলিতে পারিলে অতিরিক্ত আবরণেরও আবশ্যক হইবে না। স্বল্পাহার ও স্বাভাবিক আহারে শরীর সুস্থ রাখিতে পারিলে অধিক পরিচ্ছদ কেন লাগিবে?

ছয় টাকা অথবা আট টাকা খরচে লংক্লথ কিম্বা

মারকিন কিম্বা অন্য কোন মোটা সুতি কাপড়ের চারি প্রস্ত উত্তম পোষাক প্রস্তুত হইতে পারে; যাহা দুই বৎসর বেশ চলিবে, অথচ সমস্ত শরীর আবৃত থাকিবে। কিন্তু চলিত পোষাকের খরচটা এক বার ভাবিয়া দেখুন। কেবল মাত্র পরিধেয় বস্ত্রের খরচই বৎসরে ছয় টাকা হইতে আট টাকা। তার উপর পিরান আছে, কামিজ আছে, কোট আছে, গঞ্জি আছে, মোজা প্রভৃতি আরও কত কি আছে। এত খরচ করিয়াও অর্দ্ধনগ্নাবস্থায় থাকিতে হয়; শীতও সম্পূর্ণরূপে নিবারিত হয় না। এ বিষয় অধিক বলার আবশ্যক নাই। যিনি পোষাকের কার্য্যকারিতার দিকে লক্ষ্য করিবেন, তিনি সেই মত পোষাক প্রস্তুত করাইয়া লইবেন, এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক এ অধীনকে জিজ্ঞাসা করিলে সেও ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি অনুসারে এ বিষয়ে যথাসম্ভব বলিয়া দিবে।

আমাদের দেশে, স্থূলভাবে ধরিলে দেখা যায়, ছয় মাস গ্রীষ্ম এবং ছয় মাস শীত। শীতকালের মধ্যের তিন মাসই কিছু অতিরিক্ত শীতবস্ত্রের আবশ্যক হয়। যাঁহার সর্ব্বদা এবং বারমাস গাত্রে জামাযোড়া থাকে তিনি হঠাৎ সমস্ত শরীর অনাবৃত করিলে অসুখে পড়িতে পারেন। এবং যিনি সর্ব্বদা অনাবৃত শরীরে থাকেন তিনিও যেন অসুখের সময় দুঃসাহসিকের মত শরীর অনাবৃত না রাখেন। দারুন গ্রীষ্মের সময় যদি অসুখ হয় সে সময়েও শরীর বস্ত্রাবৃত রাখিতে হইবে। ক্রমে ক্রমে পোষাকের মাত্রা কমাইতে হইবে। এই কথাটি কার্য্যে পরিণত করিতে

হইলে, স্বাভাবিক আহারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মৎস্য মাংসাদি অস্বাভাবিক বস্তু আহার এবং অপরিমিত আহার করিলে কখনই শীত নিবারণ হইবে না; বরং তাহাতে পরিপাক শক্তি খারাপ হইয়া দেহের স্বাভাবিক অগ্নি বা তাপ ক্রমে ক্রমে কমিয়া যাইবে। (মাদকতার বিষয়টী পাঠ করিবেন)। সুতরাং পোসাকের মাত্রা কমা দূর হউক বাড়িয়াই যাইবে। এটী আমি নিজে প্রত্যক্ষ করিতেছি এবং নিম্নলিখিত বৃত্তান্তে চাক্ষুষ দেখিয়াছি।

আমার একটী আত্মীয়ের সন্তানাদি না হওয়ায় তিনি পশু পক্ষী অর্থাৎ কুকুর, বিড়াল, শালিকপাখী, ময়না, টিয়া, ছাগল প্রভৃতি গৃহপালিত পশু পক্ষীদিগকে অপত্যনির্বিশেষে লালন পালন করিতেন। উহাদের জন্য সাজ-সরঞ্জাম ও আড়ম্বর বিস্তর ছিল। শীতকালে তাহাদের গাত্রের জামা, শয়ন করিবার বিছানা, এবং আহারের ব্যবস্থাও খুব ভাল ছিল। কিন্তু তাহাতে কি হইবে? অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত আহারের দোষে গাত্রে জামা এবং খাঁচার ঘটাটোপ্ দিয়াও পশু পক্ষীদের শীত ভাঙ্গিত না; শীতে কাঁপিত এবং মানুষের কোল পাইলে ভাল থাকিত। অথচ সেই সময়ে সেই জাতীয় অন্যান্য পশু পক্ষীগণ সচ্ছন্দে ঘুরিয়া ফিরিয়া আহারাদি করিয়া বেড়াইত, শীতেও কাঁপিত না, এবং শীত নিবারণের জন্য তাহাদের উক্ত প্রকার ব্যবস্থাও ছিল না। কোন্‌গুলির স্বাভাবিক অগ্নি অক্ষুন্ন থাকিয়া অধিক কার্য্যকরী এবং কোন্‌গুলি অধিক দিন বাঁচিতে পারে তাহা

পাঠক মহাশয়, আপনি বলুন। শীতের সময় অল্প শীতবোধ সুস্থতার লক্ষণ, এবং অধিক শীতবোধ অসুস্থতার লক্ষণ। সর্ব্বদা গাত্রে জামা যোড়া থাকিলে এবং প্রত্যহ গরম জলে স্নান করিলে ত্বগেন্দ্রিয় শিথিল হইয়া যায়, দেহ রোগগ্রাণ হইয়া পড়ে।

১৩। বিশুদ্ধ বায়ু।

পান ও আহার না করিয়া কিছুদিন থাকা যায়, কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসের জন্য বায়ু না হইলে ক্ষণেকের মধ্যে মৃত্যু হয়। একজন ডাক্তার চল্লিশ দিন বিনা অন্নে বাঁচিয়াছিলেন, জল না পান করিয়াও মনুষ্য দুই চারি দিন বাঁচিতে পারে, কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাসের বায়ু প্রতিক্ষণে চাই, না হইলে মৃত্যু অনিবার্য্য। পান, আহার ও বায়ু এই তিনটীর উপর জীবন, তন্মধ্যে বায়ুর আবশ্যকতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। যতক্ষণ জীবন থাকে ততক্ষণ দেহে রক্ত সঞ্চালন হয়, এই রক্ত সঞ্চালনক্রিয়া কিরূপে হইতেছে, কে ইহা প্রথমে বিজ্ঞানবলে লোককে জানাইয়া দেয়, সকলেই জানেন। স্বাস্থ্যরক্ষা পুস্তকে বালকগণও বৈজ্ঞানিক হারভির নাম পাঠ করিয়াছে। কেহ বলেন, মাইকেল সারভিটাস্ নামক এক ব্যক্তি এই আবিষ্কারটী সর্ব্বপ্রথমে করেন; এবং তৎকালে এই নুতন তত্ব প্রচার করায় তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়। তাঁহার লিখিত একটী পুস্তিকায় ঐ তত্ব পাইয়া হারভি পরে উহা প্রচার করেন। সমস্তদেহের রক্তপ্রবাহ

শরীরের সমস্ত আবর্জ্জনা ও ময়লা লইয়া হৃদ্‌পিণ্ডে গিয়া পতিত হয়, হৃদ্‌পিণ্ড হইতে গাঢ় রং বিশিষ্ট অপরিস্কৃত রক্ত ফুস্‌ফুসে যায়, ফুস্‌ফুস্ সেই রক্তকে বায়ুর অম্লজান (oxygen) সাহায্যে পরিস্কার করিয়া তাহাতে জীবনীশক্তি মাখাইয়া দেয়, ফুস্‌ফুস্ কর্ত্তৃক পরিস্কৃত হইয়া রক্ত স্বাভাবিক লালবর্ণ ধারণ করে। এই রক্ত সমস্ত শরীরের শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত দেহকে সঞ্জীবিত করিয়া এবং শরীরের ময়লা সংগ্রহ করিয়া পুনরায় হৃদ্‌পিণ্ডে পতিত হয়। এইরূপে নিশি দিন ও প্রতি ক্ষণে রক্তপ্রবাহ চলিতেছে। নিশি দিন ও প্রতি ক্ষণে ফুস্‌ফুস্ হৃদ্‌পিণ্ডের অপরিস্কৃত রক্তকে পরিস্কার করিয়া তাহাতে জীবনীশক্তি মাখাইয়া দিতেছে।

ফুস্‌ফুস্ কি দিয়া ঐ রক্তকে পরিস্কার করে? আমরা যে বায়ু নাক দিয়া টানি এবং যাহা শ্বাস-নলির ভিতর দিয়া গিয়া ফুস্‌ফুস্‌কে স্ফীত করে, সেই বায়ুর অম্লজান অপরিস্কৃত রক্তকে পরিস্কৃত এবং কার্য্যকরী করে, এবং তাহার ময়লা কার্ব্বনিক্-এসিড্-গ্যাস্ রূপে প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যায়। আমরা যে প্রশ্বাসটী ত্যাগ করি তাহার সহিত শরীরের ময়লা অশুদ্ধভাবে বাহির হইতেছে। সেই জন্য বলে, "নিশ্বাসে বা সহবাসে, ছোঁয়াচে ব্যাধিটী আসে"। কিন্তু রক্ত যদি খুব বিশুদ্ধ হয় তবে কোন ব্যাধিই আসিতে পারে না। অস্বাভাবিক আহার বিহারে রক্ত কখনই ষোল আনা বিশুদ্ধ থাকিতে পারে না। কারণ মাদক দ্রব্যের প্রসঙ্গে বলিব।

প্রতি ক্ষণে বিশুদ্ধ বায়ুর আবশ্যকতা সম্বন্ধে আর অধিক বলিতে হইবে না। প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু সেবন রোগীর পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ঔষধ; এবং সুস্থদেহীরও একমাত্র স্বাস্থ্যপ্রদ উপায়। স্বাস্থ্যের জন্য, জীবনের জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর আবশ্যকতা কে না জানেন? অথচ সকলেই ও বিষয়ে উদাসীন! চব্বিশ ঘণ্টা কি প্রকার বায়ু লইতেছেন সে দিকে ভ্রুক্ষেপও হয় না, সুতরাং পাড়াগাঁয়ে যাহারা বাস করে তাহাদের অদৃষ্ট ভালই বলিতে হইবে। কিন্তু পল্লীগ্রামের অবস্থাও আজ কাল অতি শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তথাপি তথায় প্রতিকার যত সহজসাধ্য, কলিকাতার মত সহরে সেরূপ আশাও করা যায় না। সর্ব্বত্রই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক আইন জারি আছে, কিন্তু তাহা কতদূর রোগ দমনকারী তাহা সকলেই জানেন; অথচ কোন একটী মহামারী উপস্থিত হইলে ঐ আইনেরই দোষ দিয়া মানুষ নিশ্চিন্তভাবে থাকে। কিন্তু জানা উচিত যে, রোগের ষোল আনা কারণ মধ্যে প্রত্যেকে নিজ নিজ গৃহে বার আনার প্রতিবিধান করিতে পারে; এবং যে চারি আনার প্রতিবিধান জন্য আইন জারি আছে, সেই আইনের আবার দু-আনা রকম হয়তো আমলে আসে। সুতরাং যে চৌদ্দ আনা প্রত্যেকের আয়ত্তাধীন তাহার জন্য কিরূপ বিধান হওয়া উচিত তাহা অবশ্য এই পুস্তক পাঠে জানিতে পারিবেন।

শীত নিবারণের জন্য ঘরের সমস্ত জানালা এবং দরজা বন্দ করিয়া থাকেন এবং ছোট ছোট ঘরে বাস করেন, এবং

অনেকে, সমস্ত রাত্রি ঘরে আলো জ্বালিয়া, কেহ বা আগুন রাখিয়া, শয়ন করেন। ঘরে যে পরিমাণ বিশুদ্ধ বায়ু থাকে তাহার অম্লজান টুকু আগুনে অথবা আলোতে খরচ হইতে থাকে—সকলেই জানেন, অম্লজান না হইলে আগুন বা আলো জ্বলে না—এবং দেহাগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখিতে ঐ অম্লজানটুকু আবার প্রতি নিশ্বাসে ফুস্‌ফুস্ টানিয়া লইতেছে; কিন্তু প্রত্যেক প্রশ্বাসের সহিত শরীরের যে ময়লা নির্গত হইতেছে তাহা বাতাস চলাচল না হওয়াতে ঘরের বিশুদ্ধ বায়ুর সহিত মিশ্রিত হইয়া তাহাকে দূষিত করে। সারা রাত্রি ঐ দূষিত বায়ু—ফুস্‌ফুস্ কর্তৃক প্রতেক প্রশ্বাসের সহিত পরিত্যক্ত শরীরের মল ও মূত্র সদৃশ্য পদার্থদ্বারা দূষিত বায়ু—প্রায় সকলেই নিদ্রার সময় সেবন করিয়া আস্তে আস্তে নানা ব্যাধির অঙ্কুর ও অকালমৃত্যুর হেতু সৃজন করিতেছেন। না জানিয়া ঘরে আগুন রাখিয়া বা কয়লা জ্বালিয়া শীতনিবারণ করিতে গিয়া নিদ্রাবস্থাতেই অনেকের পঞ্চত্ব ঘটিয়াছে। আমাদের দেশে স্ত্রীলোকদিগের প্রসবের জন্য যে আঁতুড় ঘর নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা প্রায়ই অপরিস্কৃত, অপ্রসস্ত এবং বায়ু-চলাচল-রহিত। সহর অপেক্ষা পল্লীগ্রামে আবার ইহার অবস্থা অতি শোচনীয়। একটী ছোট কুঠরীতে বা সদ্য-নির্ম্মিত চালাঘরে বা কুঁড়ে ঘরে প্রসূতি, প্রসূত সন্তান, দাই, ও একটী দাসী চারি দিকের বায়ু-পথ রুদ্ধ করিয়া অগ্নি জ্বালাইয়া ঘরের মধ্যে ধূম পরিপূর্ণ করিয়া রাখে। ইহা অপেক্ষা বিপদজনক অবস্থা আর দ্বিতীয় নাই। এমন অনেক ঘটনা হইয়াছে যে, এই প্রকার রুদ্ধ আঁতুড় ঘরে প্রসূতি,

প্রসূত সন্তান ও দাই তিন জনেরই মৃত্যু হইয়াছে। এরূপ মৃত্যুর কারণ ত বেশ বুঝিলেন, অতএব পূর্ব্ব হইতেই সাবধান হইবেন, তাহা হইলে দম আট্‌কাইয়া বা আকস্মিক হৃদ্‌রোগে মৃত্যু হইবে না।

আজ কি না নিদ্রা হইল না, আজ কি না ঘুমের ব্যাঘাত হইল, 'আজ কি না নিদ্রা ভঙ্গে শ্রান্তি বোধ হইতেছে অথবা বিরক্তি বোধ হইতেছে, আজ কি না নিদ্রা হইতে উঠিয়া অতৃপ্তি, অসুখ, আলস্য বোধ বা কার্য্যে অনিচ্ছা হইতেছে। এ সকলের কারণ অনুসন্ধান করেন কি? সমস্ত দেহ এবং দেহের শিথিল-প্রাপ্ত ও ম্রিয়মান গ্রন্থিসমুদয় নিদ্রাকালে পুনর্জ্জীবিত হইতে থাকে, এই সময় শ্বাস প্রশ্বাস গভীর হয় অর্থাৎ প্রকৃতি দেবী দেহাগ্নির সহিত জীবনরক্ষাকারী অম্লজান যোগ করিয়া দেহকে নিদ্রান্তে পুনর্জ্জীবিত করিবার জন্য অধিক পরিমাণে বিশুদ্ধ বায়ু চাহিতেছে; কিন্তু বিশুদ্ধ বায়ুর পরিবর্ত্তে আপনি যদি কেবল দূষিতবায়ু টানিতে থাকেন তবে প্রকৃতি দেবী কি দিয়া ভগ্নদেহ যোড়া দিবে, কেমন করিয়া দেহ ও মন পুনর্জ্জীবিত হইবে? আহারের সময়েও শ্বাস গভীর হয়, অতএব বিশুদ্ধ বায়ুর চলাচল হয় এমত স্থানে আহার করা কর্ত্তব্য, রান্না ঘরে অথবা রুদ্ধ ঘরে কদাচ আহার করিবেন না। নিদ্রা কালে বিশুদ্ধ বায়ু না পাইলে সমস্ত রোগ হইতে পারে; সর্ব্বাগ্রে হৃদ্‌রোগ ও ফুস্‌ফুসের যাবতীয় রোগ আস্তে আস্তে হইবে, সেই সঙ্গে পরিপাকশক্তি কমিবে, কারণ ফুস্‌ফুসের শক্তি-হীনতার সঙ্গে সঙ্গে অজীর্ণও আসিবে; দুইটি যেন যমজ ভাই।

সমস্ত রাত্রি ঘরে কিরূপ বায়ু ছিল তাহা সহজেই পরীক্ষা করিতে পারেন; অতি প্রত্যুষে বা প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া ঘরের বাহিরে ফাঁকা হাওয়ায় আসিয়া পুনরায় ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিবেন কোন গন্ধ নাকে লাগে কি না; কোন প্রকার গন্ধ বা বিছানার গন্ধ বা ঘরের গন্ধ যদি নাসিকায় অনুভব হয় তবে জানিবেন বিশুদ্ধ বায়ু উপভোগ করেন নাই। পাশ্চাত্য দেশের জনৈক চিকিৎসক কোন জনসমাগম পরিপূর্ণ স্থলে কয়েকটী মাছিকে একটী বোতলের মধ্যে ছাড়িয়া দেন, তন্মধ্যে কয়েক মিনিট ধরিয়া প্রশ্বাসিত বায়ু ত্যাগ করিয়া বোতলের ছিপি বন্ধ করিবা মাত্রই মাছিগুলি মরিয়া যায়। দ্বিতীয় স্থলে একটী গোলাকার প্রশস্ত মুখবিশিষ্ট পাত্রমধ্যে নল দ্বারা প্রশ্বাস ত্যাগ করিতে থাকেন; অল্পক্ষণ পরে একটী বাতি জ্বালিয়া তাহার মধ্যে ধরিবা মাত্রই বাতিটী নিবিয়া যায়। ঘরে দূষিত বায়ু অত্যন্ত অধিক হইলে প্রদীপ যদি কড়ি বরগার কাছে ধরা যায় তবে নিবিয়া যাইবে; বায়ু অল্প দূষিত হইলে শিখাটী কম্পিত হইবে। এতদ্বারা প্রতিপন্ন হয় যে, প্রশ্বাস দূষিত বায়ু কত শত মানবের শরীরে অনমুভূত গুপ্ত রোগের সঞ্চার করিয়া জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাপিত করে। সুতরাং ঘরের বাতাস বাহিরের বাতাসের মত বিশুদ্ধ ও নির্ম্মল হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। ঐটী করিতে হইলে ঘরের দুই দিকের জানালা এরূপ পরিমাণ খোলা রাখিতে হইবে যাহাতে বায়ুরও চলাচল হয় অথচ গায়ে ঠাণ্ডা না লাগে; এই জন্য খড়খড়ে বা পাখিযুক্ত দরজা জানালা অতি উত্তম।

ঘরে যদি সেরূপ জানালা বা দ্বার না থাকে তবে বায়ু যাতায়াতের পথগুলি উন্মুক্ত রাখিয়া নিদ্রা যাইতে হইবে, শীত লাগিলে নাসিকা ও মুখ ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চাদর বা শীতবস্ত্র দিয়া ঢাকিয়া নিদ্রা যাইবেন, তথাপি বিশুদ্ধ বায়ু চাই; কারণ দেহাগ্নি রক্ষা করিতে বিশুদ্ধ বায়ুর অম্লজান একান্ত আবশ্যক, উহা না পাইলে দেহাগ্নি রক্ষিত হইবে না, নানা রোগ হইয়া অকাল মৃত্যু হইবে। মশারির মধ্যে শয়ন করিলে অনেকটা শীত নিবারণ হয়, তদ্ব্যতীত মশারির মধ্যে ম্যালেরিয়ার বিষ প্রবেশ করিতে পারে না। মস্তকটী বাদ দিয়া অথবা রোগ বিশেষে কেবল মাত্র নাক মুখ বাদ দিয়া সমস্ত শরীরে ঢল করিয়া বস্ত্রাবরণ রাখিয়া ঠাণ্ডা ঘরে নিদ্রা গেলেও উপকার।

বিলাতের জনৈক প্রসিদ্ধ ডাক্তার ভয়ানক শীতের সময়েও শীত প্রধান লণ্ডন নগরে গৃহের সমস্ত দ্বার জানালাগুলি খুলিয়া দিতে আদেশ করিতেন। যে সময়ে তাঁহার প্রতিবাসীরা উনানের পার্শ্বে বসিয়া অগ্নি সেবনে তাপ রক্ষা করিতেন, সেই সময়ে ডাক্তার সাহেব কেবল পশমী বস্ত্রে শরীর আবৃত করিয়া উন্মুক্ত স্থানে শুইয়া থাকিতেন। এই কার্য্য অনেকে দুঃসাহসিকতা মনে করিয়া স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তাঁহার বাটী জনতায় পরিপূর্ণ করিয়া তুলিত। সর্দ্দি-লাগা বা অতি কঠিন রোগে শতপ্রকার ঔষধেও ফল দিবে না কিন্তু স্বাভাবিক আহারের সহিত উক্ত প্রকারে নিদ্রা যাওয়া অভ্যাস করিতে পারিলে সকল রোগ ভাল হইবে। একেবারে হঠাৎ ঘরের বাহিরে নিদ্রা যাইবেন

না। নিদ্রাবস্থায় যাহাতে রক্তের চলাচলের কোনরূপ ব্যাঘাত না হয় এবং শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়ার কোন প্রকারে ব্যাঘাত না হয় তজ্জন্য পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া একেবারে সম্পূর্ণরূপ উলঙ্গভাবে শয়ন করিয়া, আবশ্যক মত শীতবস্ত্র ব্যবহার করিবেন।

এক দিন রাত্রি ১০।১১ টার সময় ভাস্করানন্দ স্বামীর সকল শিষ্য একে একে আপনাপন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এক জন শিষ্য যাইতেছে না দেখিয়া স্বামীজি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বাবা, রাত্রি ত অনেক হইয়াছে, তুমিও গৃহে যাও"।

শিষ্য। প্রভো! আমার একটী নিবেদন আছে।

স্বামীজি। কি বল।

শিষ্য। কাশী হেন স্থানের দারুণ শীতে কেমন করিয়া আপনি সমস্ত শরীর অনাবৃত করিয়া থাকেন! আপনার ক্ষমতা অসাধারণ তাই শীতবোধ হয় না!

স্বামীজি। তোমার বদনমণ্ডলে শীতবোধ হইতেছে কি?

শিষ্য। আজ্ঞে না।

স্বামীজি। কেন?

শিষ্য। বদনমণ্ডল সর্ব্বদা অনাবৃত রাখা অভ্যাস হইয়া গিয়াছে, তাই তথায় শীত অনুভব হয় না।

স্বামীজি। বাবা, আমারও সমস্ত দেহ অনাবৃত রাখা অভ্যাস

হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য শীত বোধ হয় না। ইহাতে আশ্চর্য্যের বা অসাধারণত্বের কিছুই নাই; জগতে মনুষ্য এমন কিছুই করিতে পারে না যাহাকে অসাধারণ বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে!

মনে করিবেন না যে আমি আপনাকে গৃহত্যাগী হইতে বলিতেছি। সর্ব্বপ্রকার ক্ষয়রোগে কিরূপ চিকিৎসা হওয়া উচিত তৎসম্বন্ধে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া জনৈক পাশ্চাত্য চিকিৎসক সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি বলিতেছেন যে, ক্ষয়রোগের এক মাত্র ঔষধ সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ু সেবন, মাদকতা এবং দুর্ব্বলতা-জনক সমুদয় কারণ বর্জ্জন, দুগ্ধ ও অনুত্তেজক নিরামিষ আহার এবং অবস্থা বিশেষে বিশেষ বিশেষ ব্যায়াম অবলম্বন। এইরূপ পথ্য করিয়া অত্যন্ত রুগ্ন রোগীও যদি সর্ব্বদা উন্মুক্ত স্থানে থাকে তবুও তাহার কোন রূপ অপকার হইবে না। শরীর আবৃত করিয়া জানালা দরজা খুলিয়া শয়ন করা অসাধ্য মনে না করেন, সেই জন্য উক্ত কথা গুলি বলিলাম। আজ কালকার লোক সকল বিষয়ে উন্নত, শিক্ষিত এবং গণ্যমান্য হইয়াও স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ে কতদূর অজ্ঞ তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত দিই। আমার একটী আত্মীয় শীতকালে মূল্যবান পশমী বস্ত্রাবৃত হইয়া এক দিন ভ্রমণ কালে দেখিলেন যে, তাঁহার একটী বিশেষ পরিচিত লোক ঐ শীতে সামান্য একখানি সুতি বস্ত্রাবৃত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। অত্যাশ্চর্য্য হইয়া আমার আত্মীয়টি সেই লোককে বলিলেন "তুমি এরূপ সহ্য করিতে পার, কারণ, তোমার হয়তো দুটী একটি ছিদ্র আছে, কিন্তু

'আমার মত যাহার শরীরে শত ছিদ্র আছে সে কি করিবে?" অস্বাভাবিক রূপে জীবন যাপন করিলে শরীরে শত ছিদ্র দূর হউক, শত সহস্র ছিদ্র (রোগ) হইবে! আমার আত্মীয়েরও তাই হইয়াছিল; ইহার কারণ পরের উদাহরণ পাঠেই জানিবেন।

আমরা যাহা আহার করি তাহার মলভাগ পুরীষ, মূত্র ও ঘর্ম-রূপে বাহির হইতেছে, এবং অদৃশ্য ভাবে প্রতিক্ষণে প্রতি প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইতেছে। প্রশ্বাসের সহিত যাহা অদৃশ্য ভাবে নির্গত হইতেছে তাহারই পরিমাণ অধিক, কারণ অল্প অল্প করিয়া অনবরত বাহির হইতেছে। শরীরের এই সকল ময়লা দেখিলে স্বভাবতঃই ঘৃণার উদয় হয়। নিজের শরীরের ময়লা দেখিলে যেরূপ ঘৃণা হয় অপরের ময়লা দেখিলে তদপেক্ষা কত বেশী ঘৃণা হয় তাহা প্রত্যেকেই অনুভব করিতে পারেন; সুতরাং নিদ্রাকালে ঘরে দুই চারি জন লোক কিম্বা স্ত্রী, পুত্র, কন্যা থাকিলে তাহাদের শরীরের ময়লা অবাধে নিজের শরীরে প্রবেশ করাইতেছেন কি না তাহা ভাবিয়া দেখুন। অজ্ঞ আত্মহত্যার ন্যায় নিজের দেহকে বিশুদ্ধ বায়ুর অভাবে কত দূর হত্যা করিয়াছেন ও করিতেছেন তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন! আমার একটী আত্মীয়ের ২৪।২৫ বৎসর বয়সের সময় হাঁপানি ও বাত রোগ হয়; অজ্ঞতাবশতঃ আহার আদির অনিয়ম, রাত্রিজাগরণ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, ঘরের দরজা জানালা বন্ধ করিয়া শয়ন এবং রোগের সহজ অবস্থায় উপেক্ষা প্রভৃতি নানা কারণে ব্যারাম হয়,

হঠাৎ কিছুই হয় না। এই সময় হইতে তিনি খুব সাবধান হইলেন অর্থাৎ ঔষধ সেবন পূর্ব্বক চিকিৎসা খুব হইতে লাগিল। রোগের আধিক্যের সময় রাত্রিজাগরণ, পরিশ্রম, অতিভোজন ইত্যাদি কুপথ্য না হওয়ায় ব্যারাম উপসমিত হইত, উপসম হইলে আবার পূর্ব্বের সমস্ত অনিয়মগুলি হইত, অধিকন্তু ঘরের দরজা জানালা খুব করিয়া বন্দ করিয়া,পর্দ্দার দ্বারা ফাক বুঁজাইয়া চিকিৎসকের উপদেশানুসারে শয়ন করিতেন। চিকিৎসকের উপদেশ তিনি আঠার আনা রকম প্রতিপালন করিতেন। ১২ মাস এইরূপ করিয়া কাটাইতেন। রাত্রিতে ও সন্ধ্যার সময় অনেক লোক কার্য্যগতিকে তাঁহার নিকট আসিত, রাত্রি ১১টা ১২টা পর্য্যন্ত লোক জন সহ থাকিতে হইত; অবশেষে তাঁহার চক্ষুরোগ হইল। চিকিৎসক লাগিয়াই আছেন, চিকিৎসকে ও ঔষধে প্রতিবৎসর গড়ে ৫০০ শত টাকা খরচ হইত। চক্ষুরোগে সূর্য্যের আলো হইতে একেবারে বঞ্চিত থাকিতে হইবে এই রূপ উপদিষ্ট হওয়ায় দিবাভাগেও ঘরের দরজা জানালা বন্দ করিয়া থাকিতেন। এরূপ অবস্থাতেও লোকসমাগমের ত্রুটি ছিল না। ভাবুন দেখি আলোক এবং বিশুদ্ধ বায়ু হইতে বঞ্চিত থাকিয়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাবে মানুষ কয়দিন জীবিত থাকিতে পারে? এরূপ শুনিলে কে না নিন্দা করিবেন? অথচ রোগী নিরোগী প্রত্যেকে অল্প-বিস্তর ঐ ভাবেই জীবনযাপন করিতেছেন! মৎস্যকে জল ছাড়া করিলে কতক্ষণ উহা জীবিত থাকিতে পারে? ঐ ভাবে পাঁচ বৎসর থাকার পর হঠাৎ একদিন প্রাতঃকালে

কথা বলিতে বলিতে মৃত্যু হইল। একান্ন বৎসর বয়সে অকালে মরিলেন,মৃত্যুর লক্ষণ কিছুমাত্র হয় নাই,শরীর বেশ শক্ত ও তাজা ছিল! মৃত্যুর পর চিকিৎসকগণ বিশেষরূপে জানিতে পারিলেন যে হৃদ্‌রোগ হইয়াছিল! এতকাল জানিতে পারেন নাই, জানিতে পারিলেও যে কি প্রকার ব্যবস্থা করিতেন তাহাও বুঝিতে পারিতেছেন! এক্ষণে আপনি কি বলিবেন? কপাল দোষে অকাল মৃত্যু হইল, না চিকিৎসার দোষে অকাল মৃত্যু হইল, না, রোগী এবং চিকিৎসক উভয়ের দোষে অকাল মৃত্যু হইল?

রোগীর ঘরে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ বায়ুর চলাচল হয়, অথচ রোগীর বা রোগ পরিচর্য্যাকারীর গাত্রে ঠাণ্ডা না লাগে এই রূপ বন্দোবস্ত সর্ব্বাগ্রে করিবেন। তাহার বিপরীত যদি কোন চিকিৎসক করিতে বলেন, অথবা বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের কম সম্ভাবনা দেখিয়াও যে চিকিৎসক তাহার সুবন্দবস্ত সর্ব্বাগ্রে না করেন, তাঁহাকে বাটীর সীমানায় আসিতে দিবেন না। শীতকালে ঘরের দরজা বন্দ করিয়া ৫।৭ জন বা ১০।১২ জন বন্ধু বান্ধবে অথবা স্ত্রীপুরুষে মিলিত হইয়া গল্প গুজব বা গান বাজনা করিয়া থাকেন, কিন্তু বিশুদ্ধ বায়ু সেবন হইতেছে কি না সে দিকে কয় জন লক্ষ্য করেন? থিয়েটার শুনিতে গিয়া অথবা চারি দিক্‌ আঁটা বাড়ীতে বক্তৃতা বা যাত্রা শুনিতে গিয়া বিশুদ্ধ বায়ুসেবন হয় কি? সন্তান সমস্তরাত্রি আলো জালিয়া দরজা বন্দ করিয়া পাঠাদি কোন কার্য্য করিতেছে, সে

অবস্থায় কি পরিমাণ অপকার হইতেছে, তাহা কেহ দেখেন কি? যদি আপনাকে ও আপনার আত্মীয় স্বজনকে স্বাস্থ্যপথে চালাইতে ইচ্ছা করেন, যদি দীর্ঘ-জীবন-লাভের আশা থাকে তবে এখন হইতেই সাবধান হইবেন! শয়নের ঘর এবং অন্যান্য ঘর সর্ব্বদা যাহাতে বিশুদ্ধ বায়ু পরিপূর্ণ থাকে সে দিকে খরতর দৃষ্টি রাখিবেন; এবং অপরের শরীর হইতে নির্গত ময়লা নিজের নাসিকায় প্রবেশ না করে সে দিকেও বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন! বাটীর চারি দিকে জঙ্গল এবং ময়লা না থাকে তাহা করিবেন। প্রাণীজগৎ ক্রমাগত অম্লজান টানিয়া লইয়া প্রাণে বাঁচিয়া আছে এবং ক্রমাগত বিষাক্ত গ্যাস ত্যাগ করিতেছে। এই গ্যাস্ বায়ুতে মিসিয়া যাইতেছে, কিন্তু পরমেশ্বরের এমনি বিধান যে, উদ্ভিদ্ জগতের প্রাণ রক্ষার জন্য ঐ গ্যাসই আবশ্যক! উদ্ভিদ্ জগত ঐ গ্যাস টানিয়া লইতেছে এবং অম্লজান ত্যাগ করিতেছে। সর্ব্বদা বায়ুর চলাচল হওয়ায় সমস্ত বায়ু প্রকৃতি অনুযায়ী হইয়া সকল দিক রক্ষা করিতেছে। বাটীর সংলগ্ন চারিদিকে গাছ পালা ও জঙ্গল থাকিলে বিষাক্ত গ্যাস নিশ্বাসের সহিত শরীরের ভিতর যাইতে পারে; সেই জন্য জঙ্গলে ভ্রমণ করা ভাল নহে; এবং বসতবাটীর ২০০ শত হাত সিমানার মধ্যে গাছ পালা অথবা জঙ্গল থাকাও ভাল নহে। বাটীর অতি নিকটে বা বাটীর প্রাঙ্গণে গাছ।পালা ও বৃক্ষাদি থাকিলে সর্প বৃশ্চিক প্রভৃতি হিংস্রক প্রাণী হইতে প্রাণ নাশ হইতে পারে, তজ্জন্য বাটীর চতুর্দ্দিক ও বাটীর

প্রাঙ্গণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা উচিৎ, এ কথাটী আমাদের মহাভারতেও আছে।

১৮। শ্বাস প্রশ্বাস।

কি রূপে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া করা উচিত এই কথাটী একটী বাজে কথা বলিয়া উড়াইয়া দিবেন না; সভ্য জগতে এই কথা লইয়া মহা আন্দোলন হইতেছে। তাঁহারা বলেন, শতকরা একজনও ঠিক মত শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া করেন না। বিশেষতঃ স্ত্রীলোকগণ ত এ বিষয়ে আরও অজ্ঞ। তাঁহারা ক্ষীণমধ্যা হইবার জন্ত এবং যাহাতে সমস্ত দেহে রূপের ছটা প্রকাশিত হয় তজ্জন্ত কাপড় খুব কসিয়া পরেন, অর্থাৎ কটীদেশ, গলদেশ ও পঞ্জর বন্ধনভাবে রাখেন; আমাদের দেশের স্ত্রীলোক এবং অনেক পুরুষ ও পশ্চিম দেশীয়রাও খুব কসিয়া বস্ত্র পরিধান করে। তাহাতে শ্বাস প্রশ্বাসের সমুদয় যন্ত্রটী কসিয়া থাকে, পাঁজ্‌রা বিশ্রী হয়, তলপেটের শিরা ও মাংসপেশী সকল স্বাভাবিক অবস্থায় না থাকিয়া জড়সড় হইয়া থাকে। গলা টিপিয়া ধরিলে নিশ্বাস লইতে যেরূপ কষ্ট হয় শ্বাস যন্ত্রের অন্যান্য স্থান টিপিয়া বা বস্ত্রাদি দ্বারা কসিয়া রাখিলে সেরূপ কষ্ট বোধ হয় না, সুতরাং শ্বাস প্রশ্বাস ভাল রূপ হইতেছে না সে দিকে লক্ষ্য হয় না; কিন্তু কুফল হাতে হাতে হইতে থাকে। রক্ত যত পরিমাণ

বিশুদ্ধ হওয়া দরকার উক্ত কুঅভ্যাসের দোষে ততটা হয় না; তাহা না হইলে ক্রমে শরীর খারাপ হয় ও রোগ দেখা দেয়। অনিদ্রা, রক্তহীনতা, অজীর্ণ, কোষ্ঠবদ্ধ এবং আরও কতশত রোগ দেখা দেয়। ঔষধের বিজ্ঞাপন দেখিতে দেখিতে যে বিজ্ঞাপনে মন আকৃষ্ট হয় তল্লিখিত ঔষধ সেবন আরম্ভ করেন। বিজ্ঞাপনে তিন টাকায় ১ সের চ্যবনপ্রাশ দেখিলে বা সাপ্তাহিক ঔষধের মূল্য ।০ চারি আনা দেখিলে কাহার না মন আকৃষ্ট হয়? কিন্তু টাকায় তিন সের ঘৃ বিনা মূল্যে ঔষধ পাইলেও তাহা সেবন করা উচিত কি না, অথবা আপনি উহা সেবন করিবার উপযুক্ত পাত্র কি না তাহা কে বিচার করে! এ সকল কথা শেষে চিকিৎসা সঙ্কটের কথায় বলিব।

এই রূপে একটী করিয়া শরীরের উপরে অনেক ঔষধের গুলি মারিতে মারিতে অর্থাৎ যাবতীয় ঔষধের পরীক্ষা করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া বলেন, "তাই ত, এখন উপায়! ভাঙ্গা শরীর যে কিছুতেই যোড়া লাগে না"!

যদি ভাঙ্গা শরীর যোড়া দিতে ইচ্ছা করেন, তবে যে নিশ্বাসটী টানিয়া লন, তাহাকে দীর্ঘ করিতে অর্থাৎ দীর্ঘকাল রাখিতে চেষ্টা করুন। দীর্ঘ নিশ্বাস লওয়া রোগীকে নিরোগী করে এবং সুস্থ দেহীকেও ভাল রাখে। এই প্রক্রিয়া এরূপ ভাবে করিতে হইবে যেন শ্বাস প্রশ্বাসের শব্দ বিশেষরূপ শ্রুতিগোচর না হয়। প্রত্যেক নিশ্বাসের সহিত বায়ুর অম্লজান ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করে, সেই অম্লজান যোগে অপরিষ্কৃত রক্ত পরিষ্কৃত হইয়া যায়

এবং অপরিষ্কৃত অংশ প্রশ্বাসের সহিত বাহির হইয়া যাইতেছে। সুতরাং নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া যত বেশী দীর্ঘ সময় ধারণ করিয়া রাখিতে পারিবেন ততই বেশী অম্লজান ফুস্‌ফুসে প্রবেশ করিবে এবং ততই রক্ত সমধিক পরিষ্কৃত হইবে ; রক্তপরিষ্কার যত বেশী হইবে তত ফুস্‌ফুসের বায়ু টানার ক্ষমতা বাড়িবে এবং হৃদ্‌পিণ্ড ও সমুদয় হৃদ্‌যন্ত্র সবল হইয়া পাকস্থলী, যকৃৎ, প্লীহা, অন্ত্র ও মূত্র যন্ত্রকে ক্ষমতাশালী করিবে। দীর্ঘ নিশ্বাস লওয়ার ফলে আপনার দেহে বল বাড়িবে, চেহারা ও অবয়বের পরিবর্ত্তন হইবে ; ত্বগেন্দ্রিয় পরিষ্কার ও লাল আভাযুক্ত হইবে ; স্বরের মধুরতা হইবে। শরীর রক্ষার এমন সব উপায় থাকিতে কি না ছাই ভস্ম কিনিয়া খাইতেছেন ? বিষ খাইয়া মৃত্যুর পথ সোজা করিয়া লইতেছেন ?

দাঁড়াইয়া, বসিয়া, চিত্‌ হইয়া শুইয়া অর্থাৎ যে কোন সহজ অবস্থায় থাকিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস লইবেন। এই প্রক্রিয়ার সময় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ আল্‌গা ও শিথিল ভাবে রাখিতে হইবে, মেরুদণ্ড সোজা করিয়া রাখিতে হইবে এবং সমুদয় পরিধেয় বস্ত্র ঢল রাখিতে হইবে। পরিধেয় বস্ত্র সর্ব্বদা ঢল থাকে তৎপ্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখিবেন। সোজা হইয়া দাঁড়াইয়া, বুক সটান ও উন্নত করিয়া এবং স্কন্ধদ্বয় পশ্চাৎ দিকে টানিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস লওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম। এইরূপে দাঁড়াইয়া একটী পূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস লইবার পর তলপেট হইতে কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত স্ফীত হইলে অল্পক্ষণ ধরিয়া রাখিয়া আস্তে আস্তে

সেই দমটীকে ত্যাগ করিবেন। সাবধান দমটী যেন তাড়াতাড়ি বা জোরের সহিত বাহির না করেন। এই ব্যায়ামটী ফাঁকা হাওয়াতে প্রত্যূষে এবং নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ৫।১০।১৫ মিনিট কাল পর্য্যন্ত অভ্যাস করিবেন। অতিশয় দুর্ব্বল ও পীড়িত ব্যক্তি যখন দুই চারিবার পূর্ণ দীর্ঘনিশ্বাস লওয়ার পর কষ্ট অনুভব করিবেন, তখন ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া আবার আরম্ভ করিবেন। অধ্যবসায়ের সহিত উহাতে লাগিয়া থাকা চাই; এক বার সুফল লাভ করিলে উহাকে আর ত্যাগ করিতে ইচ্ছা হইবে। পরিশ্রমের প্রসঙ্গে যে কয়েকটী ব্যায়াম নির্দ্দেশ করিয়াছি তাহার প্রথমটী পাঠ করুন এবং তদনুসারে অভ্যাস করিতে করিতে যখন ক্রিয়াটী অভ্যস্ত হইবে তখন দীর্ঘ নিশ্বাসটী টানিয়া ২।১ সেকেণ্ড কাল ধরিয়া রাখিবেন, তারপর আস্তে আস্তে ত্যাগ করিবেন। অভ্যাসের সঙ্গে সঙ্গে ৪।৫ সেকেণ্ড ধরিয়া রাখিতেও কষ্ট হইবে না এবং অবশেষে ঐ দম দুই এক মিনিট পর্য্যন্তও রাখিতে পারিবেন। প্রথম প্রথম তাড়াতাড়ি করিয়া অধিক সময় পর্য্যন্ত দম ধরিতে চেষ্টা করিলে কষ্ট হইবে এবং তাহা সহ্য করিতে পারিবেন না, বিপরীত ফল হইবে।

এই রূপে দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে শিখিলে উহা ঠিক প্রকৃতি অনুযায়ী হইবে; তখন উহার সুফল সপ্তাহকাল মধ্যেই অনুভব করিবেন, তখন আর উহাকে ছাড়িতে পারিবেন না, প্রকৃতিগত হইয়া যাইবে। জাপান দেশের স্ত্রীলোকগণ ফাঁকা হাওয়াতে খুব দীর্ঘ নিশ্বাস লইয়া থাকে। জীবন ধারণ ও দেহকে সুস্থ রাখিবার

জন্য পূর্ণ দীর্ঘ নিশ্বাস লওয়া তাহাদের মতে নিতান্ত আবশ্যক; উহার আবশ্যকতা তাহারা খাদ্যের আবশ্যকতা অপেক্ষাও অধিক মনে করে।

৯।২০। রোগ-তত্ত্ব।

কি করিলে শরীর প্রকৃতভাবাপন্ন হয় এতক্ষণ সেই সকল কথা বলিলাম এবং পরেও বলিব। প্রকৃত ভাবের বিপরীতকে রোগ বলে। রোগ দেখা দিবার পূর্ব্বে শরীর বিকৃতভাবাপন্ন হয়। এই বিকৃত ভাবের কথা উপদেশের স্থানে স্থানে বলা হইয়াছে। বলিয়াছি, প্রকৃত ভাবের বা স্বাভাবিক অবস্থার একটু ব্যতীক্রম হইলেই জানিতে হইবে যে, রোগ হইয়াছে বা রোগের সঞ্চার ভিতরে ভিতরে হইতেছে। কিরূপে রোগের সঞ্চার হয় অর্থাৎ রোগের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটী কথা এস্থলে বলা আবশ্যক।

অকাতরে ও বিনা কষ্টে যখন দেহ কলটী চলিতে থাকে তখন বলিতে পারি "দেহটী বেশ সুস্থ বা প্রকৃতিস্থ আছে"। পরিশ্রমের পর স্বভাবতঃই শ্রান্তি বোধ হয়; উহা অপনোদনের চেষ্টাই নিদ্রা যাইবার স্বাভাবিক ইচ্ছা। সুস্থ দেহীর পক্ষে পরিশ্রম ও নিদ্রা উভয়ই তুল্য সুখপ্রদ।

শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সকল আপনা আপনি চলে, সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাহারা স্ব স্ব কার্য্য করিতেছে, আমাদের ইচ্ছার অধীন নয়। সম্পূর্ণ স্বাধীন ভাবে তাহারা চলিতেছে এবং জানিতেও দিতেছে না কেমন ভাবে চলিতেছে। যখন জানায় তখন বলে "এই দেখ আমাদের কষ্ট"! চক্ষু বলে, "এই দেখ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে আমার কত কষ্ট হইতেছে"! উদ্‌গ্রীব হইয়া অতি কষ্টে কোন বাক্য কাহাকে শুনাইতে হইতেছে, চিন্তা করিতে মস্তক ঘুরিয়া উঠিতেছে, কার্য্য করিবার জন্য হস্ত পদাদি কষ্টের সহিত উঠাইতে হইতেছে। খাইয়া হজম করিতে কষ্ট, মলত্যাগ করিতে কষ্ট, শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া করিতে কষ্ট! যখন আমাদের অনুভূতি হয় যে, ইন্দ্রিয় সকল অথবা অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সকল বা কোন ইন্দ্রিয় বা কোন যন্ত্রকে কষ্টের সহিত কার্য্য করিতে হইতেছে তখন তখনই জানা উচিত যে, শরীর বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়াছে এবং যন্ত্র গুলির মধ্যে কোন একটা গোলমাল হইয়াছে বা আঘাত লাগিয়াছে। আহারের পর যদি তৃপ্তি বা পরিতোষ না হইয়া কোন একটু অসুখ বোধ হয় তবে জানিতে হইবে, পাকস্থলীর মধ্যে একটা গোলমাল হইয়াছে কিম্বা অন্যায় রকম অথবা অস্বাভাবিক দ্রব্য ভোজন হইয়াছে। সমস্ত দেহটা ঠিক একটা কল; এই কলের প্রত্যেক অংশ স্ব স্ব কার্য্য সুচারু রূপে করিবে, না করিলে গোটা কলটাই বিগড়াইয়াছে জানিতে হইবে। একটা অংশ কার্য্য করিতে অপটু হইলে অন্যান্য অংশগুলিও সেই সঙ্গে অল্প বিস্তর অপটু হইবে; যেমন কোন একটি গৃহে এক জনের

রোগ হইলে পরিবারস্থ সকলকেই তাহার ফলভোগ করিতে হয় অর্থাৎ রোগীর জন্য ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় তাহাদের স্ব স্ব কার্য্যের অল্প বিস্তর ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকেই, সুতরাং গৃহকার্য্য সুচারু রূপে হয় না। সকলেই জানেন, হাতে ঘা হইলে বা চোট লাগিলে কাজ করিতে পারা যায় না, কিন্তু সেই সঙ্গে মনের ভিতরে একটা বেদনা অনুভব হয় এবং খাইতেও অনিচ্ছা হয়। শরীরের কোন স্থানে আঘাত লাগিলে অথবা ক্ষত হইলে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত ক্ষুধা বোধও হয় না। শরীরের প্রত্যেক অংশ শিরাযোগে সম্বদ্ধ আছে বলিয়া ঐ রূপ হয়। সুতরাং যে কোন অংশের যে কোন বিপর্য্যয়ই ঘটুক না কেন, তাহার ফলে গোটা দেহটাই অসুস্থ হইবে; সেইরূপ গোটা দেহটাকেও সুস্থ বলা যাইতে পারে যখন বুঝিব প্রত্যেক অংশ বেশ সচ্ছন্দে ও সুচারু রূপে চলিতেছে।

দেহের গঠন ও পুষ্টিসাধন যে দুইটী যন্ত্রের সাহায্যে হয় সেই দুইটী যন্ত্রই সর্ব্ব প্রধান। সেই দুইটীর একটীর নাম শ্বাস যন্ত্র এবং আর একটীর নাম পরিপাক যন্ত্র। এই দুইটীর যে কোন একটীকে অবলম্বন করিয়া শরীরে রোগ প্রবেশ করে; অতএব ঐ দুইটী যন্ত্রের প্রতি বিশেষ রূপে লক্ষ্য রাখা সকলেরই কর্ত্তব্য।

পরিপাক শক্তি খুব ভাল এই রূপ লোকের সংখ্যা অতি বিরল এবং এই শ্রেণীর লোকই নিরাময় হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া থাকে। সাধারণ লোকের অকাল মৃত্যুর কারণ পরিপাক যন্ত্রের

উপর অত্যন্ত দুর্ব্যবহার; আজন্ম ঐ দুর্ব্যবহারের ফলে সর্ব্ব প্রথমে পেট ভার, পেট ফুলা, বমি, বদ হজম এই সকল উপসর্গ দেখা যায়; এতদ্ অপেক্ষাও সামান্য উপসর্গ অর্থাৎ রোগের অঙ্কুর অবস্থা স্বাভাবিক দাস্তের সহিত একটু অস্বাভাবিক দাস্তে বিশেষ রূপে লক্ষিত হয়। যাঁহারা যাপ্যরোগে অর্থাৎ হাঁপানি, অর্শ, ম্যালেরিয়া, সঞ্চিত আমাশয় বা কঠিণ অজীর্ণ রোগে ভুগিতেছেন তাঁহাদের দাস্ত কখনই স্বাভাবিক হয় না। তথাপি তাঁহারা রোগের কষ্টদায়ক উপসর্গ হইতে যে দিন মুক্ত থাকেন সে দিন তাঁহাদের খুব ভালই গেল এইরূপ মনে করেন। আবার এমন অনেক রোগী আছেন যাঁহাদের স্বাভাবিক দাস্তের সহিত একটু অস্বাভাবিক দাস্তও হইয়া থাকে, তাহাতে শারীরিক স্বচ্ছন্দতার কোন ব্যাঘাত হয় না; মধ্যে মধ্যে ঐ রূপ হওয়া সত্ত্বেও নিজেদেরকে সুস্থই মনে করিয়া থাকেন। স্বাভাবিক দাস্তের যে সকল লক্ষণ পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি তাহার একটু ব্যতীক্রম হইলেই জানিতে হইবে যে রোগ অঙ্কুরিত হইতেছে। কিন্তু রোগের এই অঙ্কুরিত অবস্থা কেহই গ্রাহ্য করে না। উক্ত উপসর্গের কারণ অস্বাভাবিক আহার বিহার, মৎস্য মাংস ও আজীবন ঝাল মসলা যোগ করিয়া খাদ্য দ্রব্য ভোজন অথবা মাদকদ্রব্য সেবন। সে কালের "সাদাসিদা" খাওয়া এখন উঠিয়া গিয়াছে। সেকালের লোক বৃথা মাংস খাইতেন না, ধর্ম্ম নিষিদ্ধ আহারাদি করিতেন না, জীবনের শেষভাগে আতপ অন্ন ও নিরামিষ আহার ধর্ম্মের একটা প্রধান অঙ্গ মনে করিতেন এবং তাহা পালনও করিতেন। সে রকম

Estd.-1819.

লোক বাল্যকালে দুই চারিটী দেখিয়াছি, এখন আর দেখিতে পাই না। আজ কাল আহারের প্রত্যেক গ্রাস দস্তুর মত মুখ-রোচক না হইলেই নয়; তাহাতে পরিপাক যন্ত্রের খাটুনি অত্যন্ত অধিক হয় সুতরাং উহা শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। কিন্তু মানুষ বড়ই চতুর, বুদ্ধি বলে এমন খাদ্য প্রস্তুত করিয়াছে যাহা আহার করিবা মাত্রই হজম হইয়া যায়। এ সকল কৃত্রিম খাদ্য খাইলে পরিপাক যন্ত্রের কার্য্য অত্যন্ত কম হয়। এক দিকে যেমন অতিরিক্ত কাজ তেমনি আর দিকে অতি কম কাজ। যে দিকেই যান "মুনিষ-খাম" হইতেই হইবে অর্থাৎ পাকস্থলি এইরূপে দুর্ব্বল হয়। এই দুর্ব্বলতা বা রোগ এত আস্তে আস্তে আইসে যে উহা স্বভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। প্রত্যেকেই ঐটিকে স্ব-প্রকৃতিগত করিয়া ফেলেন, অভ্যাস হইয়া যায়। যাহা প্রকৃত পক্ষে স্বাভাবিক নয় তাহাকে স্বাভাবিক মনে করাই ভুল এবং এই জ্ঞানেই যত বিপৎ পাতের মূল থাকিয়া গেল। মদ বা কোন প্রকার নেশা পান করার পরেই যদি রোগ দেখা দিত, কতকগুলা ঝাল বা মসলা খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই যদি পেটের ব্যারাম হইত তবে বড়ই উপকার হইত। কারণ ও কার্য্য একত্র দেখিতে পাইলে মানুষ কারণকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করিত। আগুণে হাত দিলে হাত পোড়ে বলিয়া আগুণে হাত দেয় না, কিন্তু অগ্নিবৎ কত প্রকার বিষ যে পেটে পুরিতেছে তাহার ইয়ত্তাই করা যায় না, ঝাল, মসলা, মৎস্য, মাংস বা মদ্য প্রভৃতি প্রকৃতি বিরুদ্ধ দ্রব্য আহার করিলে তাহার কুফল স্বরূপ দেহে একটা বিপরীত

ভাবের উদয় হইয়া থাকে; একটু লক্ষ্য করিলে প্রত্যেকেই ঐ বিপরীত ভাবটী অনুভব করিতে পারেন। এবং অনেকে অনুভব করিয়াও উহাকে সামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিয়া থাকেন। ঝাল,মসলা প্রভৃতি দ্রব্যের অস্বাভাবিকত্ব রসনার ও চক্ষুর বৈলক্ষণ্য ভাবে, অর্থাৎ ঐ সকল দ্রব্য আহার করিবা মাত্র চোখের জলে এবং মুখের জ্বালায়, বিশেষ রূপে লক্ষিত হইয়া থাকে। অন্যান্য দ্রব্যের অস্বাভাবিকত্ব আহারের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষিত না হইয়া খাওয়ার একটু পরে লক্ষিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ পরিপাক ক্রিয়ার বৈপরীত্যে বা বৈলক্ষণ্য ভাবে তাহা জানা যায়।

পরিপাক যন্ত্র আবার অনেক স্থলে শৈশব কাল হইতেই খারাপ হইয়া যায়,কারণ,মাতৃদুগ্ধ অভাবে অনেক প্রকার শিশুর খাদ্য আজ কাল ব্যবহৃত হয়, সে সকল খাদ্য পেটে পড়িলে পাক-যন্ত্রের ক্রিয়া অতি কম হয়। কম পরিমাণ কাজ করিতে করিতে অল্প বয়সেই "মুনিষ খাম" হইয়া যায়। অতিরিক্ত খাদ্য ত প্রায়ই দেওয়া হয়, সে সব কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। আবার অনেক শিশু রোগাক্রান্ত হইয়া জন্ম গ্রহণ করে। কারণ, পিতা মাতা রোগা হইলে, অথবা তাঁহাদের কোন রোগ থাকিলে তাঁহাদের সন্তানও রোগগ্রস্থ হইয়া জন্মিবে। খারাপ গাছে খারাপ ফল ব্যতীত সুফল হইতে পারে না। এ বড়ই শোচনীয় অবস্থা, কিন্তু তবুও উপায় আছে। এক্ষণে রোগের উৎপত্তির কথা অর্থাৎ অঙ্কুরিত অবস্থা হইতে ক্রমে ক্রমে রোগ কিরূপে বিকশিত অবস্থায় পরিণত হয় সেই কথা বলা যাউক।

প্রকৃতি বিরুদ্ধ দ্রব্য উদরে প্রবেশ করাইলে শরীর সে সকল দ্রব্যকে বাহির করিবার চেষ্টা করে। যাঁহারা নেশা পান করেন তাঁহারা প্রথম যে দিন তামাকে টান্ দিয়াছেন অথবা মদ খাইয়াছেন সেই দিনের কথা মনে করুন, সে দিন নেশা পানের সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়াছে, গা বমি বমি করিয়াছে, হয়তো বমি হইয়াছে। জীবনীশক্তির সতেজ অবস্থা এইরূপে প্রকাশিত হয়। কিন্তু নেশাটী অভ্যস্ত হইয়া গেলে জীবনীশক্তি দুর্ব্বল হইল জানিতে হইবে; কারণ, পানের সঙ্গে সঙ্গে আর বিষকে বাহির করিতে পারে না। সেইরূপ কোন অস্বাভাবিক খাদ্য পেটে গেলেই পাকস্থলী বলে "এ আমার শত্রু কোথা হইতে আসিল"? অমনি তাহাকে যত শীঘ্র পারে বাহির করিতে চেষ্টা করে, বমি করিয়াই হউক, বা দাস্ত করিয়াই হউক অথবা যে কোন রকম করিয়াই হউক। যদি তৎক্ষণাৎ বাহির করিতে না পারে তবে পাকস্থলীমধ্যে ঐ অস্বাভাবিক দ্রব্য কিছুক্ষণ থাকে; স্বাভাবিক খাদ্য বা প্রকৃতিঅনুযায়ী খাদ্য যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ থাকিতে পারে না; অসময়ে অস্বাভাবিক অবস্থায় বাহির হইয়া যাইবে যেমন জোলাপ খাইলে হইয়া থাকে। সেই সঙ্গে প্রকৃতি অনুযায়ী ভুক্ত খাদ্যকেও পাকস্থলী হইতে নির্গত করিয়া দিবে, উহা সম্যক্ জীর্ণ না হইয়াই মলবাহিনী নাড়ীতে আসিয়া পড়িবে; ঐটীও তদবস্থায় আর ভালরূপে পরিপাক না হইতে পাইয়া তখন অস্বাভাবিক ও প্রকৃতি বিরুদ্ধ একটা জিনিশ হয়। এই সকল অস্বাভাবিক পদার্থ শরীরের ছিদ্র দিয়াই বাহির হইতে

থাকে; ষোল আনা রকম যদি নির্গত না হয়, তবে কতক অংশ রক্তের সহিত মিশ্রিত হয়, কিন্তু মিশ্রিত হইলেও উহা অধিক কালযাবৎ ধরিয়া শরীরের মধ্যে থাকিতে পারে না, কারণ, রক্ত সে সময় সতেজ থাকে বলিয়া উহাকে বাহির করিয়া দেয়। সুতরাং অস্বাভাবিক আহার এক আদ্ বার করিলে তত বেশি ক্ষতি হয় না। এক আদ বার পা পিছ্‌লাইয়া পড়িলে তত লাগে না। কিন্তু এক আদ্‌বার ত হয় না, বারে বারেই হইতে থাকে, এমন কি প্রত্যহই প্রকৃতি বিরুদ্ধ পান ও ভোজন হইতে থাকে। প্রত্যহ অন্যায় আচরণ হইলে পাকযন্ত্র ও দেহের ছিদ্র সকল স্ব স্ব কার্য্যে ক্রমেই অপটু হইতে থাকে। সুতরাং ঐ অস্বাভাবিক পদার্থ দেহ মধ্যে অল্প অল্প করিয়া সঞ্চিত হয়। এ সময়েও শরীরের তত কষ্ট হয় না। ঐ প্রকৃতি বিরুদ্ধ পদার্থ, যাহাকে পূর্ব্বে সঞ্চিত বিষ বলিয়াছি, সর্ব্ব প্রথমে তলপেটে জমিতে আরম্ভ হয়। জীবনীশক্তি যতদূর পারিতেছে উক্ত পদার্থকে বাহির করিতেছে কিন্তু যাহা পারিতেছে না তাহা পেটের যে কোন অংশে বিশেষতঃ তথাকার যে যন্ত্রটী সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে তাহারই আশ্রয়ে থাকিয়া যাইতেছে। ইহার উপর অল্পে অল্পে নিত্যই নূতন যোগ হইতেছে, জমিতে জমিতে অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়া ঐ পদার্থ অন্যাকার ধারণ করে; পচিতে থাকে, দুর্গন্ধময় হয়, শেষে উহা মাতিয়া উঠে। মাতিয়া উঠিলেই বিষবৎ একটা গ্যাস সমস্ত শরীরে প্রবাহিত হয়। শরীরের মধ্যে এই অস্বাভাবিক বা বিপরীত পদার্থের অস্তিত্বই

হইল রোগ এবং ইহাই হইল রোগের অঙ্কুর অবস্থা। এবং ঐ পদার্থ অত্যন্ত অধিক সঞ্চিত হইলে শরীর জ্বর জ্বর করে, গা ভার ভার বোধ হয়, নানা প্রকার অসুখ এই সময় হয়। উক্ত বিষকে জীবনীশক্তি বাহির করিয়া দিবার চেষ্টা করিতেছে কিন্তু শক্তিহীন হওয়ায় উহা শরীরের মধ্যেই প্রবাহিত হইতেছে। জীবনীশক্তি উহাকে বাহির করিবার জন্য নানা মতে চেষ্টা করিতেছে; তাহাতে ব্রণ ফোড়াদি সামান্য উপসর্গ হইতেছে, হাত পা ঘামিতেছে; সে সকল এবং করতল ও পদতল ঘর্ম্মযুক্ত থাকা রোগের চিহ্ন, কিন্তু ঔষধ দ্বারা এই সব চিহ্ন বা উপসর্গকে চাপিয়া রাখিলে ভিতরের বিষ আরও ভিতরে থাকিয়া যায়। বাহির হইবার জন্য শরীরের অগ্রভাগে অর্থাৎ ছিদ্র সকলের মুখের কাছে আসিয়াছিল, কিন্তু ঔষধের তাড়া খাইয়া, বা স্নান করায় ঠাণ্ডা পাইয়া অথবা কোন প্রকার প্রকৃতি বিরুদ্ধাচরণ হইলেই অথবা মনের অত্যন্ত চঞ্চলতা বা ক্রোধ বা মানসিক বিকৃতি অত্যন্ত হইলেই সেই বিষ পুনরায় ফিরিয়া ভিতরের দিকে যাইতে থাকে। যাইতে যাইতে শরীরের যে কোন গ্রন্থির কাছে আসিয়া বাধা পায় তাহাতে গ্রন্থি ফুলিয়া উঠে বা বেদনাযুক্ত হয়। কথায় বলে "গেঁটে ব্যথা হইয়াছে" অথবা "গাঁইট একটু ফুলিয়াছে"। শরীরের যে অংশে প্রকৃতি বিরুদ্ধ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া থাকিবে সে সকল অংশ ভাল চলিবে না। স্পর্শ করিলে শীতল বোধ হইবে; এই শীতবোধটী করতলে ও পদতলে জ্বর হইবার পূর্ব্বে বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিতে পারা যায়। রক্তের প্রবাহ তখন ভাল রূপ হইবে না; তাহা না হইলে শরীর

পুষ্ট হইবে না। যদি উক্ত বিপরীত পদার্থ উপেক্ষিত হইয়া অত্যন্ত অধিক জন্মে অর্থাৎ দাক্তের ও স্বাস্থ্যের আদেশ না শুনিয়া ইচ্ছা মত বা অন্ধবৎ চলিয়া উক্ত বিষকে অতিরিক্ত রূপে সঞ্চিত হইতে দিলে উহা কষ্টদায়ক রোগে পরিণত হইয়া প্রকাশ পায়।

যিনি বিশেষরূপ বুঝিবেন যে, রোগের কারণ কত ভিতরে এবং তাহার কার্য্য কত উপরে, তিনি কখনই ভিতরের কারণ গুলি উপেক্ষা করিয়া বাহিরের উপসর্গগুলির উপর চিকিৎসা করিবেন না।

স্বাভাবিক নিয়মে থাকিয়া যদি মল মূত্র ও ঘর্ম্ম রূপে উক্ত বিষকে বাহির করিতে পারা যায় তবে রোগ আপনিই পলায়। কিন্তু জবরদস্তি করিয়া ঔষধ দিয়া তাড়াতাড়ী চাপিতে গেলেই ভিতরের বিষ ভিতরে থাকিয়া শরীরকে আরও জর্জ্জরিত করিবে এবং নানা প্রকার রোগের মূর্ত্তি ধারণ করিবে। শুনিয়া থাকিবেন, কেহ হয় ত বলিয়াছেন যে, তাঁহার সেই যে এক বার খুব জ্বর হইয়াছিল, সেই জ্বর হওয়ার পর হইতেই শরীর খুব ভাল আছে। এবং অপর আর একজন হয় ত বলেন "জ্বরের জের আর মিটিতেছে না"। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে প্রথম জনের দেহের মধ্যস্থিত সঞ্চিত বিষ খুব জ্বর হইয়া একেবারে বাহির হইয়া গিয়াছে; দ্বিতীয় জনের বাহির হয় নাই। এই সঞ্চিত বিষের অর্থাৎ রোগের আদি উৎপত্তি স্থান হইল পেট, কারণ হইল প্রকৃতি বিরুদ্ধ আহার, বিহার ও আচরণ। পরিপাকশক্তি এবং

জীবনীশক্তি অতিরিক্ত পরিশ্রমে দুর্ব্বল হইলে বিষ সঞ্চিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা অনুসারে নানা প্রকার উপসর্গ রূপে দেখা দেয় ; এক একটী উপসর্গ এক একটী নূতন রোগ বলিয়া পরিগণিত হয়, যেমন এক বাষ্পীয় পদার্থ হইতে অবস্থার বিভিন্নতা অনুসারে মেঘ, বৃষ্টি, বরফ, শিলা, শিশির এবং কুয়াসার উৎপত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু সকল রোগের মূল কারণ এক। অর্থাৎ শীত এবং উষ্ণের অসামঞ্জস্য হেতু পরিপাক শক্তির হীনতা ; সুতরাং চিকিৎসাও এক, অর্থাৎ যে যে কারণে পরিপাক শক্তি হীন হইয়া পড়িয়াছে সেই কারণ গুলিকে শরীরে প্রবেশ না করিতে দিয়া চিকিৎসা করাই সম্যক্ যুক্তিযুক্ত। যে রোগই হউক না কেন এবং যত দিনের পুরাতন ও কঠিন রোগই হউক না কেন, প্রাকৃতিক নিয়মে চিকিৎসা করিলে কোন বিপদের আশঙ্কা থাকে না ; এবং তাহাতে বিনা ব্যয়ে, বিনা যাতনায় এবং অল্প সময়ে রোগটী নির্দ্দোষ রূপে সারিয়া যায়। ঔষধ প্রয়োগে সমূহ বিপদ তাহা পরে ক্রমশঃ বলিব এবং স্বাভাবিক আহারাদির সহিত ভাপড়া ও তলপেট ধৌত করণে শরীরস্থ ধাতুর সমতা হইয়া কিরূপে শীত ও উষ্ণের সামঞ্জস্য ভাব হয় তাহাও শেষে চিকিৎসার কথা বলিবার সময় বলিব।

শিশু দিগের শরীর খুব সতেজ থাকে বলিয়া উক্ত বিষকে দস্তুর মত বাহির করিতে সক্ষম হয় ; হাম, ধনুষ্টঙ্কার, ডিপথিরিয়া, বসন্ত, সর্দ্দি, পাঁজরাটানা, পেটের অসুখ, জ্বর প্রভৃতি নানা উপসর্গ সহ বিষ নির্গত হইয়া যায়। এই সময় যদি ভাপড়া দেওয়া হয় ও তল পেট

ধৌত করা হয়, তবে রোগের কষ্টের অনেক লাঘব হয়। এবং পূর্ব্ব হইতেই অর্থাৎ জ্বর-জ্বর-ভাব' হওয়ার সময়েই শিশু যদি সর্ব্বদা মাতৃক্রোড়ে থাকিতে প্রায় অথবা উক্ত প্রকার ব্যবস্থা করা যায় এবং প্রকৃতি বিরুদ্ধ আহারাদির ব্যবস্থা না হইয়া যদি উহা প্রকৃতি অনুযায়ী হয়, তবে ঐ সকল ভয়ানক রোগ অঙ্কুরেই বিনাশ প্রাপ্ত হয়। নবদ্বার এবং লোমকূপ দিয়া মল মূত্র ও ঘর্ম্ম-রূপে উহার বিষ বাহির হইয়া গিয়া ভয়াবহ রোগরূপে প্রকাশিত হইতে পারে না।

যাহাদের শরীর খুব ভাল অস্বাভাবিক আহারাদি করিয়াও তাঁহাদের বড় একটা অসুখ হয় না। কারণ, নবদ্বার ও লোমকূপ দিয়া মল, মূত্র ও ঘর্ম্মরূপে যে বিষ বাহির হইতেছে তদ্ব্যতীত যৎ কথঞ্চিৎ পানাহার জনিত বিষ শরীরে থাকিয়া যায় তাহাতে শীঘ্র কোনরূপ অনিষ্ট করে না। এই জন্য তাঁহারা অনেক সময়ে আপন আপন দেহের গর্ব্ব করিয়া থাকেন এবং বলেন "তাঁহাদের শরীর সব সহ্য করিতে পারে, সব খাইয়া হজম করিতে পারে"। অনেক দিন পরে অল্পে অল্পে সঞ্চিত বিষের মাত্রা যখন অত্যন্ত অধিক হয় তখন তাঁহারা যেরূপ কষ্ট পাইয়া থাকেন, তখন তাঁহা-দের যে বিপদ হয় তাহা অতি ভয়ানক! তাহা আকস্মিক বজ্রাঘাতের ন্যায়! বারুদ বোঝাই ঘরে একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ পড়িলে যেমন সর্ব্বনাশ হয় তাঁহাদেরও ঠিক সেই রূপ হইয়া থাকে। স্ফুলিঙ্গটী যে কোন্ সময়ে পড়ে তাহা জানিতেও পারেন না! অবয়ব-বিজ্ঞান (Science of Facial Expression) পাঠ

করিলে এই বিষয়টি বিশেষ রূপে জানিতে পারা যায়। রোগের যতগুলি কারণ এই গ্রন্থে লিখিত হইতেছে সেই কারণ গুলি উপেক্ষিত হইয়া সঞ্চিত বিষ রোগের মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে কিরূপ ভাবে এবং দেহের কোন্ কোন্ স্থানে দেদীপ্যমান অবস্থায় থাকে তাহা অবয়ব-বিজ্ঞান পাঠে দর্পণের মধ্যে প্রতি-বিম্বের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন। তৎসাহায্যে সুস্থদেহীর চেহারা ও অবয়বের সহিত আপনার অবয়ব তুলনা করিলে স্পষ্ট বুঝিবেন এবং চাক্ষুস দেখিতে পাইবেন যে, আপনার দেহ এবং প্রকৃত সুস্থদেহ এই দুইয়ের মধ্য কত প্রভেদ! এবং শরীর কত পরিমাণ ভারাক্রান্ত বা রোগাক্রান্ত হইয়াছে, অর্থাৎ দেহমন্দির কত পরিমাণ বারুদ বোঝাই হইয়াছে, তাহা কতদিন হইয়াছে, এবং পূর্ণ রূপে বোঝাই হইতে আর কতদিন আছে যখন ফুলিঙ্গটী উপস্থিত হইয়া সর্ব্বনাশ ঘটাইবে!

উক্ত বিষ বাহির হইতে না পারিয়া, অথচ জীবনীশক্তি কর্ত্তৃক প্রতিক্ষণে তাড়িত হইয়া, শরীরের যে কোন অংশে আট্‌কাইয়া থাকে। সর্ব্বপ্রথমে তলপেট হইতে উত্থিত হইয়া শরীরের অভ্যন্তরস্থ যে কোন যন্ত্রদ্বারা বাধা পায় সেই খানেই আশ্রয় লয় এবং পরে যন্ত্রটী দুর্ব্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে আক্রমণ করে। এইরূপে পেটের নানা প্রকার অসুখ, যকৃতের দোষ, প্লীহার দোষ এবং মূত্র যন্ত্রের দোষ হইয়া নানা প্রকার রোগ উৎপন্ন করে। সেই বিষ ঊর্দ্ধে উঠিবার সময় ফুস্‌ফুসের মধ্যে দিয়া গিয়া ফুস্‌ফুসের অগ্রভাগে স্কন্ধের নিচে আসিয়া বাধা পায়, এবং সেইখানেই

জমিতে থাকে। ক্রমাগত জমিতে জমিতে পরস্পর ঘর্ষণ হইতে থাকে। তাহার ফলে ফুস্‌ফুসের উপরিভাগ সর্ব্বপ্রথমে রোগাক্রান্ত হয়। বিষ যত বেশি সঞ্চিত হইতে থাকে ততই ফুস্‌ফুসের উপরিভাগ ঘর্ষণ প্রাপ্ত হওয়ায় নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়। এই সময় হইতে ফুস্‌ফুস্ ক্রমে ক্রমে ও আস্তে আস্তে অল্প করিয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে। ফুস্‌ফুস্ যাহার ভাল, সে কখনই হা করিয়া নিশ্বাস লইবে না, মুখ দিয়া নিশ্বাস লওয়া এবং মুখ খুলিয়া বা মুখ ব্যাদন করিয়া নিদ্রা যাওয়া ফুস্‌ফুসের দোষ। রাস্তায় চলিতে চলিতে যদি মুখ খুলিয়া নিশ্বাস লইতে হয় তাহা হইলে জানিবেন ফুস্‌ফুসের দোষ আছে। বৃদ্ধ লোকেরা মুখ বন্দ করিয়া ভ্রমণ করে; তাহারা প্রকৃত বয়স পাইয়াছে, কারণ, তাহাদের ফুস্‌ফুস্ ভাল এবং তজ্জন্য শরীরও ভাল। যে দিন তাহাদের নিশ্বাস লইতে কষ্ট হইবে, জানিবেন তাহাদের মৃত্যুর দিন নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। মনেও করিবেন না যে, অভ্যাস দোষে অনেকে মুখ খুলিয়া থাকে। কোন না কোন ব্যারাম না থাকিলে ঐটী হয় না; এবং যত দিন ঐ ব্যারামটী দূর না হইবে তত দিন বিনা চেষ্টায় মুখ কিছুতেই বন্দ রাখিতে পারিবেন না।

এই সকল নানা প্রকার রোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিতে হইলে কি করা উচিত? প্রথমতঃ বিষময় পদার্থ যাহাতে শরীর মধ্যে সঞ্চিত না হইতে পারে তাহা করিতে হইবে। এবং দ্বিতীয়তঃ সঞ্চিত বিষকে দূর করিতে হইবে। সুতরাং প্রকৃতির অনুযায়ী পান, আহার বিহারাদি করিতে হইবে, এবং যাহাতে নবদ্বার

ও লোমকূপ দিয়া শরীরের ময়লা বাহির হইয়া যায় তাহাও করিতে হইবে। দেহ-কল কি করিয়া চালাইতে হয় তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এবং পরেও ক্রমে ক্রমে বলিতেছি।

দাস্ত সম্বন্ধে একটী কথা বলা হয় নাই, তাহা এ স্থলে বলা আবশ্যক। দাস্ত একবার কিম্বা ঊর্দ্ধ সংখ্যা দুইবার হইবে বলিয়াছি, কিন্তু ঐ স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে কোন দিন এক বার, কোন দিন দুই বার এবং কোন দিন ৩।৪ বারও দাস্ত হইতে পারে, তাহাতে ভীত হইবেন না। প্রস্রাবও মলত্যাগ সময়ে যাহা হইবার তাহাই হইবে এবং তাহা ছাড়া আরও ২।৩ বার বেশী হইবে; অর্থাৎ এক সের হইতে দুই সের পর্য্যন্ত প্রস্রাব প্রতি ২৪ ঘণ্টায় হইবে; ইহার কম বেশী রোগের লক্ষণ। রোগের কারণ যত দিন দূরীকৃত না হইবে তত দিন পর্য্যন্ত মল ও মূত্র স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইবে না। মলমূত্রের অস্বাভাবিকত্ব ঘুচাইতে হইলে রোগের সমুদয় কারণ গুলি সর্ব্বদা চোখের উপর রাখিয়া একটী একটী করিয়া দুর করিবার জন্য চীনে জোঁকের মত পথ্যের নিয়মগুলি দৃঢ় অধ্যবসারের সহিত ধরিয়া থাকিতে হইবে। প্রত্যেক দিনের নিয়ম পালনের সুফল হাতে হাতে পাইবেন। আর ইহাও সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, নিজে যত্ন না করিলে নিজের দেহ অপরের হাজার যত্নেও ভাল হইতে পারে না। কিন্তু দেহটী একেবারে অচল না হইলে এ জ্ঞানটী কাহারও হয় না। চিকিৎসক এই জ্ঞানটী রোগীকে সর্ব্বাগ্রে বিতরণ করিবেন; এবং প্রত্যেক চিকিৎসক ঔষধ বিক্রয় না

করিয়া যদি ডাক্তার লুইসের মত উপদেশ দিয়া রোগ ভাল করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারেন, তবে সকল দিক বজায় থাকে এবং জগতের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়।

২১। মাদকতা।

—০০—

অতএব প্রকৃতি অনুযায়ী আহার ঠিক পরিমাণ মত করিতে হইবে। পরিমাণটী ঠিক রাখিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবেন। কারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি, যে অন্ন ক্ষুধায় অমৃতবৎ কার্য্য করে, সেই অন্ন অক্ষুধায় ভরাপেটে এক মুষ্টি খাইলেও বিষবৎ কার্য্য করিবে। পরিমাণ ঠিক করিবার জন্য আহারের পরিমাণ অধ্যায়টী, অর্থাৎ ৪র্থ প্রশ্নের উত্তরটী পুনঃপুনঃ পাঠ করিবেন। প্রকৃতি অনুযারী আহার করিতে হইলে নিরামিষ ও অনুত্তেজক খাদ্যদ্রব্য আহার করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্বে যে সকল নিরামিষ ও অনুত্তেজক খাদ্য দ্রব্যের উল্লেখ করিয়াছি তাহাই যথেষ্ট। তাহার উপর মেওয়া ফল এবং যে সময়ের যে ফল পাওয়া যায় তাহাও দাস্তর প্রতি লক্ষ্য করিয়া আহার করিতে পারেন। বিলাতের এক জন প্রধানতম চিকিৎসক নিরামিষ ও অনুত্তেজক খাদ্য দ্রব্য ব্যতীত অন্য সকল প্রকার খাদ্যকেই মাদক দ্রব্যের মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। তিনি বলেন রুটি, জল, দুগ্ধ এবং সুস্বাদু ফল হইলেই মানুষের যথেষ্ট হইল। এইরূপ অনুত্তেজক আহার করিলে দুই বেলার

অধিক আহার করিতে পারিবেন না। কারণ, অনুত্তেজক আহার স্বভাবতঃ বিনা কষ্টে জীর্ণ হইতে যে সময় লাগে উত্তেজক আহার তদপেক্ষা অধিক সময়ে জীর্ণ হয়; কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত ভাব লক্ষিত হয় অর্থাৎ উত্তেজক আহারের ফলে এত উত্তেজনা হয় যে, তাহাতে উত্তেজক খাদ্য সম্যক্ রূপে পরিপাক হইবার পূর্ব্বেই আবার ক্ষুধা বোধ হয়, সেই জন্য মাংসাহারিগণ দিবা রাত্রে ৪।৫ বার না খাইয়া থাকিতে পারেন না। উত্তেজক দ্রব্য আহার করিলে জীবনীশক্তিরূপ কোষাগারের উপর অত্যন্ত টান্ পড়ে, সমস্ত শরীরে একটা বিশেষ শক্তি প্রবাহিত হয়, মনে হয় যেন লুক্কাইত শক্তি জাগিয়া উঠিয়াছে; এবং প্রকৃত পক্ষে তাহাই হয় অর্থাৎ সঞ্চিত শক্তির (Reserve force) অপব্যয় হয়; অনুত্তেজক আহারে তাহা হয় না। অনুত্তেজক আহার জীবনীশক্তিরূপ কোষাগার পূর্ণই রাখে; পরিণামে অনুত্তেজক-দ্রব্য-ভোজীই জীবন পথের শেষ সীমায় যাইতে পারে। উত্তেজক-দ্রব্য-ভোজী খুব লম্ফ ঝম্প করিয়া পথের মধ্যেই পড়িয়া যায়। অশ্বকে মদ খাওয়াইয়া ইহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। জাপানবাসীদের এত বল, সহিষ্ণুতা ও বুদ্ধিমত্তার কারণ কি? উক্ত চিকিৎসক বলেন যে, তাহারা তণ্ডুলভোজী বলিয়া এত গুণ ধরে। মৎস্য এত কম পরিমাণে খায় এবং চা এত অধিক জল মিশ্রিত করিয়া পান করে যে, মোটের উপর রোগের বীজ খুব অল্প পরিমাণে তাহাদের শরীরে খাদ্যের সহিত প্রবেশ করে। উক্ত চিকিৎসক বলিতেছেন যে, মনুষ্যজাতি আজ কাল যে সকল

খাদ্য দ্রব্য আহার করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে, তাহাতে তাহারা আত্মহত্যা বা অকাল মরণের পথ দিন দিন প্রসস্ত করিতেছে। নিরামিষ ও অনুত্তেজক আহার ব্যতীত যাহা আমরা খাই, তাহাই বিষ। ঐ বিষকে শরীরের অনুযায়ী করিবার জন্য বুদ্ধিমত্তার পরাকাষ্ঠা হইয়া গিয়াছে এবং এখনও হইতেছে। নানা বিধ ঔষধ ও ঔষধ যোগে প্রস্তুত খাদ্য দ্রব্য অনেক হইয়াছে এবং হইতেছে; যাহা খাইবা মাত্র পরিপাক হইয়া যায়। কিন্তু এই অতিবুদ্ধির গলায় দড়ি হইয়াছে। মনুষ্য শরীর যে যে উপাদানে গঠিত তৎসমস্তই এক মাত্র দুগ্ধে বর্ত্তমান আছে, কেবল মাত্র দুগ্ধ পান করিয়া মানুষ জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বেশ সুস্থ শরীরে থাকিতে পারে। গাভী দুগ্ধের এত উপকার বুঝিয়া আমাদের দেশের মুনিঋষিগণ গাভীকে ভগবতী নামে আখ্যাত করিয়াছেন। তণ্ডুল মনুষ্য শরীরের সম্পূর্ণ উপযোগী বলিয়া উহাকে ব্রহ্মস্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন, সেই রূপ জলকে নারায়ণ এবং নারিকেল বৃক্ষকে ব্রাহ্মণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবিকল মনুষ্য শরীরের উপাদান বিশিষ্ট অর্থাৎ রক্ত, মাংস, অস্থি, মজ্জা, মেদ, মস্তিষ্ক বিশিষ্ট আর একটী জীব বা পাঁঠা, ছাগল, মেষ, মৎস্য, ডিম্ব প্রভৃতি নানা প্রকার আমিষ খাদ্য আহার করিয়া শরীরকে অতি সত্বর প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভাবে বলবান করিতে যাওয়া মহা ভুল। বৃক্ষ নরম মাটিতেই ভাল জন্মায়, বৃক্ষ যে সকল লৌহবৎ কাণ্ড প্রকাণ্ড সহ আকাশ পথে উঠিতে থাকে তৎসমুদয়ের উপাদান মৃত্তিকা হইতেই পাইয়াছে। মাটী

খুঁড়িয়া ইঁট, পাথর, কাষ্ঠ দিয়া নীচের ভাগ চৌরষ করিয়া তাহার উপর যদি বৃক্ষের চারা রোপণ করেন তবে সে বৃক্ষ কয় দিন বাঁচিবে? একটী শিশু বা বালককে দুগ্ধের পরিবর্ত্তে অন্নের সহিত ঘন ঘন মাংস খাওয়াইয়া দেখিবেন কত শীঘ্র রোগ আক্রমণ করে। যে মানুষ তাহার বুদ্ধিমত্তার বলে স্ফীত ও গর্ব্বিত এবং আপনাকে তাহার পূর্ব্ব পুরুষগণ অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে উন্নত বিবেচনা করিতেছে, বুদ্ধিমত্তাই তাহার জীবনপথের কালস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছে!

এদেশের অনেকেই চা পান করিয়া থাকেন। অভ্যাস এমনি হইয়াছে যে, দুই বেলা চা পান না করিলে অনেকের শরীর ঠিক্ থাকে না। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে চা ব্যবহার যে সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অনেক কাল ধরিয়া চা পান করিলে অগ্নিমান্দ্য হইয়া নানা রোগ উৎপন্ন করে; তাহা অনেকেই অবগত আছেন। বিজ্ঞানের সাহায্যে জানা গিয়াছে যে, চা'র মধ্যে "নার্কটীক" বিষ আছে। সামান্য পরিমাণ ঐ বিষ খাওয়াইলে কুকুর বিড়াল মরিয়া যায়, সেই বিষ অকারণে শরীরের মধ্যে চা-পানের সহিত প্রবেশ করান কোন মতেই যুক্তিসঙ্গত নহে। মদ খাইয়া মানুষ অজ্ঞান হয়; চা পান করিয়াও ঐরূপ অচৈতন্য হইতে দেখা গিয়াছে! সুতরাং চা অতি অপকারী এবং মদের ন্যায় মাংসও অত্যন্ত অপকারী। বিজ্ঞান সাহায্যে প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, আমরা যাহা সচরাচর পান ও

আহার করি তাহার অধিকাংশই উত্তেজক খাদ্য। উত্তেজক দ্রব্য আহার করিলে তৎক্ষণাৎ রোগের বীজ মূত্র-যন্ত্রে (kidney) অঙ্কুরিত হয়। উক্ত চিকিৎসক ঐ বীজকে (uric acid) ইউরিক্ এসিড্ বলিতেছেন। ক্রমাগত উত্তেজক আহারের ফলে মূত্র-যন্ত্রে ঐ পদার্থ সঞ্চিত হইয়া সকল প্রকার রোগের হেতু হয়। উক্ত পদার্থ রক্তের স্বাভাবিক গতি অল্পে অল্পে রোধ করিয়া দেহকে সর্ব্ব প্রথমে বাতের ক্ষেত্র করে। বাতের আক্রমণের পর সামান্য রোগ হইতে অতি কঠিন এবং নানা প্রকার দুশ্চিকিৎস্য রোগ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ বাত রোগে অনেকে মাংসাহার করিয়া থাকেন, কিন্তু ঐ মাংসই সেই বাত রোগকে অতি কঠিন রকম করিয়া তুলে। উত্তেজক আহারে প্রথম প্রথম উপকার বোধ হয়, কিন্তু শেষে বড়ই অনিষ্ট ঘটায়; সুতরাং উত্তেজক আহার মাত্রই বিশ্বাস ঘাতকের ন্যায় কার্য্য করে। উত্তেজক দ্রব্য খাইবা মাত্র রক্তের চলাচল বেশ হয়, অর্থাৎ রক্তের গতিরোধকারী উক্ত পদার্থ (uric acid) ক্ষণকালের জন্য সরিয়া গিয়া দেহতন্তু ও তন্তুসমষ্টি যুক্ত স্থানে (tissues and glands) একত্রিত হয়। কিন্তু উত্তেজক দ্রব্য খাওয়ার কুফল স্বরূপ আরও রোগের বীজ বা বিষ জন্মিল অর্থাৎ রক্তের গতিরোধকারী পদার্থ আরও অধিক হইল, এবং উহা পুরাতনের সহিত যোগ হওয়ায় রক্তের গতি আরও রোধ করিল। সুতরাং যে রোগটী তাড়াইবার জন্য উত্তেজক দ্রব্য খাইলাম তাহাতে ক্ষণকালের জন্য রক্তের গতিরোধকারী উক্ত পদার্থ টী সরিয়া যাওয়ায় রোগের

কিঞ্চিৎ উপশম হইল বটে, ফলে কিন্তু, পরে রক্তের গতি সমধিক রুদ্ধ হওয়ায় অধিক যন্ত্রণা সহ রোগটী আক্রমণ করিল। এই জন্যই উত্তেজক দ্রব্য আহার করার ফলস্বরূপ পরে অবসন্নতা আইসে, এবং যিনি যত অধিক উত্তেজক দ্রব্য আহার করেন তাঁহার তত অধিক অবসন্নতা আইসে। সুতরাং মাদক দ্রব্যসেবী ঠিক এক মাত্রার উপর থাকিতে পারেন না। উত্তেজনার ফলে যত বেশী ইউরিক এসিড বা রোগের বীজ উৎপন্ন হয় ততই রক্তের গতি অধিক পরিমাণে রুদ্ধ হয়, এবং ততই সেই সঙ্গে শরীরের অবসন্নতার সহিত রোগের নানা উপসর্গ অত্যন্ত জোর করে; মাত্রা না বাড়াইয়া থাকিতে পারেন না। এই কারণ বশতঃ চা'র মাত্রা আস্তে আস্তে বাড়িতে থাকে। অবশেষে চা আর কোনই ফল দেয় না। অপেক্ষাকৃত তেজস্কর ঔষধ চাই। এইরূপে এক তিল আফিম হইতে আরম্ভ করিয়া এক তাল আফিম, এবং এক ফোটা মদ হইতে বোতল বোতল মদ খাইয়াও কোন সুফল প্রাপ্ত হইতে পারেন না।

চা পান করার কারণ কি? "একটু আদটু খাইলে কিছু হয় না" এই মনে করিয়া সকলেই প্রথম বার পান করিয়া থাকেন। দুই একবার পান করিতে করিতে শরীরে একটা স্ফূর্ত্তি আসে, কেমন একটা সুখ অনুভব হয়। এই সময় অপকারটী জানিতে না দিয়া বিষ কেমন চোরের মত আসিয়া আক্রমণ করে! মনে হয়, উহা পরিশ্রম ও

দুঃখের সময় দেহ ও মনকে প্রফুল্ল করে। মাদক-দ্রব্য সম্বন্ধে যতদিন ঐরূপ জ্ঞান থাকে ততদিন নেশাটী ক্রমশঃ তাহার আধিপত্য রোগীর শরীরে বিস্তার করিতে থাকে। বন্ধু মনে করিয়া যে বিষের সহিত এত দিন খেলা করিয়াছেন, উহাকে ত্যাগ করিবার প্রথম চেষ্টার সময়ই বুঝিবেন যে, সুহৃদ্ কত জোরে আপনাকে সাপ্টাইয়া ধরিয়াছে। যে কোন অভ্যাস দোষ ত্যাগ করিবার প্রথম উদ্যমেই ঐরূপ কষ্ট হইবে। সে সময় আর বন্ধু বিবেচনা না করিয়া উহাকে শত্রু জ্ঞান করিয়া থাকেন। কিন্তু আপনি তখন শত্রুর সম্পূর্ণ অধীন; কোন মতেই তাহাকে ছাড়িতে পারিতেছেন না। এই সময় মাদকদ্রব্যের অপকারিতা বিশেষ রূপে হৃদয়ঙ্গম করিয়া কেহ কেহ দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া উহাকে ত্যাগ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। কিন্তু প্রায় অধিকাংশ লোকই উহাকে ত্যাগ করিবার জন্য ভবিষ্যতে একটী দিন স্থির করিয়া রাখেন; মনে করেন, যে সময় কাজ কর্ম্ম কমিয়া যাইবে, এবং স্বাস্থ্যও একটু ভাল হইবে (কি করিয়া যে স্বাস্থ্য ভাল হইবে তাহার কোন হিসাব নাই, মনের খেয়াল বশতঃ ঐ রূপ ভাবেন), মনের খেয়াল বশতঃ মনে করেন, যখন চারিদিকে সুবিধা হইবে তখন নেশাটী ত্যাগ করিলেই হইবে। ইতি মধ্যে নেশাটী চলিলে কোন ক্ষতি হইবে না। এই প্রকারে নেশার মাত্রা আরও বাড়িতে থাকে। স্বাস্থ্যও ভাল হয় না, কাজ কর্ম্মও

কমে না, সুতরাং ভবিষ্যতের যে দিনে নেশাটী ত্যাগ করিবেন মনে করিয়াছিলেন, সে দিনটীও আসে না। ঐ ভাবেই অকালে জীবলীলা সাঙ্গ হইয়া যায়।

বোধোদয়ে পড়িয়াছেন পদার্থ তিন প্রকার, যথা—চেতন, অচেতন ও উদ্ভিদ্। তিনটীর পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ দেখিতে পাই? একজন চিকিৎসক বলিয়াছেন, "The mineral kingdom feeds the vegetable kingdom, and the vegetable the animal" অর্থাৎ অচেতন জগত উদ্ভিদ্ জগতকে রক্ষা করিতেছে, এবং উদ্ভিদ্ জগত প্রাণি জগতকে রক্ষা করিতেছে। এই হইল সাধারণ প্রাকৃতিক নিয়ম। অতএব মানুষ উদ্ভিদ্ পদার্থই আহার করিবে। ঐ নিয়মের বাহিরে গেলেই সাজা পাইতে হইবে। উক্ত চিকিৎসক বলেন "A pinch of salt is a pinch of poison" অর্থাৎ "এক ছিটে লবণ এক ছিটে বিষের তুল্য"। তিনি দশ বৎসর লবণ বর্জ্জিত আহার করিয়া সকল রোগের হাত হইতে মুক্ত ছিলেন।

কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকার একটী সংবাদ পত্রে আলোচনা হইয়াছিল যে, লবণ ব্যতীত মানুষ বাঁচিতে পারে না অতএব উহা অতি মাত্রায় ব্যবহার করা উচিৎ। একটী রোগী মূত্র যন্ত্র সংক্রান্ত কোন রোগে (Bright's disease) আক্রান্ত হইয়া কলিকাতার বড় হাঁসপাতালে চিকিৎসার্থে গিয়াছিলেন। তথায় থাকিয়া চিকিৎসিত হইবার সময়

তাঁহাকে লবণবর্জ্জিত পথ্য আহার করিতে দিয়াছিল। আরোগ্য হইয়া কোন বিখ্যাত সংবাদ পত্রের সম্পাদককে ঐ লবণ বর্জ্জিত পথ্যের কথা বলাতে সম্পাদক মহাশয় কলিকাতার একটী খ্যাত নামা চিকিৎসকের নিকট একজন লোক পাঠাইয়া দিলেন। সেই লোকটী চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিল, "লবণ সম্বন্ধে আপনার মত কি?" চিকিৎসক বলিলেন, "মূত্র-যন্ত্র সংক্রান্ত যাবতীয় পীড়ায় এবং রক্ত হীনতায় বা রক্তাল্পতায় লবণ শূন্য পথ্য অত্যন্ত উপকারী। আমি ঐ প্রকার রোগগ্রস্ত সমুদয় রোগীকে লবণ বর্জ্জিত আহার করিতে বলিয়া থাকি। তাহাতে প্রত্যেক রোগী আরোগ্য হইয়াছে। উপকার হয় নাই এমন কথা এক জনও ফিরিয়া আসিয়া বলে নাই"। একটী যুবকের দৃষ্টান্ত দিয়া বলিলেন যে, "তাহার মূত্র যন্ত্র সংক্রান্ত রোগে হাঁটুদ্বয় অত্যন্ত ফুলিয়াছিল, তাহাকে লবণ ত্যাগ করিতে বলা হয়, সে তাহাই করিয়া সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া এক্ষণে কাজ কর্ম্ম করিতেছে"। সেই লোকটী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, "তবে কি লবণ ব্যবহার না করাই ভাল?" চিকিৎসক বলিলেন, "না, আমি অতদূর করিতে বলি না, তবে উপরোক্ত রোগ সমুদয়ে লবণ বর্জ্জন অত্যন্ত হিতজনক। আমি ঐরূপ প্রত্যেক রোগীকে ঐ ব্যবস্থাই করিয়া থাকি"। সেই লোকটী আবার জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি নিজে লবণ ব্যবহার করেন কি?" চিকিৎসক উত্তর দিলেন, "আমি লবণ

ব্যবহার করি না; কিন্তু খাদ্য দ্রব্যের স্বাভাবিক উপাদান গুলির মধ্যে লবণময় একটী উপাদান অলক্ষিত ভাবে আছে, তাহা অবশ্য ধর্ত্তব্য নহে"। সেই লোকটী পুনশ্চ বলিল, "আপনার স্বাস্থ্য তো সর্ব্বদাই ভাল থাকে"! তাহাতে চিকিৎসক বলিলেন, "অবশ্য, লবণ ব্যবহার না করিয়া আমি ভালই আছি, কিন্তু আমি জানি এক জন লোক অতি মাত্রায় লবণ ব্যবহার করিয়াও নব্বই বৎসর বাঁচিয়াছিল; লবণ সম্বন্ধে বিজ্ঞান যতদূর পরীক্ষা করিয়াছে তাহাতে সিদ্ধান্ত হইয়াছে যে, কোন কোন রোগে লবণ না খাওয়াই উচিত"।

আমাদের দেশে পিতা মাতা দুষ্ট সন্তানের উপর রাগ করিয়া বলিয়া থাকেন, "আঁতুড় ঘরে নুন খাইয়ে তোকে মেরে ফেল্লেই আপদ্ চুকে যেতো"। ইহা হইতে বুঝা যায় যে লবণ প্রকৃতি বিরুদ্ধ; আর ইহাও লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন, যে শিশু কেবল দুগ্ধ ছাড়িয়া ভাত খাইতে শিখিতেছে সে কখনই লবণ, ঝাল, মস্লা প্রভৃতি যোগে আহার করিবে না; ঐ রূপ আহার মুখে তুলিয়া দিলেও সে উহা ফেলিয়া দিবে। যে উত্তেজক খাদ্যগুলি শৈশবকালে বিষ বলিয়া ত্যজ্য ছিল সেগুলি বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অন্য পাঁচ দশ জনের কু-অভ্যাস দেখিয়া অমৃত বলিয়া পরিগণিত হয়! বয়সের সঙ্গে যেমন শক্তি বাড়িতে থাকে ঠিক সেই শক্তির প্রতিযোগিতাকারী নানা প্রকার বিষবৎ খাদ্য উদরস্থ হইতে থাকে! এই রূপে জীবনীশক্তি দ্বারা জীবনটাই প্রতিহত হইতে হইতে চলিতে থাকে। ঐ সকল বিষ খাইয়া নব্বই

বৎসর জীবিত থাকা অসম্ভব নহে। কারণ, উহা অপেক্ষাও তেজস্কর বিষ অহিফেন সেবন করিয়া আমার জানিত একটী লোক ১০৪ বৎসর, আর একটী লোক ৯৫ বৎসর এবং আরও কয়েকজন ৮৬।৮৭ বৎসর বাঁচিয়াছিলেন। এবং এখনও লবণ, ঝাল, মসলা প্রভৃতি মৃদু বিষ এবং তদুপরি তেজস্কর অহিফেন আজীবন সেবন করিয়া একজন ৭২ বৎসর, একজন ৭৬ বৎসর এবং আর একজন ৯৪ বৎসর বয়স প্রাপ্ত হইয়া জীবন্মৃত হইয়া কেবল তাঁহাদের অস্তিত্ব মাত্রই ইহসংসারে ঘোষণা করিতেছেন! তাই বলিয়া কি অহিফেন বা মদ্য অথবা তদপেক্ষা মৃদুবিষ যাহা আমরা খাদ্যের সহিত প্রত্যহ সেবন করিতেছি তাহাদের পক্ষ সমর্থন করিবেন? কুকার্য্য কেহই সমর্থন করে না। কিন্তু জগৎশুদ্ধ লোকই যদি কুকার্য্য করে তবে তাহার প্রতিবাদ বিজ্ঞান ব্যতীত আর কে করিতে পারে? উত্তেজক দ্রব্য দেহের শক্তি হরণ করে, সুতরাং উহা নিয়মিত রূপে খাইলেও অল্পে অল্পে এবং কালক্রমে বিষবৎ ফলই প্রসব করিবে। দেহ ক্ষয় করিবার উপযুক্ত উপাদান উহাতে অধিক পরিমাণ বিদ্যমান আছে, সুতরাং স্বাভাবিক বা প্রকৃতি অনুযায়ী খাদ্যের আসন উহাকে দেওয়া যাইতে পারে না; কেবল মাত্র উহাই খাইয়া কয় দিন থাকা যায়? সুস্থদেহী লোক তো দেখা যায় না; এমত অবস্থায় লবণের মাত্রা ক্রমে ক্রমে কমাইয়া উহাকে ত্যাগ করাই ভাল। সর্ব্ব প্রকারে প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভাবে জীবনযাপন করিয়া ৪০।৪৫।৫০ বৎসর বয়সের সময় সামান্য একটু পীড়ার সূত্রপাত

হইলে সকলেই বলিয়া থাকেন, "ওটা বয়সের দোষে হইয়াছে"। কিন্তু আজীবন প্রকৃতির প্রতিকূলাচরণের কুফল স্বরূপ যে ঐ রোগটী অসময়ে দেখা দিল তাহা কেহই স্বীকার না করিয়া উহাকে স্বাভাবিক ব্যাপার বলিয়াই ক্ষান্ত থাকেন! পাশ্চাত্য চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকগণ বলিতেছেন যে, মনুষ্য যদি মোটা মুটি ভাবে প্রকৃতির অনুকূল পথে চলে তবে তাহার পূর্ণ যৌবন অবস্থা ৮০ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত থাকিবে। তন্মধ্যে একজন পণ্ডিত বলেন যে, যে সকল পোকা বা কীটানুদ্বারা দেহ ক্রমে ক্রমে ধ্বংশ হইতেছে সেই সকল পোকার সম্যক প্রতিদ্বন্দ্বিকারী পোকা দধিতে পাওয়া যায়, অর্থাৎ দধির পোকা দেহধ্বংশকারী পোকাকে যেরূপ বিনাশ করিতে পারে সেরূপ অন্ত কোন পদার্থ দ্বারা হয় না। এই কারণ বশতঃ দধি ভোজন তাঁহার মতে একান্ত আবশ্যক। বুলগেরিয়া প্রদেশের পাহাড়িয়াগণ অত্যন্ত দধি ভোজন করে বলিয়া তাহারা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘজীবী।

অচেতন পদার্থের মধ্যে লবণ ব্যতীত আরও অনেক পদার্থ আছে যদ্দ্বারা ঔষধাদি প্রস্তুত হয়, তৎ সমস্তই মানুষের প্রকৃতি বিরুদ্ধ; এবং উদ্ভিদের মধ্যেও কতকগুলি মানুষের জন্য কতগুলি অন্যান্য জীব জন্তুর জন্য। মানুষকে বাছিয়া লইতে হবে কোন্‌টী তাহার প্রকৃতি অনুযায়ী। খাইতে সুস্বাদু অথচ উত্তেজক নয় সেইরূপ উদ্ভিদ পদার্থ আহার করিতে হইবে। ঝাল, মসলা প্রভৃতি সমস্ত উত্তেজক পদার্থ ত্যাগ করিতে হইবে। খাদ্যাখাদ্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাহাতে দেখিবেন অনেক মুখপ্রিয়

সামগ্রী আছে। ঝাল, মস্‌লা, লবণ প্রভৃতি উত্তেজক দ্রব্য কিরূপে আস্তে আস্তে ত্যাগ করিতে হইবে তাহাও পূর্ব্বে বলিয়াছি। আহারের রকমারি যত কম হইবে ততই স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে।

মনুষ্যজাতি আজকাল এত অধিক উত্তেজক পদার্থ আহার করে কেন? যে দিন মানুষ তাহার স্বাভাবিক আহার ত্যাগ করিয়া উত্তেজক খাদ্যের আবশ্যকতা মনে করিয়াছে সেই দিন হইতে ক্রমে ক্রমে মৎস্য, মাংস, ডিম্ব প্রভৃতি নানা প্রকার উত্তেজক খাদ্য আহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। সেই দিন হইতেই উত্তেজনার অবশ্যম্ভাবী কুফল অবসন্নতাকে দূর করিবার জন্য আর একটী নূতন উত্তেজক পদার্থের আবশ্যকতা বোধও হইয়াছে। এইরূপে ক্রমে ক্রমে নানা প্রকার মাদক দ্রব্যের প্রচলন হইয়াছে। চা, কাফি (আমাদের দেশে খুব কম পরিমাণ ব্যবহার হয়), কোকো (আমেরিকায় খুব প্রচলিত পানীয়), অহিফেণ, কোকেন, মদ্য, তামাক, গাঁজা, সিদ্ধি, ধুতুরা প্রভৃতি সমুদয় উত্তেজক পদার্থ এবং ঐগুলির সংযোগে এবং আরও অনেক প্রকার উত্তেজক পদার্থের সংযোগে প্রস্তুত অসংখ্য প্রকার ঔষধের উক্ত রূপে আবশ্যকতা বোধ ও প্রচলন হইয়াছে। এবং উক্ত মাদকদ্রব্য সকল যত অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে ততই উহাদের মাত্রারও বৃদ্ধি হইয়াছে। সুতরাং সর্ব্বপ্রথমের স্বাভাবিক আহার ত্যাগ করাই মহাভুল হইয়াছে, তার পর দ্বিতীয় ভুল হইয়াছে, উত্তেজক ও অস্বাভাবিক খাদ্য আহার। এইরূপে ক্রমে ক্রমে একটীর পর

আর একটী ভুল হইয়া সমুদয় ভুলের কুফলরাশি এতই হইয়াছে যে, অভ্যস্ত মারাত্মক আহার ত্যাগ করিয়া স্বাভাবিক আহার করিতে বলিলে মানুষ এখন একটু হাঁসিবে মাত্র! কিন্তু জানিয়া রাখা উচিৎ যে, প্রকৃতি অনুযায়ী খাদ্যের পরিবর্ত্তে উত্তেজক ও অস্বাভাবিক অর্থাৎ প্রকৃতি বিরুদ্ধ আহার করিলে তাহার ফলে প্রকৃতির হাতে সমুচিত শাস্তি পাইতেই হইবে এবং তাহা যে যথেষ্ট রূপ পাইতেছে তাহাতেও সন্দেহ নাই। একথা বিজ্ঞান আজ বুক ফুলাইয়া বলিতেছে, কিন্তু প্রাচীন কালে তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ এ সকল বুঝিয়াই ফল, মূল, শস্য, দুগ্ধ প্রভৃতি রোগের বীজ রহিত পদার্থ খাইয়া জীবন ধারণ করিতেন। অদ্যাপিও শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়ায় পিণ্ডের জন্য যে অন্ন রন্ধন হয় তাহা আতপ অন্ন এবং তাহাতে এমত পরিমাণ জল দেওয়া হয় যাহাতে ফেন কাটিয়া ফেলিতে হয় না। ঐটী যেন একটা কুপ্রথা, উহার মূলে কোন সত্য নাই, এই মনে করিয়া আমরা তাহা মানি না। সর্ব্বদা চোখের উপর যাহা দেখি তাহারই অনুকরণ করি, তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক। সভ্য জগতের অনুকরণ এইরূপেই করিয়া আসিতেছি, তার উপর নিজের দেশের প্রচলিত পথ্যাদির অনিয়ম ত আছেই; তাহাও এক্ষণে বিজ্ঞান দেখাইয়া দিতেছে। কিন্তু সভ্য জগতেরও আর সে দিন নাই; "আমার যাহা ভাল লাগে তাহাই খাইব", "আমার পছন্দসই যাহা হইবে না তাহা খাইব না," আহার সম্বন্ধে এরূপ জ্ঞানটী আর ঠিক বলিয়া বিবেচিত হইতেছে না। প্রত্যেক বস্তু আহারের সঙ্গে সঙ্গে জীবনমরণের কথা হইতেছে। কিন্তু ভুলের পথে

মানুষ এতদূর অগ্রসর হইয়া পড়িয়াছে যে, সে তুষারে পথহারা পথিকের ন্যায় হইয়াছে। জীবনের পথটা ছাড়িয়া মরণের পথটী ধরিয়া চলিতে চলিতে ঐটীই ভাল লাগিয়াছে, ঐটীতেই পড়িয়া মোহ নিদ্রায় অভিভূত আছে,তুলিতে বা জাগাইতে চেষ্টা করিলেও ঐ পথেই পড়িয়া থাকিবে, বলিবে "বেশ এক রকম আছি"। অর্থাৎ জীবনের পথ সম্বন্ধে একেবারেই জ্ঞানহারা! গলায় দড়ি বেশ লাগিতেছে, খুলিতে দিবে না! তবে উপায়? পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ উপায়ও ভাবিয়াছেন। উপায়গুলির মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে স্ব স্ব গৃহে স্বাস্থ্যের নিয়ম পালনই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম।

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে উত্তেজক খাদ্য ব্যবহার করিলে কত শীঘ্র রোগ আক্রমণ করে, এবং শীত প্রধান দেশে অনুত্তেজক আহারে দীর্ঘজীবন লাভ হয় কি না তাহা কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়া এ প্রসঙ্গটি শেষ করা যাউক। গ্রীষ্মপ্রধান হনলুলু দেশ হইতে জনৈক ধর্ম্ম প্রচারক বা পাদরি সাহেব তাঁহার ইউরোপস্থিত কোন বন্ধুকে এই মর্ম্মে এক খানি পত্র লিখিয়াছেন —

"এ দেশে শ্বেতকায় মনুষ্যের আগমণের পূর্ব্বে দেশীয় লোক সকল পই নামক এক প্রকার শস্য (দেশীয় ফসল) পেষণ করিয়া কদলী ও অন্যান্য ফলের সহিত খাইয়া জীবন ধারণ করিত। পানীয় স্বরূপ পরিস্কার জল ব্যতীত অন্য কোন প্রকার পানীয় দ্রব্যের ব্যবহার তাহারা জানিত না। এইরূপ সম্পূর্ণ প্রকৃতিঅনুযায়ী এবং রকমারি-বিহীন খাদ্য আহার করিয়া তাহারা দীর্ঘকায়, নিরোগী এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। পরে শ্বেতকায় মনুষ্য

আসিয়া তাহাদিগকে শিক্ষা দিতে লাগিলেন যে মদ্য এবং মাংস ব্যতীত অন্য কোন খাদ্যই শক্তি উৎপাদন করিতে পারে না; ক্রমে ইউরোপ হইতে জাহাজপূর্ণ মদ এবং মাংসের আমদানীও হইল। এতদ্দেশীয় লোকের শিরোমণি এক জন যে দিন দেশীয় খাদ্যের পরিবর্ত্তে মদ্য ও মাংস সর্ব্ব প্রথমে উদরস্থ করিলেন সেই দিন, সেই তারিখ এবং সেই বৎসর অর্থাৎ '১৮ই মে ১৮১৯' খুব ধুমধামের সহিত দেশীয় ইতিবৃত্তে লিখিত হইল। তদবধি মদ্য, মাংস প্রভৃতি নানা প্রকার উত্তেজক খাদ্য এ দেশে প্রচলিত হইতে লাগিল। প্রায় ৪০ বৎসর পরে কি ফল দেখা দিয়াছে? অধিকাংশ লোক চর্ম্মরোগে এবং হাঁপানি রোগে ভুগিতেছে, প্রায় সকলেরই জননেন্দ্রিয়ের কোন না কোন রোগ আছেই, এবং কুষ্ঠরোগের প্রাদুর্ভাব অত্যন্ত হইতেছে"! এ সকল রোগের কারণ কি তাহা পাঠক মহাশয় অবশ্যই বুঝিতেছেন।

আমাদের দেশে অধুনা উত্তেজক খাদ্যের অত্যন্ত প্রচলন হওয়ায় নানা রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, সে সকল রোগের নাম পর্য্যন্ত ২৫।৩০ বৎসর পূর্ব্বে কেহ জানিত না। উত্তেজক খাদ্যের বহুল প্রচলনের সঙ্গে সঙ্গে দুগ্ধের আবশ্যকতা বোধ ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। কিন্তু আজ কাল অনেকের বিশ্বাস যে, দুগ্ধের অভাবে কলিকাতার বহু শিশু সন্তান তাহাদের পাক-যন্ত্রের অনুপযোগী কঠিণ ও দুষ্পাচ্য দ্রব্য আহার করিয়া অকালে প্রাণ হারায়; বার্দ্ধক্যে দুগ্ধের অভাবে অনেকের শরীর অতি

অল্পদিনের মধ্যেই ভাঙ্গিয়া পড়ে। পল্লী গ্রামের অবস্থাপন্ন লোকের ছেলে মেয়েরাও উপযুক্ত পরিমাণে বিশুদ্ধ দুগ্ধ পান করিতে পায় না। দুগ্ধের অভাব বসতঃ লোকের পরমায়ু হ্রাস হইতেছে। গরুর অভাব, উপযুক্ত গোচারণের মাঠের অভাব এবং সেকালের ন্যায় সুস্থ ও সবল গোবৎসের অভাব বসতঃ গোবংশের ক্রমিক অবনতির সহিত দুগ্ধের পরিমাণ বড়ই কমিয়া গিয়াছে। গোবংশের উন্নতি করিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে গোবংশ-ধ্বংশ নিবারণ করিতে হইবে। গোখাদকদের জিহ্বা গো-মাংসের জন্য যেরূপ 'লক্ লক্' করে তাহার নিবৃত্তি কঠিন আইনের শৃঙ্খল ব্যতীত অন্য কিছুতেই হইবে না। পাশ্চাত্য দেশে প্রাকৃতিক চিকিৎসার প্রচলন যেরূপ দিন দিন বাড়িতেছে তাহাতে আশা করা যায় যে, কালক্রমে ঐ সকল দেশে গাভী মাতৃস্থানীয়া হইতে পারে; তাহা হইলে তাহার সুফল আংশিক ভাবেও আমাদের দেশে ফলিতে পারে। ভবীষ্যতের কথা ছাড়িয়া দিয়া এক্ষণে আমাদের এই প্রতিকূল অবস্থায় কি করা উচিত? পূর্ব্বেও বলিয়াছি এবং পুনরায় বলিতেছি যে, রকমারি খাদ্য ত্যাগ ব্যতীত স্বাস্থ্য রক্ষার এবং দীর্ঘজীবন লাভ করিবার এবং রোগের উপস্থিত যন্ত্রণা হইতে মুক্ত হইবার অন্য উপায় নাই। যে ব্যক্তি চারি আনা পয়সা মাত্র উদর পূরণের জন্য ব্যয় করিতে পারে, চারি আনার অধিক ব্যয় কিছুতেই করিতে পারে না, সে ব্যক্তি রকমারি আহার না করিয়া যদি কেবল মাত্র দুগ্ধ ও ভাত অথবা দুগ্ধ ও রুটীতে ঐ চারি আনা পয়সা খরচ করিয়া উদর পূরণ

করে, তবে সে সর্ব্বরোগ হইতে মুক্ত হইবে এবং সম্পূর্ণ সুস্থ শরীরে শতাধিক বৎসর জীবিত ও কার্য্যক্ষম থাকিবে তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

নির্জ্জলা গোদুগ্ধ যে মনুষ্যদেহের পক্ষে কিরূপ হিতকর, তাহা বুলগেরিয়ানদের স্বাস্থ্য দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়। বুলগেরিয়ানরা ইউরোপের সকল জাতি অপেক্ষা দীর্ঘজীবী। এই ক্ষুদ্র দেশে এখনও চারি সহস্রাধিক নরনারী দেখিতে পাওয়া যায়—তাহাদের বয়স নব্বই বৎসরের অধিক। এত অল্প লোকের মধ্যে এত অধিক দীর্ঘজীবী অধিবাসী আর কুত্রাপি নাই।

ইহাদের এই প্রকার দীর্ঘজীবনলাভের কারণ, ইহারা খুব বেশী দুগ্ধ পান করে। দুগ্ধই ইহাদের প্রধান খাদ্য। সে দেশে দুগ্ধ বাসি করিয়া, পচিয়া অম্ল হইলেও, তাহা পান করিবার নিয়ম আছে। সম্প্রতি এক জন বৃদ্ধ চর্ম্মকার প্রাণত্যাগ করিয়াছে; সে প্রায় শতবর্ষের বৃদ্ধ। কিন্তু মৃত্যুকালেও তাহার ইন্দ্রিয়সমূহ বেশ সতেজ ছিল। কোন প্রসিদ্ধ সংবাদ পত্রের এক জন লেখক তাহাকে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; উত্তরে সে বলিয়াছিল, "ইহার কারণ ঐ দুধের পেয়ালাগুলি; ঐ জানালায় সারি সারি দুগ্ধপাত্র সজ্জিত দেখিতেছেন না? প্রত্যহ আমি অনেক খানি দুগ্ধ একটা পেয়ালায় ঢালিয়া রাখি, দুই সপ্তাহের মধ্যে আর তাহাতে হাত দিই না।

দুই সপ্তাহ পরে সেই দুধ জমিয়া দধির মত কঠিন ও অম্লরসে পূর্ণ হয়। এই দধিবৎ দুগ্ধ পান করিয়াই এ বৃদ্ধ বয়সে আমি এরূপ সবল ও সুস্থ আছি। দুই সপ্তাহ না পচিলে আমি দুগ্ধ স্পর্শ করি না।"

দুগ্ধ যে মানবদেহের পোষণের পক্ষে একান্ত আবশ্যক, অন্যত্রও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। সম্প্রতি আয়র্লণ্ডে একটী স্ত্রীলোকের ১০৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু হইয়াছে; সে তাহার জীবনের শেষ চল্লিশ বৎসর দুগ্ধ মিশ্রিত অল্প রুটি ভিন্ন অন্য কোন খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করিত না। সে বড় গরীব, অন্য কোনও খাদ্য সামগ্রী সংগ্রহে অসামর্থই তাহার এরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কারণ। দুগ্ধপান করিয়া তাহার শরীর এতই ভাল ছিল যে, তাহার মৃত্যুর পর শব ব্যবচ্ছেদের সময় দেখা গিয়াছে, তাহার ইন্দ্রিয় এমন অবিকৃত ছিল যে, ৩০।৪০ বৎসরের রমণীর পক্ষেই তাহা স্বাভাবিক।

দুগ্ধ একেবারে অধিক পান করা উচিত নহে। অল্প অল্প দুগ্ধ পান করিয়া ক্রমে অভ্যাস করিয়া লইতে হয়। সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক মিঃ ওয়ের মিচেল অনেক রোগীর চিকিৎসার সময় কেবল দুগ্ধপানের ব্যবস্থা দেন। এমন কি, কোন কোন রোগীকে এক মাস বা ততোধিক কাল দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কোনও খাদ্যদ্রব্য খাইতে দেওয়া হয় না। আমাদের দেশের অনেক চিকিৎসক দুশ্চিকিৎস্য শোথ

প্রভৃতি রোগে 'দুধবড়ি'র চিকিৎসা করেন; রোগীকে দুগ্ধ ভিন্ন অন্য কিছু খাইতে দেওয়া হয় না।

সম্প্রতি একজন পাশ্চাত্য চিকিৎসক প্রচলিত প্রণালীর চিকিৎসার চারিটী ভুল দেখাইতেছেন। তিনি বলেন, "(১)মাংসের ঝোল বা জুষ পুষ্টিজনক নহে। অনশনে থাকিলে যেরূপ ভাবে মৃত্যু হয় উক্ত প্রকারে মাংস বা চা অথবা কাফি অথবা মদ্যপান করিলে ঠিক সেই ভাবে অর্থাৎ দেহের সঞ্চিত শক্তির ক্রমশঃ ক্ষয় হইয়া মৃত্যু ঘটিবে। (২)সুরা দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি করে না, উহা পান করিলে শরীরের তাপ কমিয়া যায়; সুতরাং শীত হইতে রক্ষিত হইবার জন্য সুরাপান নিস্ফলদায়ক। (৩)একটী ডিম্ব অর্দ্ধসের মাংসের সমান নহে; অজীর্ণ রোগগ্রস্ত রোগীগণ মনে করে যে দিবসে একটী কিম্বা দুইটী ডিম্ব ভক্ষণ করিলেই অর্দ্ধ সের মাংস খাওয়া হইল, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে তাহা হয় না; কারণ, তাহাদের জানা উচিৎ যে, একটী দুইটী নয়, আটটী ডিম্ব আধ সের মাংসের তুল্য। (৪) পরিপাক ক্রিয়ার একটু গোলমাল হইলেই আজ কাল প্রায় সকলেই যকৃতের উপর চিকিৎসা করিয়া থাকেন। কিন্তু যকৃৎ সম্বন্ধে বিশেষ রূপ জ্ঞান না থাকিলে সে চিকিৎসায় নানা বিপদের সম্ভাবনা। কারণ, অজীর্ণ হেতু নব্বই প্রকারের ভিন্ন ভিন্ন ও পৃথক পৃথক দোষ যকৃতের মধ্যে জন্মিতে পারে। সুতরাং যে কোন দোষ নিবারণের জন্য যে কোন ঔষধ প্রয়োগ করুন না

কেন, তাহাতে অন্যান্য সমুদয় দোষ বাড়িয়া যাইবার সম্ভাবনা খুব অধিক।"

আর এক জন পাশ্চাত্য পণ্ডিত সুরা এবং সুরার ন্যায় অন্যান্য বিষবৎ উত্তেজক পদার্থের সম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছেন, "অন্যান্য বিষের ব্যবহারের ন্যায় সুরার ব্যবহারও খুব কমিয়া যাওয়া উচিত। কারণ, সুরাপানে যে কুফল হয় তাহার প্রতিষেধ পুনরায় সুরাপান! উহা পান করিলে ক্ষুধা কমিয়া যায়; এবং অতি অল্প পরিমাণ পান করিলেও পরিপাক ক্রিয়ার ব্যাঘাত জন্মায়। উহার উত্তেজক গুণ শরীরে অল্পকাল পর্য্যন্ত অনুভব হয়, এবং ঐ উত্তেজক ক্রিয়ার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে কাজ করিবার ক্ষমতাটী একেবারে পড়িয়া যায়। উহা পান করিলে শরীরের লুক্কায়িত শক্তি জাগিয়া উঠে, এবং ঐ শক্তিটী নিঃশেষিত হইলে শরীরের অবলম্বন করিবার আর কিছুই থাকে না। বোয়ার যুদ্ধের সময় দেখা গিয়াছে যে, যে সৈন্যগণ সুরাপান করিয়াছিল তাহারাই কার্য্যে সম্যক্ অপটু হইয়াছিল। যে কার্য্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও গবেষণার আবশ্যক সে কার্য্যের পথে সুরাপান ঘোর অন্তরায়। সুরার প্রচলন হাঁস্পাতালে ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, এবং যাঁহাদিগকে দিবসে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হয় তাঁহাদের মধ্যেও অনেকে সুরা ত্যাগ করিতেছেন।"

বিশ্বাস ও রোগের চিকিৎসা।

-oo-

আলোচ্য বিষয় গুলি একে একে শেষ হইল; ঐ সম্বন্ধে অবশিষ্ট দুই চারিটী কথা এই উপসংহার ভাগে থাকিবে। এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কথাগুলি মনে লাগিতেছে কি? যে কথাগুলি বলিলাম তাহাতে কতদূর বিশ্বাস জন্মাইতে পারিলাম বলিতে পারি না। কথায় যদি বিশ্বাস না হয় তবে সে কথা অনুসারে কাজ হয় না। প্রত্যেক কার্য্যের মূলে একটা বিশ্বাস থাকা চাই। বিশ্বাস যত বেশি হইবে কার্য্যে ততই অনুরাগ বাড়িবে এবং ততই অধ্যবসায়ের সহিত কার্য্য সম্পাদিত হইবে। মানুষ যে পথেই চলুক, বিশ্বাস, অনুরাগ ও অধ্যবসায় তাহার সেই পথের সহায়। ঐ তিনটী যত অধিক হইবে, সফলতা লাভও সেই পরিমাণ হইবে। আজ কাল কার লোকের বিশ্বাস পরের মুখে ঝাল খাওয়া। নিজে একটা স্থির করিতে পারে না, প্রায় লোকই পরের উপর নির্ভর করিয়া থাকে। নেপোলিয়ন কোন লোককে এক দিন বলিতেছেন, "চিকিৎসক প্রদত্ত ঔষধের গুলি গোলা কেমন করিয়া তুমি বদনে তোল, কেমন করিয়া তোমার হস্ত ঐগুলি তোমার মুখে তুলিয়া দেয়?" উত্তর পাইলেন, "দিতে হয়,

সকলেই দেয়, সেই জন্য আমিও মুখে তুলে দেই, কেন দেই তাহা জানি না"। ইহাকেই বলে অন্ধ বিশ্বাস।

এই যে উপদেশ দিলাম, ইহাতে বিশ্বাস যাহার হইবে না সে কাহারও আদেশ মত হয়তো এই প্রকার দুই একটী উপদেশ পালনে দুই এক দিন একটু চেষ্টা ও যত্ন করিতে পারে; কিন্তু আদেশদাতা যদি খাঁটি হয়েন তবে আদেশবহও সেইরূপ খাঁটী হইতে চেষ্টা করিবে। তর্ক, বক্তৃতায় বা গায়ের জোরে কোন ফল হয় না, যদি ভিতরে খাঁটি জিনিষ টুকু না থাকে। বাক্‌পটুতা, বুদ্ধিমত্তা, তর্ক ও বক্তৃতার যথেষ্ট পরিচয় সর্ব্বদেশে সর্ব্বস্থানে পাওয়া গিয়াছে অর্থাৎ লোক খাঁটী না হইলে তাহার সেই বক্তৃতা বা বুদ্ধিমত্তা আশানুরূপ ফল দেয় না। শিক্ষক খাঁটি না হইলে কি ছাত্র কখন ভাল হইতে পারে? মহম্মদ এক দিন কোনস্থানে যাইবার সময় পথিমধ্যে দেখিলেন তাঁহার কতকগুলি শিষ্য সুরাপানে মত্ত হইয়াছে এবং অন্য কতগুলি সুরা পান করিতেছে। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা কি পান করিতেছ? শিষ্যেরা বলিল "ইহার নাম সুরা, খাইলে বেশ স্ফূর্ত্তি হয়, মন প্রফুল্ল হয়, উপাসনা বেশ ভাল হয়।" "তবে খাও" বলিয়া মহম্মদ চলিয়া গেলেন। প্রত্যাবর্ত্তন কালে সেইস্থানে আসিয়া দেখিলেন যে, শিষ্যেরা অজ্ঞান অচৈতন্য হইয়া কেহ বা রাস্তার উপরে কেহ বা নর্দ্দামায় নগ্ন হইয়া বা অৰ্দ্ধ উলঙ্গ হইয়া পড়িয়া আছে, কাহারও হুঁস্ নাই। তৎক্ষণাৎ তিনি আদেশ করিলেন "সুরাপান করিও না।" শিষ্যেরা"তথাস্তু"বলিয়া সেই দিন হইতেই

সুরা ত্যাগ করিল। তত্ত্বদর্শী মহম্মদের কথায় অথবা "মদ্যং অপেয়ং অগ্রাহ্যং" এই আমাদের তত্ত্বদর্শী ঋষির বাক্যে আপনার বিশ্বাস না হইতে পারে। কিন্তু বিজ্ঞান যদি বলে "সুরাপান অত্যন্ত কুফল জনক" তবে বিশ্বাস করিবেন। কিন্তু বিশ্বাস পর্য্যন্তই হইবে। বিশ্বাস অনুসারে কার্য্য হইবে না। কারণ, যে খাঁটী জিনিষ টুকুতে কার্য্য করাইবে তাহা শ্রোতা এবং বক্তা উভয়ের কাহারও ভিতরে নাই; ইহাকেই বলে ধর্ম্মহীন শিক্ষা। ধর্ম্মহীনের কথা যতই কেন যুক্তিপূর্ণ হউক ক্ষণেকের জন্য মন মুগ্ধ করিবে কিন্তু ফল ফলিবে না। এই প্রকার বিশ্বাসকে "মেনে লওয়া বিশ্বাস" বলা যায়।

কেহ হয় তো বলিবেন যে উপদেশ গুলি স্পষ্টতঃ বুঝাইবার জন্য মানব দেহের একটী চিত্র দেওয়া উচিত ছিল; শরীরের অভ্যন্তরস্থ প্রত্যেক যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাদের কার্য্য বর্ণনা করিলে ভাল হইত। এবং প্রত্যেক খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ বিচার করিয়া কোন্‌টী শরীরের উপযোগী কোন্‌টী নয় তাহা বিচার করিয়া খাদ্যদ্রব্যের একটি তালিকা দেওয়া উচিৎ ছিল। কিন্তু এ সকল বিজ্ঞানের কথা শিক্ষিত লোক মাত্রই অবগত আছেন। এ সম্বন্ধে আবশ্যকীয় কথা আহারের পরিমাণে বলিয়াছি; সমুদয় কথাগুলিই পরীক্ষা সাপেক্ষ; সুতরাং বিস্তারিত আলোচনা এবং বৃহৎ তালিকা দেওয়া বৃথা। এবং তালিকা দিলেও কোন ফল হইবে না। বরং বিপরীত ফল হইতে পারে। তালিকাতে লবণ, ঝাল, মসলা, আদা, পেয়াজ ও রসুন প্রভৃতি উত্তেজক

খাদ্য যাহা প্রত্যেক গ্রাসের সহিত উদরে প্রবেশ করিয়া রোগের বীজ অঙ্কুরিত করে, এবং যে সকল না হইলে এক দলা অন্নও মুখে উঠিবে না সেই সমুদয় এবং মৎস্য মাংস প্রভৃতি সর্ব্ব প্রকার আমিষ খাদ্যের উল্লেখ না দেখিয়া সকলেই বিরক্ত হইবেন; আবার তালিকায় দুগ্ধ ঘৃত দেখিয়া সেই মত খাইয়া অসুস্থ হইলে তালিকারই দোষ দিবেন। আসল কথা, রক্তের গতিরোধকারী কারণ সকলকে একে একে সরাইতে হইবে। ক্ষেত্র কণ্টক-শূন্য করিতে হইবে। কিন্তু অবস্থা এমনি প্রতিকূল যে তাহা একেবারে করিতে যাওয়া অসম্ভবপ্রায়। এক একটি কণ্টক কেমন আস্তে আস্তে তুলিয়া ফেলিতে হইবে তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি এবং যে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিব তাহাতেও ঐ কথা থাকিবে; তদ্দ্বারা কথঞ্চিৎ বিশ্বাস জন্মিতে পারে। কিন্তু পূর্ণ বিশ্বাস বা প্রত্যক্ষ বিশ্বাস উৎপাদন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে চর্ব্বণ করিয়া আহার শিখিতে হইবে, এবং তাহার পরে যেমন যেমন পথ দেখান হইয়াছে সেই মত চলিতে হইবে। অর্থাৎ ইহার ভিতরে প্রবেশ করিতে হইবে, নচেৎ বাহিরে থাকিয়া তর্ক করিলে আমি নাচার! কোন বাবুর বাটীতে গান বাজনা হইল, শ্রোতার মধ্যে অনেকে সন্তুষ্ট হইল; গান বাজনার প্রশংসা করিতে লাগিল এবং বাবুকে ধন্যবাদ দিতে লাগিল। বাবু বলিলেন, "আমি ও সব জানি, সব বুজরুকি, যেমন গাইয়ে গান ধরে অমনি সঙ্গে সঙ্গে একটা লোক বাজায়, অন্য কতগুলি লোক মাথা নাড়ে, কেহ হাত তালি দেয়, কেহ

"বা—আ" বলিয়া থাকিয়া থাকিয়া চিৎকার করিয়া উঠে; ও সমস্তই কারসাজি, পূর্ব্ব হইতেই উহারা পরামর্শ করিয়া আইসে"। গান বাজনা সম্বন্ধে শ্রোতাদের কথা বাবু বিশ্বাস করিলেন না। যে বাবু ওদিকে আদৌ প্রবেশ করেন নাই, উহার ধার দিয়া কখনও যান না, যাইতে ইচ্ছাও করেন না, সে বাবুর কেমন করিয়া বিশ্বাস উৎপাদন হয়? যিনি যে ভাবে চলিতেছেন তদনুরূপ একটী গণ্ডী অঙ্কিত করিয়া লইয়াছেন, সেই গণ্ডীর বাহিরে আসিতে কিছুতেই পারেন না। গণ্ডীর অনুযায়ী কিছু বলা হইলে তাহাতে বিশ্বাস হইলেও হইতে পারে। উপদেশ গুলি গণ্ডী অনুযায়ী দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে অবশ্য সন্দেহ নাই, কিন্তু গণ্ডী অনুযায়ী চলিয়া উপদেশের সুফলের আস্বাদ একটু পাইলে আপনিই গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়িবেন। ভিতরে যতটা নিরাপদ মনে করিয়া ছিলেন, গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া দেখিবেন তদপেক্ষা আরও নিরাপদে আসিয়াছেন, দেখিবেন, কোনপ্রকার রোগরূপী রাবণের আশঙ্কা নাই। প্রত্যেক উপদেশ পরীক্ষা করিতে বলিয়াছি। যেরূপ ভাবে পরীক্ষা করিতে বলিয়াছি তাহাতে কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা বা সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নাই। পরীক্ষা করিতে গিয়া যদি কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হয় তবে গোড়ার ২১টী প্রশ্নের উত্তর সহ পত্র লিখিলে অধীন অবশ্য নির্দ্দেশ করিয়া দিবে কিরূপ ভাবে চলা উচিত এবং কিরূপ ভাবে চলা উচিত নয়। সেই কথা মত যদি কার্য্য করিতে পারেন, দেখিবেন আপনার ব্যাধি

(যে রোগই হউক না কেন) আস্তে আস্তে দূর হইতেছে। নানা ধর্ম্মের নানা কথা এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে কতই উপদেশ শুনিতে পাওয়া যায়, কিন্তু "সত্য" এবং "সত্যকে ধরা" সকল ধর্ম্মের সার কথা; সেই একটীমাত্র কথা যদি আত্মগত করিতে পারা যায় তবে সকল ধর্ম্মই উপার্জ্জন হয়, তদ্দ্বারা ঈশ্বর লাভ হয়। সেই রূপ স্বাস্থ্যসম্বন্ধেও নানা মুনির নানা মত আছে, কিন্তু প্রত্যেক মুনিই এই এক কথা বলেন,

"ঔষধ বিনা ব্যাধি সুপথ্যেতে যায় দূরে,
পথ্যবিহীন রোগীর কাছে শত ঔষধ হারে।"

অবস্থার দোষে কতদূর পথ্য বিহীন হইয়াছেন তাহা চিন্তা করিয়া দৃঢ়তার সহিত যদি পথ্যের পথে আসিতে চেষ্টা করেন অর্থাৎ পূর্ব্বে যে সকল স্বাস্থ্যের নিয়ম বলা হইয়াছে সেই মত চলিতে পারেন তবে প্রত্যক্ষ দেখিবেন যে, শরীর ভাল হইতেছে, উপদেশ লইবার আর আপনার প্রয়োজন হইবে না।

এক্ষণে কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেওয়া আবশ্যক। কারণ, দৃষ্টান্তদ্বারা যেমন ফল হয় কেবল তর্ক যুক্তিপূর্ণ উপদেশে তত হয় না। পূর্ব্ব লিখিত উপদেশ গুলির স্বার্থকতা দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে চেষ্টা করি। প্রত্যেক দৃষ্টান্তে একটী করিয়া রোগীর রোগের অবস্থা থাকিবে। সেই রোগী অন্যান্য প্রণালীর চিকিৎসায় থাকিয়া কিরূপ ফল পাইয়াছে, এবং প্রাকৃতিক নিয়মে থাকিয়া কি প্রকার ফল পাইয়াছে, এই উভয় প্রকার ফল থাকিবে। বিচার করিয়া বুঝিতে পারিবেন কোন্‌টি ভাল। ইহাও বুঝাইবার চেষ্টা করিব

যে, না বুঝিয়া কোন স্রোতে গা ঢালিয়া দেওয়া ঠিক নয়। এই "গা ঢালিয়া দেওয়াই" অকাল মৃত্যুর হেতু।

একটী লোক বহুকাল হইতে শোথ রোগে ভুগিতেছিল; হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসিত হওয়ায় অবস্থা তত গুরুতর হইতে পারে নাই। কারণ, রোগের বিষের উপর ঔষধের বিষ শরীরে অধিক প্রবেশ করিতে পায় নাই। এই রূপ অবস্থায় প্রাকৃতিক নিয়মে চিকিৎসা আরম্ভ হইল। অনুত্তেজক এবং নিরামিষ আহার রুচি ও ক্ষুধা অনুসারে পরিমাণ মত ব্যবস্থা হইল; এবং তলপেট ধোয়া ও আবশ্যক মত ভাপড়ার ব্যবস্থাও হইল। তিন সপ্তাহ কাল মধ্যে শোথ আরাম হইল; কিন্তু চতুর্থ সপ্তাহে রোগীর শরীরের ভিতর গরম বোধ হইতে লাগিল। তাহার দুই দিন পরেই বেশি বেশি দাস্ত হইতে লাগিল। কালির মত কাল রংএর দাস্ত, অত্যন্ত দুর্গন্ধযুক্ত, আমাশয় বা কলেরায় যেরূপ দাস্ত হয় অনেকটা সেইরূপ দাস্ত ক্রমাগত তিন দিন ধরিয়া হইতে লাগিল। রোগীর পথ্যের যেরূপ ব্যবস্থা হইয়াছিল এবং আহারের পরিমাণ এতই অল্প, তাহাতে কেন যে ঐরূপ দাস্ত হইতেছিল তাহা কেহই বুঝিতে না পারিয়া চিকিৎসককে উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে গেল। চিকিৎসক অবস্থা শুনিয়া বলিলেন, "রোগী বাঁচিল! কেবল যে শোথ হইতে রক্ষা পাইল তাহা নয়, আজীবন অস্বাভাবিক আহার জনিত যে বিষ সঞ্চিত হইয়া দেহ মধ্যে ছিল তাহাও ঐ

শেষোক্ত উপসর্গ সহ বাহির হইয়া গেল।" এই অতিরিক্ত দাস্তে রোগী দুর্ব্বল হইল, কিন্তু ইহার পর হইতেই দিন দিন দেহ ভাল হইতে চলিল। এক্ষণে সেই লোক এত সুস্থদেহী যে, এরূপ সুস্থ শরীর তাহার গত ২০ বৎসরের মধ্যে ছিল না।

সিংহলদ্বীপের নিকটবর্ত্তী একটী দ্বীপে অবস্থান করিয়া কোন একটী লোক ২৪ বৎসর যাবৎ ব্যবসা বাণিজ্য করিতেছিল। সে বলিত,. এই ২৪ বৎসর তাহার কোন অসুখ হয় নাই; সামান্য একটু জ্বর মধ্যে মধ্যে হইত, চক্ষু ফুলিত, এবং পায়ে একটু ঘা হইত। এ সমুদয় রোগ সে সামান্য জ্ঞান করিত। কিন্তু ঐ সকল উপসর্গেই জানা যাইতেছে যে, সঞ্চিত বিষ সমস্ত দেহে ছড়াইয়া আছে। কিছু কাল পরে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে বাম কর্ণের নিকট অত্যন্ত ফুলিয়া উঠিল। উহা ঔষধ-বিষ দ্বারা বসাইয়া দেওয়া হইল, কিন্তু কিছু দিন পরে ঐ বিষ আর এক আকারে বাহির হইল, একটী অঙ্গুলি অত্যন্ত ফুলিল, পূঁজ এত অধিক হইল যে, তাহা অস্থি স্পর্শ করিল। অঙ্গুলি ভাল হইতে না হইতে মলদ্বার দিয়া অত্যন্ত রক্ত নির্গমন হইতে লাগিল। ইহাতে জানা গেল যে, অর্শের গুটি সকল কাটিয়াছে। ইহার অল্পদিন পরে বাম পদতলে একটী পচা ঘা হইল। তাহাতে অত্যন্ত পূঁজ হইতে লাগিল। হাত পা সর্ব্বদাই ঠাণ্ডা থাকিত! ঘর্ম্ম শীতল এবং প্রায়ই জ্বর-জ্বর-ভাব হইত। এই সকল উপসর্গ দ্বারা বুঝা যায় যে, রোগের মূল অনেক নিম্নে

আছে, যাহার নানা উপসর্গ বাহিরে প্রকাশিত হইতেছে। তিন বৎসর যাবৎ এই প্রকার কষ্ট দায়ক উপসর্গ হয়! তার পর জ্বর একটু বেশি মাত্রায় হইল, জ্বরের বেগ কতিপয় দিন ধরিয়া চলিল, কমিল না। চিকিৎসক কুষ্ঠ রোগের সূচনা বিবেচনা করিয়া রোগীকে স্বদেশে অর্থাৎ ইউরোপে যাইতে বলিলেন। দুই মাস পরে রোগী স্বদেশে গেল। তথায় রোগ পরীক্ষায় জানা গেল যে, রক্তের দোষ হইয়াছে। রীতিমত চিকিৎসা হইতে হইতে রোগীর দক্ষিণ বাহুতে একটী লাল দাগ দেখা দিল। ঔষধ প্রয়োগে উহা কমিল বটে কিন্তু দাগটী একেবারে মিটিল না! এই চিকিৎসার পর রোগী আপনাকে কিঞ্চিৎ সবল বোধ করিল। কিন্তু শরৎকালে আরও লাল লাল দাগ শরীরে বাহির হইল। এক বৎসর পরে কর্ম্মস্থানে গেল; তথায় অত্যন্ত ঘর্ম্ম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দাগ ক্রমে মিটিয়া গেল। চিকিৎসক বলিলেন যে, স্থান পরিবর্ত্তনে বিশেষ উপকার হইয়াছে; এতদপেক্ষা অধিক আশা করা যায় না। কিন্তু কিছু দিন পরে হৃদ্‌পিণ্ডের গতি খারাপ বোধ হইতে লাগিল; জ্বর অত্যন্ত অধিক হইল, চিকিৎসকের উপদেশ মত দুই বৎসর পরে আবার ইউরোপে গেল। ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইতেছে যে, ব্যারামের মূল কারণ দূরীভূত হয় নাই। ইউরোপে থাকিয়া রীতিমত চিকিৎসা হইতে লাগিল। শরৎকালে সমস্ত দেহে খুব বেশি ও খারাপ রকমের লাল দাগ দেখা দিল তাহাতে বুঝা যাইতেছে যে বিষ ক্রমে ক্রমে অত্যধিক মাত্রায় সঞ্চিত হইয়াছে। লাল দাগ এবং অন্যান্য উপসর্গ

সমুদয়ের কারণ বুঝিতে না পারিয়া চিকিৎসকগণ রোগীকে বলিলেন "রোগ অসাধ্য, এক্ষণে যদি আপনিই সারে তবেই ভাল, নচেৎ অন্য উপায় নাই"। রোগ সকল এক্ষণে বিরাট মূর্ত্তিতে দেখা দিয়াছে। রোগীও খুব নিরুৎসাহ হইয়াছে। দশ বৎসর চিকিৎসার এই ফল! ক্ষুণ্ণ মনে, শূন্য প্রাণে, কার্য্যের অনুরোধে পুনরায় কর্ম্মস্থানে গেল। তিন বৎসর যাবৎ রোগীর ঘর্ম্ম হয় নাই। এক্ষণে গ্রীষ্ম প্রধান দেশে আসিয়া কোন কোন দিন অল্প অল্প ঘর্ম্ম বাহির হইত। হৃদ্‌রোগ বেশি রকম হইল। জ্বর হইতে লাগিল এবং রোগী ক্রমে ক্রমে দুর্ব্বল হইতে চলিল এবং পায়ে শোথও নামিল। কর্ম্মস্থানের চিকিৎসকগণ কুষ্ঠ রোগ স্থির করিলেন, কারণ, কুষ্ঠ রোগের বিশেষ পারদর্শী চিকিৎসক রোগীকে ইউরোপে থাকিয়া চিকিৎসার সময় পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, রক্তে কুষ্ঠ রোগের বীজ আছে। কর্ম্মস্থানের চিকিৎসকগণ ছোঁয়াচের ভয়ে রোগীকে পুনরায় ইউরোপে যাইতে বলিলেন। রোগীর সহযাত্রীগণ মনে করিয়াছিল যে, রোগী ইউরোপ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই মরিবে। কিন্তু সমুদ্রের হাওয়ায় একটু উপকার হইল, কোন প্রকারে জীবিত অবস্থায় রোগী স্বদেশে পৌঁছিল। তথাকার চিকিৎসকগণ বলিলেন যে রোগ অসাধ্য, আরোগ্য হইবে না। এই সময়ে রোগীর চেহারা দেখিলে আপনি মনেও করিবেন না যে, কোন প্রকার রোগ ঐরূপ চেহারায় থাকিতে পারে। বেশ 'মোটা-সোটা' চেহারা, ঘাড়ে গর্দ্দানে এক হইয়াছে। বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে

পারা যায় যে, ঘাড়ে একটু আবের মতও হইয়াছে, এবং কপাল ও চক্ষু একটু ফোলা ফোলা, এবং দুই পায়ে শোথও হইয়াছে। বিষময় পদার্থ সমস্ত শরীরে সমভাবে ছড়াইয়া আছে। মল এবং প্রস্রাব দেখিয়া জানা গেল যে, পরিপাক ক্রিয়া একেবারে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে। হৃদ্‌রোগে রোগী দিবা রাত্রি অস্থির। হাত পা বরফের মত শীতল, এবং ঈষৎ নীলবর্ণ হইয়াছে। এই সময় হইতে প্রাকৃতিক চিকিৎসা আরম্ভ হইল। ক্ষুধামত অনুত্তেজক আহারের ব্যবস্থা হইল; এবং তলপেট ধৌত করা ও আবশ্যক মত ভাপড়া দেওয়া হইতে লাগিল। পরিপাক ক্রিয়া পূর্ব্ব অপেক্ষা ভাল হইল। যে রোগীর পিচ্‌কারী ব্যতীরেকে দাস্ত হইত না, তাহার দাস্ত সহজে হইল। মূত্র যন্ত্রের ক্রিয়া তৃতীয় দিবস হইতে সুচারু রূপে হইতে লাগিল। এই সময় প্রস্রাব দেখিলেই বুঝা যাইত যে প্রস্রাবের সাহিত রোগের বীজ বাহির হইতেছে। কারণ যে প্রস্রাব পূর্ব্বে পরিস্কার ছিল এক্ষণে তাহা অপরিষ্কার অর্থাৎ ঘোলাটে। প্রচুর পরিমাণ ঘর্ম্মের সহিত আরও রোগের বিষ বাহির হইয়া যাইতে লাগিল। এই বিষ নির্গত হওয়ায় সুস্থতা আসিল। কিন্তু সেই সঙ্গে কিঞ্চিৎ ক্লান্তি অনুভবও হইত। দক্ষিণ পদ আরও ফুলিল, তাহাতে বুঝা গেল যে, সঞ্চিত বিষ স্থান চ্যুত হইয়া বেগে রোগরূপে বাহির হইতেছে। রোগী এই সমুদয় পরিবর্ত্তন সহ্য করিতে পারিয়াছিল, কারণ তাহার জীবনীশক্তি অনেকটা সতেজ ছিল। অধিক অঙ্গচালনা বা ভ্রমণ করিবার ক্ষমতা রোগীর ছিল না; এই অবস্থায়

তলপেট ধৌত করায় এবং ভাপড়া দেওয়ায় শোথের স্থান দিয়া অত্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গত হইত। তদ্দ্বারা বুঝা যায় যে, রোগ বাহির করিয়া দিবার উপযুক্ত জীবনীশক্তি রোগীর দেহে ছিল। চারি সপ্তাহে সমস্ত জল বাহির হইয়া গেল। ইহার পর হইতেই সত্বর আরোগ্য লাভ হইতে লাগিল। শরীরে স্ফূর্ত্তি আসিল। চারি-মাস এইরূপ চিকিৎসা করিয়া সম্পূর্ণ আরোগ্য হইয়া চেহারার এতই পরিবর্ত্তন হইল যে, পূর্ব্বে যাহারা দেখিয়াছে, এক্ষণে তাহারা তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারে না। হৃদ্‌রোগ এবং শোথ সমূলে উৎপাটিত হইয়াছে, এবং রোগীর মনে প্রফুল্লতা আসিয়াছে। কর্ম্মস্থানের বন্ধুবান্ধবগণ এই অত্যাশ্চর্য্য আরোগ্য সংবাদ বিশ্বাস করেন না; তাঁহারা বলেন, কুষ্ঠরোগের পারদর্শী চিকিৎসক যত দিন অনুমতি না দিবেন তত দিন রোগী কর্ম্মস্থানে আসিতে পাইবে না। এই মর্ম্মের পত্র পাইয়া রোগীকে চারি সপ্তাহ যাবৎ উক্ত পারদর্শী চিকিৎসকের নিকট দেহ পরীক্ষা করাইতে হইয়াছিল, তাহাতে জানা গেল যে, কুষ্ঠের বীজ শরীরে বা রক্তে আদৌ নাই। তখন অনুমতি পাইয়া কর্ম্মস্থানে গেল। এই দৃষ্টান্তেই প্রচলিত প্রণালীর চিকিৎসার অসারতা বুঝিতে পারিবেন, এবং আরও কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি যদ্দ্বারা উহার অসারতা সম্যকরূপে উপলব্ধি হইবে।

পঁয়ষট্টি বৎসর বয়স্কা একটী স্ত্রীলোকের অত্যন্ত হাঁপানি ছিল। চিকিৎসক ঔষধের গুলি, গোলা, এবং আরক পুরিয়া

ও তেল প্রভৃতি বহু প্রকার ঔষধ বহুকাল ধরিয়া প্রয়োগ করিয়া কিছুই করিতে পারিলেন না। অবশেষে পরিপাক ক্রিয়া এতই বিপর্য্যস্ত হইয়া গেল এবং সেই সঙ্গে স্বাস্থ্যও এত ভগ্ন হইল যে, জল, বায়ু এবং স্থান পরিবর্ত্তনের ব্যবস্থা করিতে হইল। শ্বাস প্রশ্বাস লইতে রোগীর এত অধিক কষ্ট হইত যে, সে দশ পদও চলিতে পারিত না। প্রচলিত প্রণালীর চিকিৎসার বিষয় যাঁহারা অবগত আছেন তাঁহারা বুঝেন যে, রোগীকে জল, বায়ু এবং স্থান পরিবর্ত্তনের কথা বলিলে জানিতে হইবে রোগের আর ঔষধ নাই, রোগ অসাধ্য। উক্ত রোগীও সেইরূপ বুঝিয়া এবং বিদেশে মৃত্যু হওয়া অপেক্ষা স্বদেশে মৃত্যু হওয়াই ভাল এই মনে করিয়া স্থান পরিবর্ত্তন করিল না। এই সময়ে কোন বন্ধুর প্ররোচনায় সে প্রাকৃতিক নিয়মে চিকিৎসা আরম্ভ করিল; প্রাকৃতিক চিকিৎসকের প্রত্যেক ব্যবস্থা ঠিক ঠিক পালন করিতে লাগিল। অনুত্তেজক আহার, তলপেট ধৌত করণ এবং আবশ্যক মত ভাপ্‌ড়া লওন এই সমস্ত হইতে লাগিল। এবং এই রূপ ভাবে চিকিৎসিত হইতে হইতেই রোগের বিষ মল মূত্র ঘর্ম্ম রূপে অধিক পরিমাণে নির্গত হইতে লাগিল। প্রচলিত প্রণালীতে চিকিৎসিত হইবার সময় রোগ ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইয়া যে যে উপসর্গ আনয়ণ করিয়াছিল এক্ষণে রোগ আরোগ্য হইবার কালে সেই সকল উপসর্গ ক্রমে ক্রমে ও ক্ষীণ ভাবে দেখা দিয়া একেবারে বিলুপ্ত হইল। তিন মাসের মধ্যে হাঁপানি রোগ আরোগ্য হইল। ৬০ বৎসর বয়স্ক আর

একটী লোক ঐ রোগে অন্যান্য চিকিৎসায় হতাশ হইয়া এবং ঔষধে জীর্ণ-কলেবর হইয়া প্রাকৃতিক চিকিৎসায় এক বৎসরের কিছু অধিক কালের মধ্যে আরোগ্য হইয়াছে। সবিশেষ বিবরণ প্রায় উপরোক্ত রোগীর মত।

সত্তর বৎসর বয়স্ক একটী যুবক বাল্যকাল হইতে অজীর্ণ রোগে অশেষ কষ্ট পাইয়া প্রাকৃতিক চিকিৎসকের নিকটে যাইয়া জানাইল যে, ১১ বৎসর বয়স হইতে অর্শ ও রক্তস্রাবের যাতনা পাইতেছে। ১৫ বৎসর বয়সের সময় অর্শ ও রক্তস্রাব বন্দ হওয়ার পরেই ভয়ানক রকম শিরঃপীড়া বা মাথাধরা রোগ হয়। কোন ঔষধেই কোন ফল হয় নাই। অবশেষে মস্তকের পশ্চাদ্ভাগে সুপারির মত শক্ত শক্ত মাংসের গুঠলি দেখা দিয়াছে, হাত দিলে সে গুলি বেশ অনুভব হয়। সেই সময় হইতে মস্তকের আকার পরিবর্ত্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। প্রত্যেকেই তাহাকে দেখিলে বুঝিত যে, তাহার মাথার মধ্যে কোন প্রকার বিপরীত পদার্থ অতিরিক্ত সঞ্চিত হইয়া মস্তকটী দেহের অননুরূপ করিয়াছে। কিন্তু কেহই জানিত না অথবা মনেও ভাবিত না যে, কুচিকিৎসার কারণ বশতঃ দেহ-মধ্যস্থিত অর্শের ছোট ছোট গুটী বা বলি এক্ষণে বড় ও শক্ত আকারে মস্তকে অধিষ্ঠান করিয়াছে; অবয়ব-বিজ্ঞান যাঁহারা বিশেষরূপে অবগত আছেন তাঁহারা এক রোগের নানারূপে আবির্ভাব কিরূপে চিকিৎসার দোষে হইয়া থাকে তাহা সহজেই বুঝিতে পারেন। যাহা হউক, উক্ত রোগী মাথার জ্বালায় কার্য্যে অপটু হইল এবং সময় সময় মূর্চ্ছা যাইত।

এই অবস্থায় প্রাকৃতিক চিকিৎসা আরম্ভ হইল। ক্ষুধা অনুসারে অনুত্তেজক আহার, শীতল জলে তলপেট ধৌত করা, এবং শক্তির অনুরূপ ব্যায়ামের ব্যবস্থা হওয়ায় সত্বর সুফল ফলিল। প্রথম সপ্তাহেই শিরঃপীড়া গেল। মস্তকাস্থিত সুপারির মত মাংসের গোটা যখন ক্রমে ক্রমে ভাঙ্গিতে লাগিল তখনি সময় সময় মাথায় একটু ব্যথা অল্প কালের জন্য অনুভব হইত। পরিপাকক্রিয়া ক্রমেই ভালরূপে হইতে লাগিল, এবং সেই সঙ্গে ক্ষুধাও বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দুই মাস চিকিৎসার পরে মস্তকের পশ্চাতে স্পর্শদ্বারা বিশেষ রূপ বুঝা গেল যে, মাংসের গোটা ছোট হইয়া গিয়াছে, এবং আরও দুই মাস পরে তাহা আরও ছোট হইয়া গেল। মস্তকটীও ক্রমে ক্রমে দেহের অনুরূপ হইতে লাগিল; এবং ছয় মাসেই নির্দ্দোষ হইয়া গেল। ইহার পরেই হঠাৎ আবার গুরুতর উপসর্গ দেখা দিল। যে অর্শ ও রক্তস্রাব কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে বন্ধ হইয়া গিয়াছিল তাহাই এক্ষণে পুনরায় ষোল কলায় দেখা দিয়াছে। রোগীর জননীকে বুঝান হইল এবং তিনিও বুঝিলেন যে, এ উপসর্গটী অনিবার্য্য। যে-হেতু মস্তকের রোগটী এই প্রণালীর চিকিৎসায় ক্রমে ক্রমে উৎপত্তি স্থানে যাইয়া বিলীন হইবার পূর্ব্বে সামান্য রকম অর্শের আকার অর্থাৎ প্রথমাবস্থার আকার ধারণ করিয়াছে; এবং সেই সামান্য রকম অর্শই উপেক্ষিত হইয়া বা চিকিৎসার দোষে মাথার ব্যারামে পরিণত হইয়াছিল। এক বৎসর চিকিৎসার পর সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ হইল।

একটী স্ত্রীলোকের স্তনে কর্কট-বিস্ফোটক (cancer) রোগ হয়; তাহাতে বাম স্তনটী কাটিয়া ফেলিতে হইয়াছিল, এবং রোগীও ঐরূপ অস্ত্রচিকিৎসার পর কিছুকাল ভাল ছিল। তদ্দ্বারা অস্ত্র চিকিৎসার চরমোৎকর্ষ অবশ্যই প্রমাণীকৃত হইয়াছিল। কিন্তু কিছু কাল পরে দক্ষিণ স্তনে ঐ রোগ আক্রমণ করায় অস্ত্র চিকিৎসার অসারতা কিরূপে প্রমাণ হয় তাহা শ্রবণ করুন। রোগীর শরীর এক্ষণে পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইয়াছে। অস্ত্র-চিকিৎসককে রোগ দেখান হইল। অনেকক্ষণ পরীক্ষার পর স্থির হইল যে, দক্ষিণ স্তনটীও ছেদন করিতে হইবে; কিন্তু রোগী এক্ষণে এতই দুর্ব্বল যে, অস্ত্র প্রয়োগ করিবার পর মৃত্যু হইবার খুব সম্ভাবনা; অথচ উপস্থিত ক্ষেত্রে আরোগ্য হইবার অন্য কোন উপায়ও নাই। এমত অবস্থায় প্রাকৃতিক চিকিৎসা ব্যতীত আর কি হইবে? দক্ষিণ স্তনের মধ্যে পচিয়াছে, এবং শক্ত শক্ত গুঠ্‌লি তথা হইতে বগল পর্য্যন্ত হইয়াছে। তলপেটেও ঐ প্রকার বড় বড় মাংসের গুঠ্‌লি হইয়াছে। পরিপাক ভাল হইত না; ৩।৪ দিন অন্তর এক দিন পিচকারী দ্বারা দাস্ত করাইতে হইত; শক্ত এবং কাল রংএর গোলাকার কঠিন মল ঐরূপে বাহির করিতে হইত; প্রস্রাব খুব কম হইত। জীবনীশক্তির হীনতা অতীব চিন্তার কারণ হইল এবং তাহাও অত্যন্ত শিরঃ পীড়া বশতঃ দিন দিন হ্রাস হইতে লাগিল। এমত অবস্থায় রোগী প্রাকৃতিক চিকিৎসকের ব্যবস্থা দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের সহিত পালন করিতে লাগিল। শিরঃ পীড়া শীঘ্রই কমিল। পরি-

পাকশক্তি প্রতিসপ্তাহে ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। রোগীর অবস্থা ও বল বিশেষরূপ বিবেচনাপূর্ব্বক স্নান এবং তলপেট ধৌত করার ব্যবস্থা প্রত্যহ করিতে হইত। ছয় সপ্তাহ এইরূপ কষ্টে অতিবাহিত হইল। এই সময়ের মধ্যেই অস্ত্র চিকিৎসার অসারতা বিশেষ রূপে পরিস্ফুট হইতে লাগিল। ইতিপূর্ব্বের চিকিৎসার বাম স্তনটী ছেদন করিয়া রোগীকে অঙ্গহীনা করিয়া অস্ত্র চিকিৎসক যে স্থানে জন্মের মত দাগ করিয়া দিয়াছেন, সেই স্থানে প্রথম সপ্তাহেই একটী পচা ঘা হইল; তাহা ক্রমে ক্রমে আয়তনে ও গভীরতায় বাড়িতে লাগিল, এবং উহা চারি সপ্তাহ পরে প্রায় ১৫ বর্গ ইঞ্চ আয়তন বিশিষ্ট হইল। ঐ ক্ষতস্থান যেমন যেমন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল সেই সঙ্গে দক্ষিণ স্তনের ভিতরের রোগ ক্রমে ক্রমে কমিতে লাগিল। ইহাতেই বুঝা যায় যে, বামস্তনছেদনে রোগের মূল উৎপাটিত হয় নাই। সঞ্চিত বিষ যে স্থানে রোগের আকার ধরিয়া বাহির হইয়াছিল সেই স্থানে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া রোগের একটী শাখা মাত্র ছেদন করা হইয়াছিল, রোগের মূল যেমন তেমনি ছিল, এবং সেই মূলের সাহায্যে পুনরায় এক্ষণে দক্ষিণ স্তনটীও রোগযুক্ত হইয়াছে; জঙ্গল পরিস্কার করিতে গিয়া বৃক্ষলতা গুল্মাদির মূল উৎপাটিত না করিয়া কেবল মাত্র সমভূমি করিয়া উহাদিগকে কর্ত্তন করিলে মূলের সাহায্যে যেমন পুনরায় জঙ্গলের সৃষ্টি হয়, এখানেও ঠিক তাহাই হইয়াছে, এবং প্রত্যেক রোগীর বিশেষতঃ পুরাতন রোগীর চিকিৎসার দোষে ঠিক এই রূপ অবস্থা

হইতেছে কি না তাহা বিশেষ রূপ চিন্তা করিয়া বুঝিবেন। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় আরোগ্য হইবার সময় উক্ত রোগীর রোগের স্তর ক্রমে ক্রমে প্রকাশিত হইয়া বিলুপ্ত হইতে চলিল। সুতরাং বাম স্তনে রোগটী দেখা দেওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নয়; কারণ রোগের বিষ যে পথ ধরিয়া শাখা বিস্তার করিতেছিল আরোগ্যের সময় ঠিক সেই পথে ফিরিয়া উৎপত্তি স্থানে যাইয়া বিলীন হইবে; উক্ত রোগীর রোগের ক্রমিক অবস্থা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রকৃতিদেবী অস্ত্র চিকিৎসকের যথেচ্ছা-চারিতা সহ্য করেন না। ঔষধ প্রয়োগ অপেক্ষা অস্ত্র প্রয়োগ আরও অধিকতর অস্বাভাবিক! কিন্তু অস্ত্র প্রয়োগ বা ঔষধ প্রয়োগ অর্থাৎ প্রচলিত প্রণালীর চিকিৎসা এমনি আপাতমধুর যে, উহার পরিণাম মানুষ এতকাল ভাবে নাই, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতে এই পরিণাম-সমষ্টি এতই গুরুতর চিন্তার বিষয় হইয়াছে যে, তথাকার মনীষীগণ ৫০। ৬০ বৎসরের গবেষণায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, এক মাত্র প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘণ সকল রোগের কারণ, সুতরাং একমাত্র প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বন ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অস্বাভাবিক উপায়ে রোগ দমন হয় না। প্রাকৃতিক চিকিৎসায় থাকার কালে উক্ত রোগীর বগলের সেই শক্ত মাংসের গুঠ্লি নরম হইয়া গেল, এবং অবশেষে তলপেটের উপর ঘা হইল। প্রথম দুই মাস ভুষিযুক্ত আটার রুটি এবং ফল খাইতে দেওয়া হইয়াছিল। ঐ পথ্যের সহিত তলপেট ধৌত করায় তিন মাসে

বুকের এবং বগলের রোগ আরোগ্য হইল। তখন সেই রোগী চিকিৎসকের নিকট বিদায় লইয়া স্ব-গৃহে যাইয়া প্রাকৃতিক চিকিৎসকের ব্যবস্থা মত থাকিয়া কিছু দিন পরে আরোগ্য লাভ করিল।

একটী ৩০ বৎসর বয়স্কা স্ত্রীলোকের দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে রোগ হয়। গুরুতর আঘাত পাইয়া অঙ্গুলি ফুলিয়াছিল, চিকিৎসার দোষে ক্রমশঃই খারাপ হইতে চলিল, এবং শেষে অগ্রভাগে একটু মাংস বৃদ্ধি হইল। চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ তাহা কাটিয়া ফেলিলেন এবং ঔষধ ও বিষ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া পোড়াইয়া দিলেন। এ সমুদয়ই নিস্ফল হইল, কারণ যতবার কাটিয়া ফেলা যায় তত বারই মাংস বৃদ্ধি হয়। অবশেষে অঙ্গুলির মধ্যে পচিতে আরম্ভ হইল, তখন চিকিৎসক বলিলেন যে, রোগ হাড়ে ঠেকিয়াছে অতএব উহার আর বিস্তার না হইতে পারে সেই জন্য অঙ্গুলিটী ছেদন করিতে হইবে। অঙ্গুলি কাটীয়া ফেলিতে হইবে শুনিয়া রোগী অসন্তুষ্টা হইল, এবং প্রাকৃতিক চিকিৎসকের নিকট গেল। চিকিৎসক বুঝাইলেন যে রোগটী সমূলে নির্ম্মূল করিতে হইলে রোগের মূলস্থানে অর্থাৎ উৎপত্তি স্থানে চিকিৎসা করিতে হইবে। রোগের ডাল পালা ছাঁটিলে বা ডাল পালায় ঔষধ দিলে রোগ দূর হইবে না। রোগীও সেইরূপ বুঝিল। সুতরাং ব্যবস্থা হইল যে, দিবসে তিনবার অথবা চারিবার তলপেট

ধৌত করিতে হইবে, অর্দ্ধ ঘণ্টা ধরিয়া প্রত্যেক বার ধৌত ক্রিয়া করিতে হইবে; নিরামিষ ও অনুত্তেজক আহার করিতে হইবে; এবং প্রথম ৩।৪ দিন তলপেট ধৌত করিবার পূর্ব্বে অঙ্গুলিতে ভাপড়া প্রয়োগ করিতে হইবে। স্ত্রীলোকটীর গর্ভাবস্থা; সুতরাং তলপেট ধৌত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিল। প্রাকৃতিক চিকিৎসক বলিলেন যে, উপরোক্ত ব্যবস্থা ব্যতীত অন্য ঔষধ নাই। ঐরূপ নিয়মে না থাকিতে পারিলে অঙ্গুলি ছেদন অনিবার্য্য। তখন অনোন্যপায় হইয়া সেইরূপ করিতে হইল। আরাম অতি শীঘ্র হইতে লাগিল। প্রথম স্নানের পরে মাংসবৃদ্ধি হওয়া বন্দ হইল; তৃতীয় দিনে বর্দ্ধিত মাংস পুঁজে পরিণত হইতে লাগিল। ১৪ দিনে বেদাগ আরাম হইল।

অপর দুইটী বালিকার ঐরূপ রোগ হওয়ায় একটী বালিকা অস্ত্রচিকিৎসকের দ্বারা অঙ্গুলিটী কাটাইয়া বিষ প্রভৃতি প্রয়োগ করিয়া ক্ষতস্থান আরোগ্য করিল। বালিকাটীর ঐ প্রকার চিকিৎসায় অতিশয় যাতনা ভোগ করিতে হইয়াছিল, এবং সপ্তাহ কাল পরে, বিশেষ আবশ্যক হইলে অতিকষ্টে কাজ কর্ম্ম করিতে পারিত। বহুকাল পর্য্যন্ত প্রত্যেক ঋতুপরিবর্ত্তন বা সাময়িক পরিবর্ত্তনের সময় বালিকার অঙ্গুলিতে অতিশয় যাতনা অনুভূত হইত, ইহার কারণ অবশ্য ভুল চিকিৎসা এবং বিষ প্রয়োগে রোগটীকে চাপিয়া রাখা। ঐ বয়সের এবং ঐ রূপ শক্তি সম্পন্না অপর বালিকাটী প্রাকৃতিক চিকিৎসা মতে ক্ষত অঙ্গুলিতে জলপটি ঢল করিয়া বাঁধিয়া রাখিল। তাহার শরীরে

রোগের বিষ অতিরিক্ত সঞ্চিত থাকায় জলপেট্ট ধৌতকরার ব্যবস্থাও হইল। তৃতীয় দিনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড পুঁজের মত হইয়া বাহির হইয়া পড়িল, তাহাতে রোগীর কোন কষ্টই হইল না। ষষ্ঠ দিনে বৃহৎ খণ্ডটী বাহির হইল। এক মাস পরে কাজ কর্ম্ম করিতে সমর্থা হইল। ছয় সপ্তাহে রোগটী বিনাকষ্টে বেদাগ আরাম হইল! পূর্ব্বোক্ত বালিকার ন্যায় অঙ্গুলি ছেদন করিয়া অঙ্গহীনা হইতে হইল না, এবং ঋতুপরিবর্ত্তনের সময় পূর্ব্বোক্ত বালিকার ন্যায় কষ্টও হইত না। এক্ষণে ঔষধ কিম্বা অস্ত্রকে ভাল চিকিৎসক বলিবেন,না প্রকৃতিদেবীকে ভাল চিকিৎসক বলিবেন?

পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক একটি লোকের পায়ে এবং পায়ের পাতায় পচা ঘা হয়। হাঁটু পর্য্যন্ত সেই ঘা বিস্তার করে। অতিশয় দুর্গন্ধময় এবং অনবরত পুঁজ পড়ে। ঔষধ প্রয়োগে কতক কতক ভাল বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু এতই 'গুড় গুড়' করে যে, না চুলকাইয়া থাকিতে পারে না এবং চুলকাইলেই আবার ঘা হয়। ঘা থাকা পর্য্যন্ত কণ্ডুয়ন স্পৃহা হয় না। পায়ের নিম্ন অংশ ঘোর বাদামি রং ধরিয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে ভিতরে পচিয়াছে। কতকগুলি ঘা অস্থি স্পর্শ করিয়াছে। যত প্রকার চিকিৎসা হইতে পারে তৎ সমুদয়ই হইয়াছে, তাহার ফল স্বরূপ এক্ষণে পা ছেদন ব্যতীত গত্যন্তর নাই; কারণ ঐ পচা ঘা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া মৃত্যু ঘটাইবে। রোগীর প্রাকৃতিক চিকিৎসায় ৬৩

বিশ্বাস ছিল না, কিন্তু অন্য উপায় না দেখিয়া অবশেষে ঐ চিকিৎসা করিতে হইল। প্রাকৃতিক চিকিৎসক দেখিলেন যে, রোগীর পরিপাক শক্তি একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতি লঘু আহারও জীর্ণ হইতেছে না; ফুস্ফুসের ক্রিয়াও ভাল হইতেছে না; বিষময় পদার্থ দেহে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সঞ্চিত হইয়াছে এবং পরিপাকযন্ত্র ও ফুস্ফুস্ ভালরূপে ক্রিয়া করিতে পারিতেছে না, সুতরাং অতি সামান্য ও লঘু আহার দেওয়া সত্ত্বেও প্রত্যহ কিছু কিছু রোগের বিষ নূতন রূপে সঞ্চিত হইয়া পুরাতনের সহিত যোগ হইতেছে। সর্ব্ব প্রথমের অজীর্ণ রোগ উপেক্ষিত হইয়া রোগের বিষ অত্যধিক সঞ্চিত হওয়ায় পায়ে রোগ ধরিয়াছে সে জ্ঞান রোগীর নাই। সেই জন্য সে বুঝিতে পারিত না কি নিমিত্ত সমুদয় দেহের উপর চিকিৎসা হইতেছে; অর্থাৎ ঘার উপর জলপটি ও পশমী বস্ত্রখণ্ডদ্বারা চল করিয়া বাঁধিয়া রাখার ব্যবস্থা ব্যতীত কি নিমিত্ত প্রাকৃতিক চিকিৎসক অনুত্তেজক আহার, বিশুদ্ধ বায়ু, চারিবার করিয়া তলপেট ধৌত করা এবং যাহাতে স্বাভাবিক রূপে ঘর্ম্ম নির্গত হয় তাহার ব্যবস্থা করিতেছেন রোগী তাহা বুঝে না। সুতরাং সে কেবল মাত্র জলপটীর দিকে লক্ষ্য করে, অন্যান্য পথ্যগুলির উপর তাহার তত লক্ষ্য নাই। সুতরাং ছয় মাসেও রোগের বিশেষ উপসম হইল না। অবশেষে বে-গতিক দেখিয়া নিজের ইচ্ছামত আর না চলিয়া প্রাকৃতিক চিকিৎসকের আজ্ঞামত নিয়ম পালন করিতে লাগিল। পরের ছয় মাসে বেশ উপকার হইল। ঘাগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র হইতে

লাগিল, এবং ছোট ছোট ঘা সকল একেবারেই সারিয়া গেল। কণ্ডূয়ন বোধ বা স্পৃহা আর হইল না, এবং পুঁজ হওয়াও বন্ধ হইল। সুতরাং স্বাস্থ্য একটু ভাল হইল। পরিপাক শক্তিও কিঞ্চিৎ বাড়িল, এবং ফুসফুসের অবস্থাও আর খারাপ হইতে পারিল না। এই সমুদয় শুভ সূচনা দেখিয়া রোগী এক্ষণে দৃঢ়তার সহিত সমুদয় প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করিতে লাগিল। দ্বিতীয় বৎসরে ঘাগুলি হাঁটুর নিম্নদেশ ছাড়িয়া উপরে উঠিল। নিম্নের ঘা গুলি আরাম হইতেছে এবং হাঁটুর উপরে নূতন করিয়া হইতেছে। এইরূপে রোগটী উৎপত্তি স্থানের নিকট অর্থাৎ তলপেটের দিকে যাইতেছে, তথায় যাইয়া সমূলে নির্ম্মূল হইবে। এক্ষণে পায়ের আকার স্বাভাবিক হইতে লাগিল। নিম্নের ঘা সকল আরাম হইয়া যখন হাঁটুর উপরে নূতন করিয়া ঘা হইতে লাগিল, তখন রোগী বলিল যে, প্রাকৃতিক চিকিৎসায় কোন ফল হইতেছে না, কারণ ঘা সকল তাহার দেহের (অর্থাৎ ধড়ের) নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সে মনে করিল যে, তাহার সমস্ত দেহে এক্ষণে ঘা হইবে, তাহা অপেক্ষা পায়ের ঘাই ত ভাল ছিল। কিন্তু চিকিৎসক যখন বুঝাইলেন যে, রোগ উৎপত্তি স্থানে গিয়া বিলীন হইবে তখন সে বুঝিল এবং তাহা চক্ষেও দেখিল। পূর্ণ তিন বৎসর চিকিৎসার পরে সম্পূর্ণরূপ আরোগ্য হইল; এবং পুনরায় ঘা হইবার সূচনা অদ্য পর্য্যন্ত দেখা যায় নাই। কিন্তু এই রোগ অসাধ্য বলিয়া পরিত্যক্ত হইয়া-

ছিল, এক্ষণে প্রাকৃতিক চিকিৎসায় অতি সহজে আরোগ্য হইল, এবং সমূলে নির্ম্মূল হইল।

একটী স্ত্রীলোকের হঠাৎ মৃত্যু হইল। অনুসন্ধানে জানা গেল, চিকিৎসক অতি মাত্রায় একটী তেজস্কর ঔষধ প্রয়োগ করেন, তাহাতেই স্ত্রীলোকটী মরে। এইটী পাশ্চাত্য দেশের একটী দুর্ঘটনা। চিকিৎসক মণ্ডলী সমবেত হইয়া উক্ত চিকিৎসকের এই দণ্ডবিধান করিলেন যে, তিনি মাসাবধি কাল চিকিৎসা করিতে পারিবেন না। দেখুন, চিকিৎসকের অসাবধানতায় একটী জীবন গেল, একজন পুরুষ তাহার প্রিয়তমা সঙ্গিনীকে চিরদিনের মত হারাইল, এবং কতকগুলি ছোট ছোট ছেলে মাতৃহীন হইল! এই প্রকার দৃষ্টান্ত আমাদের দেশে অনুসন্ধান করিলে অনেক পাওয়া যায়। কিন্তু সাধারণ লোক এমন কি অনেক ভদ্র-সন্তানও তাদৃশ শিক্ষিত নহে। দেহ-কলটী আমার কিন্তু উহার চালক হইলেন চিকিৎসক! তিনি পাস করাই হউন অথবা হাতুড়েই হউন; কিন্তু হাতুড়ের হাতেই পৌনে ষোল আনা লোক জীবন সঁপিয়া নিশ্চিন্ত ভাবে আছে! এ অবস্থায় অনুসন্ধান করিবে কে? বলা বাহুল্য যে ঐ স্ত্রীলোকটী যদি প্রাকৃতিক নিয়মে চিকিৎসিত হইত তাহা হইলে অদ্যাপিও বোধ হয় জীবিত থাকিত।

একটী বহুগুষ্টি পরিবারের দুই জন ব্যতীত প্রত্যেকের ভয়ঙ্কর

জ্বর হইল যাহাকে টাইফইড্ ফিভার (typhoid fever) বলে। ঐ জ্বরে রোগী প্রায়ই বাঁচে না। বাটীর কর্ত্তা পূর্ব্বে কোন কারণে প্রাকৃতিক চিকিৎসার একটু আস্বাদ পাইয়াছিলেন। সেই জন্য এক্ষণে সাহসে ভর করিয়া তিনি কোন ঔষধ প্রয়োগ না করিয়া স্বাভাবিক নিয়মের উপর প্রত্যেক রোগীকে রাখিলেন। প্রত্যেকেই আরাম হইল, এবং প্রত্যেকের স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা ভাল হইল। ঐ একই সময়ে অপর একটী পরিবারের মধ্যেও ঐ জ্বর হইল; দস্তুর মত ঔষধ দিয়া চিকিৎসা হইতে লাগিল। ফলে তিন্‌টী মরিল, এবং যে কয়টী বাঁচিল তাহাদের স্বাস্থ্য পূর্ব্বাপেক্ষা খারাপ হইল; ঔষধের বিষে এক জনের স্বাস্থ্য এত ভগ্ন হইয়াছিল যে, সে অনেক বৎসর পরে স্বাস্থ্য লাভ করে। জ্বর হইবার পূর্ব্বে উক্ত দুইটী পরিবারের লোকের স্বাস্থ্য বেশ ভাল ছিল, প্রত্যেকের শরীর ও জীবনীশক্তির তুলনা করিলে বিশেষ তারতম্য দেখা যাইত না। তবে দুই প্রকার ফলের কারণ দুই প্রকার চিকিৎসা ব্যতীত আর কি হইতে পারে?

আর একটী পরিবারের মধ্যে ঐ জ্বর আক্রমণ করিল। চিকিৎসকের ব্যবস্থানুসারে প্রত্যেক রোগীকে বিশুদ্ধ বায়ু, সূর্য্যের আলোক এবং জল হইতে বঞ্চিত করিয়া রাখা হইল, অর্থাৎ প্রকৃতি বিরুদ্ধভাবে রুদ্ধ, অন্ধকার ও অপরিষ্কার ঘরে রাখা হইল, এবং ক্রমাগত ঔষধরূপ বিষ ঢালা হইতে লাগিল। ফলে তিনটী মরিল; এবং অপর কয়টী অসহ্য ও বর্ণনাতীত যন্ত্রণা ভোগ

করিতে লাগিল। এমন সময় এক জন ধর্ম্ম প্রচারক তথায় উপস্থিত হইয়া অতি কষ্টে বাটির গৃহিণীকে বুঝাইলেন যে, যে তিনটী মরিয়াছে তাহারা কপাল দোষে বা ঈশ্বরের ইচ্ছায় মরে নাই; চিকিৎসকের মূর্খতাই এক মাত্র তাহাদের মৃত্যুর কারণ হইয়াছে। অনেক 'বলা কওয়ার' পর প্রাকৃতিক নিয়মে চিকিৎসা হইল, ঔষধ বন্দ করা হইল; দাস্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উহাকে স্বাভাবিক করিবার চেষ্টা করায়, বিশুদ্ধ বায়ু চলাচলের বন্দবস্ত হওয়ায় এবং পরিচ্ছদ ও বিছানা ও ঘর সর্ব্বদা পরিস্কার রাখায় প্রত্যেকেই আরোগ্য লাভ করিল।

একটী লোকের জ্বর হইয়াছে, "জল জল" করিয়া সে অস্থির হইয়াছে, চিকিৎসক কিছুতেই তাহা দিবে না, অতি অল্প পরিমাণে অনেক ক্ষণ পরে এক এক বার দিতেছে। পিপাসায় প্রাণ যায় এমন সময় পরিচর্য্যাকারী কোন কার্য্যে বাহিরে গিয়াছে, সেই মুহূর্ত্তে রোগী গড়াইতে গড়াইতে জলের কলসীর নিকট গিয়া সমুদয় জল পান করিয়া ফেলিয়াছে। পরিচর্য্যাকারী ফিরিয়া আসিয়া দেখিল সর্ব্বনাশ হইয়াছে! রোগী ত এক্ষণি মরিবে, তাড়াতাড়ি চিকিৎসককে ডাকা হইল। চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন "মরিবার দেরি নাই"। মরা দূর হউক রোগী নিদ্রিত হইল, নিদ্রার পর বার আনা রোগ দূর হইল, আস্তে আস্তে আরাম হইল! জ্বরে যদি কণ্ঠ শুষ্ক থাকে তবে প্রতি ৫।১০ মিনিট অন্তর দুই এক ঝিনুক জল দেওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ, ধাতু

সামঞ্জস্যের জন্যই প্রকৃতি জল চাহিতেছে, সে সময় জল না দিলে অন্তর্দাহ অত্যধিক হইবে; এবং জল তিন চারি দিন যদি একেবারেই না দেওয়া যায় তবে পিপাসা জনিত ভয়ঙ্কর অন্তর্দাহ হইয়া মৃত্যু হইবে, রোগী জ্বলিয়া পুড়িয়া মরিবে; এমন সন্তাপদায়ক মৃত্যু আর নাই। কোন লোকের জ্বর হইয়াছে, পিপাসা বোধ অল্প আছে, কণ্ঠও অল্প অল্প শুষ্ক অবস্থায় আছে, জল পান না করিয়াও থাকা যায়; সুতরাং জল পান না করিয়াই দুই দিন অতিবাহিত হইল। তিন দিনের দিন বর্ণনাতীত যাতনা উপস্থিত হইল, এবং নাড়ীর গতি এতই ক্ষীণ হইল যে মৃত্যু বুঝি হয়। এমন সময় চিকিৎসক আসিয়া ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন; পূর্ব্বাপর সমুদয় বৃত্তান্ত অবগত হইলেন কি না তাহা জানি না কিন্তু পিপাসার কথা চিকিৎসক এক বারও জিজ্ঞাসা করেন নাই, অথচ ঔষধের ব্যবস্থা হইল! ঔষধ খাইবার পূর্ব্বে ও পরে রোগী অনেক পরিমাণ জল-সাগু, দুগ্ধ-সাগু ও বারলি সেবন করিয়াছিল। ঔষধ সেবন সত্ত্বেও যখন পর দিনও ঐরূপ উপসর্গ উপস্থিত হইল, তখন ঔষধ আর না খাইয়া পিপাসা নিবারণে প্রবৃত্ত হইল। ৫।৭ মিনিট এমন কি ২।৩ মিনিট অন্তর ২ ১ ঝিনুক জল পান করিতে লাগিল, এইরূপে বৈকালে ও সমস্ত রাত্রে প্রায় দুই সের জল পান করায় পর দিন জ্বরের বিরাম হইল।

জ্বরের কারণ জানিতে হইলে এতই অনুসন্ধানের বিষয় আছে অর্থাৎ রোগীর পূর্ব্বাপর এতই জিজ্ঞাসা করিতে হয়, এবং সমুদয়

পূর্ব্বাপর অবস্থা অবগত হইয়াও যখন দেহ যন্ত্রটির অবস্থা চিন্তা করা যায়, অর্থাৎ রোগাবস্থায় যন্ত্রটী কি পরিমাণ বিকল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া কিরূপ ভাবে চলিতেছে, এই সকল বিষয় বিশেষরূপ চিন্তা করিলে হঠাৎ রোগীকে এক বার দেখিয়াই ঔষধ প্রয়োগ করা যায় না ; তাড়াতাড়ি ঔষধ দিলে এক দিকে হয় ত আপাততঃ ভাল বোধ হইল কিন্তু যন্ত্রের অন্যান্য অংশ আরও খারাপ হইল যাহা পরে এমন কি পর মুহূর্ত্তে প্রকাশিত হয়। হঠাৎ ঔষধ প্রয়োগ করিলে ভবীষ্যতে কুফল হইবার সম্ভাবনা অধিক এই ভাবিয়াই কোন কোন আধুনিক চিকিৎসক আমাদের শাস্ত্রমত বিধান করেন যে,রোগীর অবস্থা ২।৩ দিন এমন কি ৭দিন পর্য্যন্ত দেখিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিতে হইবে, এই কয় দিন প্রকৃতি অনুযায়ী চলিতে হইবে ; প্রকৃতি যখন যেটী চায় তাহাকে সেইটী দিলে এবং রোগের সমুদয়.কারণ দূর করিতে পারিলে ৭ দিনের পূর্ব্বেই ধাতুর সামঞ্জস্য হইয়া রোগ দূর হইয়া যায়, আর ঔষধ প্রয়োগ করিতে হয় না।

বসন্ত রোগের আক্রমণে জলের ভাপড়া দিয়া এক জনের শরীরের গ্লানি বাহির করিবার ব্যবস্থা হইল, তাহাতে সর্ব্বদা বিছানায় পড়িয়া থাকিতে হয় নাই এবং আরোগ্য লাভও অতি শীঘ্র হইয়াছে; অথচ ঐ ব্যারামে দস্তুরমত ঔষধ প্রয়োগে চিকিৎসিত হইয়া অন্য আর এক জন মরিয়াছে। আমাদের দেশে বসন্ত রোগে অনেক স্থলে কোন ঔষধ দেওয়া হয় না, সেই সঙ্গে যদি আরও

কয়েকটী প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসরণ করা হয় তবে অনেক রোগীই বাঁচে। মুর্শিদাবাদ জেলায় ১৩১৩।১৪ সালে ভয়ানক বসন্ত রোগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে, অনুসন্ধানে যতদুর জানিতে পারিয়াছি তাহাতে বুঝিয়াছি যে, কুপথ্যই অধিক মৃত্যুর কারণ। বসন্ত বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভাতের ব্যবস্থা, সরবতের ব্যবস্থা ডাবের ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হইয়াছে! সামান্য একটু মাথা ধরিলে বা জ্বর হইলে বা বদ্ হজম হইলে লোকে সতর্ক হইয়া আহারাদি করে, অথচ বসন্তের ন্যায় মারাত্মক রোগে কোন্ শাস্ত্র বলে বা কোন্ বুদ্ধিতে ঐ সকল কুপথ্যের ব্যবস্থা হয় তাহা বলিতে পারেন কি? আমার যখন বসন্ত হইল তখন ৮ দিন পর্য্যন্ত অর্থাৎ রোগের প্রবল অবস্থায় কেবল মাত্র দুগ্ধ, ডালিমের রস, মিষ্ট কমলা লেবুর রস, আঙ্গুরের রস, এবং বিলাতি দুগ্ধ (Horlick's Malted Milk) পান করিয়া ছিলাম; পাঁচ দিন পর্য্যন্ত গলার ব্যথায় ঐ সকল খাদ্য খাইতেও কষ্ট হইয়াছিল। নবম এবং দশম দিন দুগ্ধ সাগু এবং ঐ সকল ফলের রস খাই। ১৪ দিন পর্য্যন্ত প্রত্যহ সহ্যমত ভাপড়া এক বার করিয়া লইয়াছি এবং রাত্রেও দুই দিন তলপেট ধৌত করিয়াছি; এই রূপ ব্যবস্থা হওয়ায় অতি শীঘ্র শীঘ্র বসন্তগুলি বাহির হইয়াছে, পাকিয়াছে এবং শুকাইয়া অষ্টম দিবস হইতে চটা খসিতে আরম্ভ হইয়া ২১।২২ দিনে সমুদয় চটা খসিয়াছে। এবং একাদশ দিন হইতে দধি ও অন্ন ও পরে দধি ও ভুষিযুক্ত আটার রুটীর ব্যবস্থা হইয়াছে। ক দিন পরে

চিড়ে দধিরও ব্যবস্থা হইয়াছে। প্রত্যেক রোগীকেই যে দধি দিতে হইবে তাহা মনে করিবেন না। আমার বাটীতে আরও তিন জনের বসন্ত হয় তন্মধ্যে দুই জনের উক্ত প্রকার ব্যবস্থা হওয়ায় দুইটীই আরোগ্য হইয়াছে এবং তৃতীয়টীকে দেখিয়া কোন চিকিৎসক ঔষধের এবং ভাতের ব্যবস্থা করেন। ঔষধ খুব কম খাওয়ান হইয়াছিল এবং নবম দিনে ভাত দেওয়া হয়, ঐরূপ পথ্যের গুণে তৃতীয়টীও আরোগ্য হইয়াছে। উক্ত তিনটী রোগীর রোগের প্রবল অবস্থায় দুগ্ধ, পরে দুগ্ধ সাগু ও সর্ব্বশেষে দুগ্ধ ও ভাতের ব্যবস্থা হইয়াছিল। নিরুদ্বেগের সহিত চিকিৎসা হইয়াছে; কোন চিকিৎসককে ডাকিতে হয় নাই। শেষোক্ত ৩টী রোগীর চিকিৎসায় কিছুই খরচ হয় নাই, আমার চিকিৎসার সময় জীবনীশক্তির হীনতা বশতঃ উক্ত ফল গুলি এবং বিলাতী দুগ্ধ ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। ফলগুলি ৩।৪ দিন অন্তর চারি সের করিয়া রেলওয়ে পার্শেলে কলিকাতা হইতে আনাইতে হইয়াছিল ৪ দফায় ১৬ সের আনিতে প্রায় সাত টাকা খরচ হয়, এবং তিন বোতল বিলাতী দুগ্ধের মূল্য কলিকাতায় ৪।৷০ এবং পাড়া গাঁয়ে ৫৲ টাকার কম নহে; সুতরাং মোট খরচ ১২৲ টাকা। কিন্তু ইতর ভদ্র যাহারা ঐ রোগে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে তাহাদের প্রত্যেকের চিকিৎসায় ১২৲ টাকার অধিক খরচ হইয়াছে কি না তাহা ভাবিয়া দেখুন!

পূর্ব্বোক্ত এবং পশ্চাল্লিখিত দৃষ্টান্ত পাঠে বুঝিতে

পারিবেন যে ঔষধে কি ভয়ানক অনিষ্টই হইতেছে! প্রতি বৎসর হাজার হাজার লোক ঐ বিষে মরিতেছে তবুও ঐ বিষের আধিপত্য যায় না কেন? কারণ প্রাকৃতিক নিয়মে চিকিৎসা করিলে চিকিৎসকগণের স্বার্থে আঘাত পড়ে, দ্বিতীয় কারণ, সাধারণ লোক গণ্ডির বাহির হইতে সহজে চায় না, এবং তৃতীয়তঃ কেবল মাত্র সুপথ্যেই রোগ সারে সে জ্ঞান কাহারই নাই।

একটী লোক ৩০ বৎসর বয়সের সময় ক্ষয়রোগ গ্রস্ত হইলেন; চিকিৎসকগণ বলিল ফুস্‌ফুস্‌ নষ্ট হইয়া গিয়াছে বাঁচিবার আশা নাই। তিনি কেবল মাত্র দাস্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়া এবং অন্যান্য নিয়ম পালন করিয়া ৮০ বৎসর বয়সের সময়ও খুব কার্য্যক্ষম ছিলেন, এবং ঐরূপ আর একজন ২০ বৎসর বয়সের সময় ডাক্তারের নিকট হতাশ হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে থাকিয়া ৬৫ বৎসর বয়সের সময় আপনাকে খুব বলিষ্ঠ মনে করিতেছেন।

একটী শিশু পিতা মাতার রোগ লইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ছেলে বেলায় প্রায় জ্বর লাগিয়াই থাকিত। শৈশব অবস্থাতেই তাহাকে রেড়ির তেলের জোলাপ, জ্বর নিবারণের নানা প্রকার আরক ও পুরিয়া, এবং কুইনাইনের আরক ও গুলি এই সকল ঔষধ দ্বারা চিকিৎসা করা গিয়াছিল। জ্বর পুরাতন হইয়া গেলে অর্থাৎ ঘুসঘুসে জ্বরে কবিরাজি চিকিৎসাধীন করা হয়। এবং সময়ে সময়ে জ্বর ও অন্যান্য উপসর্গ অত্যন্ত প্রবল

হইলে, এলোপ্যাথি চিকিৎসাও হইয়াছিল। এত চেষ্টা সত্ত্বেও অসুখ কিন্তু বার মাসই লাগিয়া থাকিত; চিকিৎসকের কথা মতই আহার আদি হইত, চিকিৎসক যেমন ভাবে থাকিতে বলিতেন সে তেমনি ভাবেই থাকিত, তাহার পক্ষে কোন ত্রুটী ছিল না। ১৬ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ন্যূনকল্পে ৩২ বার জোলাপ দিয়া দাস্ত করান হইয়াছে এবং অত্যন্ত কটু ও বিদাহী ঔষধ ও বোতল বোতল কুইনাইন এবং ডিগুপ্তের ঔষধ এবং পুরাতন জ্বরের নানা প্রকার পাচন ও বড়ি খাওয়ানতেও, ফল কি হইয়াছে? না;—ম্যালেরিয়া জ্বর স্থায়ী ভাবে দেহে আশ্রয় লওয়ায় উক্ত ঔষধগুলি জীবনের সঙ্গী হইয়া পড়িয়াছে! এই সময়েই অর্থাৎ ১৬ বৎসর বয়সেই অধিকন্তু হাঁপানি, অর্শ, আমাশয় ও অজীর্ণ প্রবল বেগে আক্রমণ করিল। চিকিৎসকগণ বলেন "পৈতৃক রোগ ধরিয়াছে, সারিবে না, তবে ঔষধ দিয়া যত দূর সাম্য রাখা যায় তাহা করিতে হইবে"; অথবা "ঈশ্বর বিরূপ হইলে মানুষের কি সাধ্য যে রোগ আরাম করে" এই বলিয়া চিকিৎসকগণ আপনাপন পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিতে লাগিলেন; অথচ সর্ব্বপ্রকার ঔষধের গুলিগোলা মারিয়া এবং স্বাস্থ্যবিধির বিপরীত ভাবে চালাইয়া উক্ত রোগীর শরীর ভাঙ্গিয়া দেওয়াতে যে তাহাকে হাঁপানি অর্শ প্রভৃতি রোগ আক্রমণ করিল তাহা স্বয়ং চিকিৎসকই জানিতে পারিলেন না, সুতরাং রোগী কি রূপে জানিবে! চিকিৎসকের বিশ্বাস এই যে, রোগ হইলে ঐ এক প্রণালীতে অর্থাৎ পুঁথিগত

বিদ্যা অনুসারে ঔষধ বা অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা চিকিৎসা করিতে হইবে, তাহাতে রোগী বাঁচুক বা মরুক। বাঁচিলে, হাত তাঁহার, যশ তাঁহার; আর মরিলে, সব ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর গেল; এই ত অবস্থা! রোগী কি বুঝিবে, সে গা ঢালিয়া দেয়; স্রোতে ভাসিয়া যাইতে যাইতে যদি কুল পাইল, অর্থাৎ স্রোত ঠেলিয়া উঠিবার যদি সেই রূপ জীবনীশক্তি থাকে, ভাল, নচেৎ ভাসিয়াই গেল,অর্থাৎ অকালে মরিল। প্রকৃতি বিরুদ্ধ ঔষধ যদি আজীবন শরীরে প্রবেশ করান যায় এবং আজীবন যদি প্রকৃতিবিরুদ্ধ ভাবে থাকা যায় তবে জীবনীশক্তির দশাটা কি রূপ হয় ভাবিয়া দেখুন। জীবনীশক্তি পূর্ণ শক্তিতে খেলিতে পায় না। প্রথমতঃ অস্বাভাবিক আহার বিহার সমুদ্ভূত বিষ জনিত দেহের প্রকৃত ভাবের বৈলক্ষণ্য, দ্বিতীয়তঃ ঐ বৈলক্ষণ্যের পরিণতি, রোগ এবং তৃতীয়তঃ রোগ নিবারণ জন্য যে সকল প্রকৃতি বিরুদ্ধ ঔষধ প্রয়োগ হয়, এই তিনটীর যুগপৎ নিষ্পেষণে জীবনীশক্তি নিষ্ক্রিয় হইয়া ক্রমে নিঃশেষিত হইয়া যায়। তাহার আশ্চর্য্য শক্তি অযথা রূপে প্রযুক্ত হইয়া অকালে নষ্ট হইয়া যায়, এবং অকাল মৃত্যু অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। যে ঔষধ খাইয়া কোন ফল হইতেছে না, খাইতে খাইতে শরীর পড়িয়াই যাইতেছে এবং শরীরকে ক্রমে ক্রমে অকর্ম্মণ্য করিতেছে অর্থাৎ যে চিকিৎসার ফলে রোগটি বারে বারে নানাপ্রকার উপসর্গ সহ ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিতেছে সে ঔষধ বা সে চিকিৎসায় কি করিয়া বিশ্বাস থাকিতে পারে? কিন্তু এই অবিশ্বাস কয় জনের হয়? আর একটী উৎকৃষ্টের

বিশ্বাসের স্থল না পাইলে ত ইহাতে অবিশ্বাস হইবে না। সেই বিশ্বাসের স্থলটী পাইতে যিনি প্রয়াসী হইবেন তিনি কখনও স্রোতে গা ঢালিয়া দিবেন না।

উপরোক্ত রোগীকে এখন কড্‌লিভার অয়েল, ফেলোজ সিরাপ, এট্‌কিনস্‌ সিরাপ, গ্রিমল্ট্‌স্‌ সিরাপ, চব্যন প্রাস প্রভৃতি যত প্রকার হাঁপানির ঔষধ আছে ও হইতে পারে, তৎসমস্তই একে একে দেওয়া হইতে লাগিল। রোগ কিছুতেই সারে না, জ্বরও মধ্যে মধ্যে প্রায়ই হয়। অনুমান ২২।২৩ বৎসর বয়সের সময় তাহার কলেরা রোগ হইল। ক্লোরোডাইন প্রভৃতি অহিফেন মিশ্রিত ঔষধ দেওয়াতে পেট ফুলিয়া উঠিল। তখন সে চিকিৎসকগণকে বলিল, "আমি মরি বা বাঁচি আপনাদের ঔষধ খাইব না, মরিতে হয় হোমিওপ্যাথি ঔষধ খাইয়া মরিব।" ইলেক্‌ট্রো হোমিওপ্যাথি ঔষধ অর্থাৎ কয়েক ফোটা জল দিবসে বার কয়েক খাইতে লাগিল। এই ব্যবস্থায় একদিন যেমন ভাল থাকিল, অর্থাৎ জীবনীশক্তি যেমন একটু খাড়া হইয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিল, অমনি তাহার শক্তিটুকু হরণ করিবার জন্য চিকিৎসকের হাত "চুলবুল" করিতে লাগিল। রোগীকে দুই এক দাগ ঔষধ খাওয়াইবার জন্য অজ্ঞ বিজ্ঞ সকলেই অত্যন্ত পেড়াপিড়ি করিতে লাগিল! রোগী দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া পড়িয়া থাকিল, কিছুতেই খাইল না। এইরূপ ব্যবস্থায় সাতদিন থাকিয়া সে আরাম হইল। ডাক্তারি, কবিরাজি এবং অল্প বিস্তর হোমিও-প্যাথি অর্থাৎ প্রত্যেক ঔষধেরই পরীক্ষা নানা রোগের প্রাবল্যের

সময় হইয়া গিয়াছে। কিন্তু হাঁপানি বা অর্শ অথবা জ্বর কোন ঔষধেই আরোগ্য করিতে পারিল না। প্রাবল্যের সময় উপবাস ও লঘু আহার করিয়া রোগ উপশমিত হইয়াছে; তাহা না বুঝিয়া এবং না জানিয়া অনর্থক ঔষধ খাইয়া জীবনী শক্তি দুর্ব্বল হইতে দুর্ব্বলতর করা হইয়াছে। ঔষধের কুপ্রয়োগ জনিত কুফল কেহই বুঝাইয়া দেয় না, সেও বুঝে না। ৩২,৩৩ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সে এইরূপে চিকিৎসিত হইয়া যে ফল পাইয়াছে তাহা শ্রবণ করুন। শৈশব অবস্থায় জ্বর হয়, প্রথমে সেই জ্বরের চিকিৎসা হয় এবং সেই চিকিৎসা হইতে যে যে রোগ উৎপন্ন হইয়াছে তাহার একটী তালিকা দিয়া সংক্ষেপে শেষ করি।

১। জ্বর এবং প্লীহা ও যকৃতের দোষ।

২। হাঁপানি।

৩। অর্শ (অত্যন্ত রক্তস্রাব ও অত্যন্ত যাতনা দায়ক)।

৪। অজীর্ণ, পেট ফাঁপা; সময় সময় তরল ভেদ।

৫। আমাশয়।

৬। কাশি (শুষ্ক কাশি রাত্রিতে অতিশয় কষ্ট দিত)।

৭। রক্তপিত্ত।

৮। ধাতুদৌর্ব্বল্য।

৯। স্বপ্নদোষ।

১০। অনিদ্রা।

১১। পেটের ব্যারাম (diarrhoea) এবং (dyspepsia)।

১২। দন্তশূল (দাঁতের মাড়ি ফুলিয়া অসহ্য যন্ত্রণা এবং

তাহাতে মাসাবধি অনাহার ও অর্দ্ধ আহারে থাকা)।

১৩। বাত (হাঁটুতে ব্যথা হইয়া ৭।৮ দিন যন্ত্রণা)।

১৪। ম্যালেরিয়া (বৎসরে গড়ে তিনবার আক্রমণ করিত)।

১৫। চর্ম্মরোগ (পায়ে কাল কাল দাগ)।

১৬। সর্ব্বদা সর্দ্দি।

১৭। নাসা (নাকের ভিতরে ফুলিয়া রক্ত পড়িত)।

১৮। ফিক্ ব্যথা বা পার্শ্ববেদনা বা পার্শ্বশূল।

১৯। বুকে ব্যথা, মাজায় ব্যথা।

২০। অত্যন্ত দুর্ব্বলতা।

এক রোগ চিকিৎসার দোষে এত উপসর্গ সহ বাড়িয়া উঠিল। পাঁচ ছয়টী উপসর্গ যখন খুব জোর করিত তখন কাহারও কথা না শুনিয়া কাহাকেও কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া একাদিক্রমে তিন মাস কাল ধরিয়া একবেলা রুটী, তরকারি ও দুগ্ধ আহার, অথবা একবেলা আতপ অন্ন ঘৃত দুগ্ধ আহার করিয়া রোগগুলি উপসমিত হইত। অনিদ্রা নিবারণ জন্য সময় সময় দুই মাস কাল ধরিয়া মস্তক মুণ্ডন করিয়াই রাখিত। সমস্ত উপসর্গ যখন ঐরূপ দণ্ড প্রহারে পলায়ন করিত তখন আবার অজ্ঞান বশতঃ দুই বেলা গুরুতর আহার করিয়া এবং মৎস্য মাংসাদি কুপথ্য আহার করিয়া পুনরায় রোগ আনয়ন করিত। চিকিৎসকের নিকট ব্যবস্থা লইতে গেলেই ঔষধ প্রয়োগ বা সেবন ব্যতীত অন্য ব্যবস্থা পাইত না। এবং ঔষধ খাইয়াও যখন আর উপকার বুঝা যাইত না তখন অহিফেন সেবন করিয়া

কাজ করিতে হইত; ক্রমাগত তিনমাস কাল এবং পরেও মধ্যে মধ্যে আবশ্যক মত আফিম খাইয়া বুঝিল, আফিমেও আর কোন উপকার হয় না; বরং রোগগুলি অহিফেন সেবনে এত প্রবলরূপে আক্রমণ করিত যে প্রাণ লইয়া টানাটানি হইত। সুতরাং প্রচলিত প্রণালীর চিকিৎসার উপর বিশ্বাস আস্তে আস্তে কমিতেই লাগিল। ক্রমশ আহারাদির নিয়মের উপর নির্ভরতা আসিতে লাগিল, ক্ষুধায় খায় ক্ষুধা না থাকিলে উপবাস করে। এখন জ্বর বা হাঁপানি অথবা উপরোক্ত কোন ব্যাধি হইলেই উপবাস। কারণ, আফিম, চা, মদ্য, Himrod's Cure প্রভৃতি আশু যন্ত্রণা নিবারক কোন ঔষধেই আর বিশ্বাস নাই। ঔষধ না খাইয়া তিন বৎসর যাবৎ রোগের বিশেষ কষ্ট পায় নাই। তিন বৎসর পরে জ্বর হইল, তাহা কুপথ্যে অতিশয় বাড়িয়া যাইতে লাগিল; চিকিৎসক জোলাপ দিলেন। অল্প অল্প দাস্ত ৩।৪ দিন ধরিয়া হইতে লাগিল। গা বমি বমি; কিছুই খাইতে ইচ্ছা করে না; জ্বরও ১০৪। ১০৫ ডিগ্রি। এই রূপ অবস্থায় সপ্তাহ কাল যে কি ভয়ানক কষ্টে কাটিয়াছে তাহা বর্ণনাতীত! এই অসহ্য যাতনা নিবারণ করিবার জন্য একটী বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, পারদর্শী ও প্রাচীন চিকিৎসক আসিলেন।

এই স্থানে একটি কথা বলা উচিত। ডাক্তারগণ তাঁহাদের যন্ত্রদ্বারা উক্ত রোগীর বুক পিট এবং সমস্ত অঙ্গ ভাল করিয়া অনেক বার দেখিয়াছেন, সাহেব ডাক্তারও তিন চারি বার পরীক্ষা করিয়া টোকা মারিয়া দেখিয়াছেন। সকলেই বলিতেন যে

শরীরের অভ্যন্তরস্থ যন্ত্র সকল ভালই আছে, অথচ এ ভাবটা রোগী কিন্তু বুঝিয়া উঠিতে পারিত না; কারণ সে সর্ব্বদাই রোগের যন্ত্রণায় অস্থির অথচ তদবস্থায় ভিতরের যন্ত্র সকল ভাল! এ যে কেমন কথা সে তাহার কিছুই বুঝিতে পারে না। যেমন বায়ুপ্রধান সুস্থদেহী,—পিত্তপ্রধান সুস্থদেহী,—ও শ্লেষ্মপ্রধান সুস্থদেহী,—আছে, সেই রূপ অন্য কোন এক প্রকার সুস্থদেহী বোধ হয় সেও হইতে পারে এই রূপ তাহার মনে হইত। কোন চাকুরিজিবী অসুস্থ হইয়া ছুটীর জন্য দরখাস্ত করিল। হুকুম হইল ডাক্তারের সার্টিফিকিট (certificate) দিতে হইবে; ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া তাহার দেহে কোন রোগের নিদর্শন পাইলেন না। যে ডাক্তারের নিকট সে যায় প্রত্যেকেই ঐ এক কথা বলেন; অথচ রোগী তাহার নিজের অবস্থা বিশেষ বুঝিতেছে, রোগের কষ্ট সে বিশেষ রূপ অনুভব করিতেছে; কিন্তু ডাক্তার সেটী দেখিতে পাইতেছেন না। উক্ত প্রকার ঘটনা বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন। এই সকল ডাক্তার যাঁহারা তাঁহাদের শাস্ত্রকে অভ্রান্ত মনে করেন তাঁহাদের মতে উক্ত রোগীর শরীরের কোন যন্ত্র খারাপ হয় নাই। তবে কেন সে এত ব্যারামে কষ্ট পায় ইহার উত্তর তাঁহারা অথবা কবিরাজগণ ঔষধ প্রয়োগ ব্যতীত অন্য কোন প্রকারেই দিতে পারেন না। এত কাল এই রূপেই চিকিৎসা হইয়াছে! ৩০ বৎসর ধরিয়া এইরূপ হইয়াছে! ব্যারামের উৎপত্তি কোথা হইতে হইতেছে তাহার কিছুই ঠিক হইল না, সুতরাং অন্ধকারে

ঢেলা মারিয়া চিকিৎসা করা হইয়াছে! এ ঢেলা শরীর কত দিন সহিবে?

উপরোক্ত প্রাচীন চিকিৎসকও রোগীর বুক পিট ভাল করিয়া দেখিলেন, টোকা মারিয়া পরীক্ষা করিলেন; ভাবিলেন, পুঁথি-গত বিদ্যার সঙ্গে মিলাইলেন, কিন্তু সেই যাহা হইয়া আসিতেছে তাহাই ব্যবস্থা হইল। অন্ধকারে ঢেলা মারা স্বরূপ পুনরায় জোলাপের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন। এই ব্যবস্থা শুনিয়া রোগীর সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল। সে বলিল, "আমার উঠিবার ক্ষমতা নাই, কথা কহিবার শক্তি নাই, সাত দিন আহার নাই, গাত্রের জ্বালায় নিদ্রা নাই, শরীরে সামর্থ একটুও নাই। পাইখানায় এমন কি ঘরে বসিয়া মলত্যাগ করিবার ক্ষমতাও নাই। দুর্ব্বল এত বেশি যে মাথা তুলিবার শক্তি নাই; ইতিপূর্ব্বে ঠিক এই প্রকার অবস্থায় জোলাপের উপর আবার জোলাপ লইয়া ৪।৫ বার ডিলিরিয়াম (delirium) হইয়া অজ্ঞান হইয়াছি, জ্ঞান হও-য়ার পর দেখি মস্তক মুণ্ডন করিয়া তথায় বরফ প্রয়োগ করিতেছে. এবার সেইরূপ অজ্ঞান হইলে আর চৈতন্য উদয় হইবে না। পূর্ব্বেকার ৪।৫ বার জ্বর অবস্থাতে যে জোলাপের উপর জোলাপ ব্যবস্থা হইয়াছিল তাহা শরীর সহ্য করিতে পারিয়াছিল। তখন-কার শরীরের অবস্থা আর এখনকার শরীরের অবস্থা অনেক প্রভেদ। এবার জোলাপে মৃত্যু অনিবার্য্য। জোলাপ ব্যতীত অন্য কোন সহজ উপায়ে কি দাস্ত করান যায় না? আমাকে

ঘোল আনিয়া দাও, ঘোল খাইয়া মরি সেও ভাল তবু যম স্বরূপ চিকিৎসকের হাতে মরা ভাল নয়।”

পুনরায় এখানে আর একটী কথা বলা উচিত হইতেছে। ইতিপূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত চিকিৎসায় তাহার বিশ্বাস কমিয়া যায়। যখন অসুখ হইত অসুখের কারণ প্রায়ই সে ধরিয়া ফেলিত! গুরুতর বা বিরুদ্ধ ভোজন হওয়ার পরই অজীর্ণ, অনিদ্রা বা পেট গরম বা পেটের কোন প্রকার অসুখ বা কামড়ানি হইত, তারপর গুরুতর অসুখ হইত। এই রূপে গুরুতর অসুখের সূত্রপাত জানিতে শিখিয়া সূত্রপাত হওয়া মাত্র পেট ঠাণ্ডা করিবার জন্য ঘোল পান করিত, আমাশা এবং অজীর্ণ রোগ থাকায় ঘোল পান সহ্য হইত। ঘোল পান করিলেই পরিপাক ক্রিয়া ভাল রকম হইয়া শরীর বেশ সুস্থ হইত। এই রূপ পূর্ব্বে পূর্ব্বে সমস্ত গ্রীষ্ম কালটা সে আহার করিবার সময় ঘোল ও দধি খাইয়া ভাল থাকিত।

তাহার পূর্ব্বকার সেই জ্ঞানটী এক্ষণে এতই প্রবল হইল যে সে জোলাপ ফেলিয়া দিয়া অর্দ্ধ সের ঘোল পান করিল। পান করিবার সময় যে কি অনির্ব্বচনীয় তৃপ্তি হইল তাহা বর্ণণাতীত! অর্দ্ধ ঘণ্টা পরে কঠিন কুপিত মল সহজে ও বিনা কষ্টে অনেক পরিমাণে নির্গত হইয়া গেল। যে রোগী মাথা তুলিতে পারিতেছিল না সে পাইখানায় আপনি হাঁটীয়া গিয়া মলত্যাগ করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে আপনার আত্মীয় স্বজনকে ডাকিয়া বলিল “এস এস, দেখিয়া যাও ঘোলে কি উপকার হইয়াছে, এবং সেই

বিজ্ঞ ও প্রাচীন চিকিৎসককে এই টুকু শিক্ষা দিয়া আইস"! জ্বর ১০৪ ডিগ্রি হইতে একেবারে ১০০ ডিগ্রিতে নামিয়া গেল। পুনরায় অর্দ্ধঘণ্টা পরে আবার দেড় পোয়া আন্দাজ ঘোল পান করিল; রাত্রে গভীর নিদ্রা হইল, সাত দিন যাহার আহার ও নিদ্রা ছিল না, ভাবুন দেখি তাহার সেই গভীর নিদ্রা কেমন সুখের! পর দিন প্রাতে জ্বর ছাড়িয়া গেল। অর্থের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রম এবার সহ্য হইল না। ১৫ দিন পরে আবার জ্বর হইল। এবারকার জ্বরে আর ঔষধ খাইল না, কোন চিকিৎসককেও ডাকিল না। কারণ, একবার নয়, দুইবার নয়, শত শত বার তাহাদের উপর বিশ্বাস করিয়া ঠকিয়াছে। এখন মূলমন্ত্র হইয়াছে, "পেট্‌কে ঠিক রাখিলে কোন রোগ হইবে না"। এক দিন গোটা উপবাস ও পরদিন অর্দ্ধ উপবাস করায় জ্বর ছাড়িল। তখন প্রত্যহ আহার করিবার সময় ঘোল খায়। গ্রীষ্মকালে ঘোল সহ্য হইল, কিন্তু শীতের প্রারম্ভে ঘোল আর সহ্য হয় না, ঘোল পান করিলে অতিরিক্ত সর্দ্দি হইত এবং হাঁপানি হইত। তবে কি করিয়া পেট ঠাণ্ডা রাখা যাইতে পারে এবং কেমন করিয়া বিনা ঔষধে পরিপাক ক্রিয়া সুচারু রূপে হইতে পারে? স্বপ্নদোষ নিবারণ জন্য প্রত্যহ রাত্রে এক বার দুই বার এবং সময় সময় তিন বার করিয়া তলপেট ঠাণ্ডাজল দিয়া ধৌত করার অভ্যাস ছিল; এখনও মধ্যে মধ্যে অর্থাৎ যখন স্বপ্নদোষ হইত তখন দিন কয়েক ঐ রূপ ধৌত ক্রিয়া করিত, কিন্তু প্রত্যহ নয়। এই বিষয় ভাবিতে ভাবিতে হঠাৎ একদিন তাহার কোন আত্মীয় বলিল

যে, তাহার হৃদ্‌রোগ অনেকটা সারিয়াছে। কেমন করিয়া সারিল জিজ্ঞাসা করায় বলিল যে, সে দিবা রাত্রে তিন চারি বার শীতল জল দিয়া রগড়াইয়া রগড়াইয়া তলপেট ধৌত করিয়া হৃদ্‌রোগের দারুণ যন্ত্রণা হইতে অনেকটা রক্ষা পাইয়াছে। অনুত্তেজক আহারের কথা এবং পাশ্চাত্য দেশে নিরামিষ ও অনুত্তেজক আহারের খুব আদর হইয়াছে, এই সকল কথাও সে বলিল এবং অনেক নূতন নূতন স্বাস্থ্য রক্ষা পুস্তকের নাম করিল এবং দুই একটী দেখাইল। তদবধি সে নানা পুস্তক হইতে নানা প্রকার স্বাস্থ্যের নিয়ম অনুসন্ধান করিতে লাগিল। যে নিয়মটী সর্ব্ববাদীসম্মত, সেইটী অনুসরণ করিতে লাগিল; এই রূপে অনুসন্ধান ও সর্ব্ববাদীসম্মত স্বাস্থ্যের নিয়মটী নিজের দেহে পরীক্ষা করিয়া যে জ্ঞান ও প্রত্যক্ষ বিশ্বাস হইয়াছে তাহা এই গ্রন্থের প্রথমাংশে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। তদবধি মৎস্য মাংস ত্যাগ করতঃ ঐ সকল নিয়মপালন করিয়া এবং সাধ্যমত প্রকৃতি অনুযায়ী থাকিয়া এক বৎসর বিশেষ কোন অসুখ সে ভোগ করে নাই। অত্যাবশ্যক বোধে এ স্থলে পুস্তক গুলির একটি তালিকা দিতেছি।

Louis Kuhne's New Science of Healing without drugs and without operations, Science of Facial Expression, and Am I well or sick; Alexander Haig's Diet and Food considered in relation

to Strength and Power of Endurance, Training and Athletics and Uric Acid as a Factor in the causation of disease (Review on); J. W. Wilson's New Hygiene ; Notter & Firth's Hygiene ; Furniex's Elementary Physiology ; Fothergill on Indigestion; Lord Avebury on Health; Health notes from various sources; সুশ্রুত ; ভাব প্রকাশ ; এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে নানা মুনির মত যাহা নানাবিধ ইংরাজী ও বাঙ্গলা পুস্তক এবং ইংরাজী ও বাঙ্গলা সংবাদ পত্র হইতে সংগৃহিত হইয়াছে।

এ স্থলে বলা উচিত যে, নিয়মগুলি কতদূর পালন করা হইয়াছিল। প্রতিকূল অবস্থা লইয়াই জন্ম, প্রতিকূল অবস্থায়ই লালন-পালন ও জীবন-যাপন। বাটীতে অর্থাৎ সংসারে জড়িত থাকা কালের প্রতিকূল অবস্থা এক প্রকার; আবার বাটী ছাড়া হইয়া বিদেশে কর্ম্মস্থানের প্রতিকূল অবস্থা অন্য এক প্রকার; তদুপরি সাধারণ প্রতিকূল অবস্থা আছে যাহা এড়ান যায় না, বাটীতেই থাকুন আর বিদেশেই থাকুন। এই সকল প্রতিকূল অবস্থা অতিক্রম করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছে এবং নিয়মগুলি আঠার আনা পাচ সিকা রকম পালন করিবার চেষ্টা করিয়াছে। তাহার ফলে প্রথম নিয়মটী চৌদ্দ আনা রকম, এবং অবশিষ্ট নিয়মগুলি বার আনা রকম পালন করা হইয়াছে। প্রত্যেক নিয়ম যাহাতে ষোল আনা রকম পালন হয় তাহার চেষ্টা অনবরত হইতেছে। এক্ষণে তাহার বিশ্বাস জন্মিয়াছে যে, সকল রোগের

মূলে কুঠারাঘাত পড়িয়াছে। কারণ, রোগ সকল এখন বিনা ক্লেশে ক্রমে ক্রমে দূরীভূত হইতেছে। যে রোগীর প্রতিবৎসর দুই বার, তিন বার জ্বর হইত এবং এই রূপ জ্বরের কষ্ট ৩০ বৎসর ধরিয়া পাইয়াছে, যে রোগীর হাঁপানি এবং অর্শ বার মাস লাগিয়া থাকিত, কত সময় ঐ রোগের যন্ত্রণা হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন্য আত্ম হত্যার ইচ্ছা করিয়াছে, এবং ঐ হাঁপানি ও অর্শের অসহ্য যাতনা ১৮। ১৯ বৎসর ধরিয়া পাইয়াছে, অর্শের জ্বালায় ছটপট্ করিয়াছে, হাঁপানির জ্বালায় কত শত রাত্রি নিদ্রা যাইতে পারে নাই, যে রোগী দন্তশূলে কষ্ট পাইবার সময় মাসাবধি এক রকম অনাহারে থাকিয়াছে, মাড়ির টাটানিতে ছট্‌পট্ করিয়াছে, এবং ন্যূনকল্পে দাঁতের মাড়ি ১০।১২ বার কাটাইয়াছে, সেই রোগী প্রাকৃতিক নিয়মে থাকিয়া এক বৎসর যাবৎ উক্ত রোগ সমুদয়ের যন্ত্রণা হইতে একেবারে মুক্ত হইয়াছিল; ইহা কি কম আশ্চর্য্যের কথা!

সেই এক বৎসর নানা কার্য্যে লিপ্ত থাকায় অতিরিক্ত পরিশ্রম হয় এবং কর্ম্মস্থানে (কলিকাতায়) বিশুদ্ধ বায়ু সেবন না হওয়ায় পুনরায় সামান্য রকম হাঁপানি হয়। তখন স্বদেশে আসিয়া কেবল স্বাভাবিক পথ্য ও বিশুদ্ধ বায়ুর দিকে বিশেষ লক্ষ্য করিল। শীতের তিন মাস অতিরিক্ত বস্ত্রাবৃত হইয়া জানালা দরজা খুলিয়া শুইতে লাগিল এবং গম ভিজা, চাউল ভিজা, কৃষ্ণতিল, চিড়ে, দধি, চিনি, কিস্‌মিস্, মোনক্কা, সাকরপারা, খোবানি, আঞ্জির, অল্প পরিমাণ দুগ্ধ, অল্প পরিমাণ পেস্তা, বাদাম, আখরোট, মতুমান

কলা, পেপে এই সকল খাদ্য ক্ষুধা অনুসারে খাইয়াছিল; তিনবংস রন্ধন করে নাই; এবং এখনও এক বেলা অরন্ধন করে এবং আর এক বেলা অর্থাৎ মধ্যাহ্ণে ভূষযুক্ত আটার রুটী, পটলের তরকারী এবং দধি ও চিনি আহার করে; তাহাতে শরীর সুস্থই আছে; এবং ঐ স্বাভাবিক পথ্যের সহিত সপ্তাহে দুই বার, কোন সপ্তাহে তিন বার করিয়া ভাপড়া লইয়াছে এবং এখনও লইতেছে। প্রতিদিন দিবসে এবং আবশ্যক মত রাত্রে অথবা বৈকালেও দধি ভোজন করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। এইরূপ ব্যবস্থায় হাঁপানি উপসমিত ছিল, তারপর সামান্য রক্তস্রাব সহ অর্শ হইল, তার পর আমাশয় এবং সর্ব্বশেষে জ্বর ও বসন্ত হইয়া সকল রোগের বিষ বাহির হইয়া গেল। আট মাসে এত পরিবর্ত্তন হইল! দেহের ওজন ৩৯ সের হইয়া গিয়াছিল, শীতের চারি মাসে ৫ সের বৃদ্ধি হয়, তারপর বসন্ত হওয়ায় তিন সের কমিয়া ৪১ সের হয়, বসন্তের পর তিন মাসে পুনরায় ৫ সের বৃদ্ধি হইয়া ৪৬।৪৭ সেরের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে, এক্ষণে শরীর যে দিন দিন ভাল হইতেছে তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। নানা প্রকারের ক্ষয়-রোগ-গ্রস্ত রোগীর অর্থাৎ শুক্র রক্ত ও মল এই তিনটাই আজীবন ক্ষয় হইয়া যে রোগীর শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইয়া মৃতপ্রায় হইয়া গিয়াছিল, সর্ব্ব প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় থাকিয়াও প্রাকৃতিক মতে চিকিৎসা করায় আট মাসে তাহার দেহের ওজন যদি ৮ সের বৃদ্ধি হইতে পারে

তবে অনুকূল অবস্থায় থাকিলে কত বৃদ্ধি হইত তাহা অনুমান করিবেন। পূর্ব্বোক্ত রোগী সকলের চেহারা ও অবয়বের পরিবর্ত্তন চিত্র সহিত বুঝাইতে পারিলে ভাল হইত। কিন্তু তাহা বড়ই ব্যয় সাপেক্ষ।

যে নিয়মে থাকিলে ব্যাধি হইতে দূরে থাকা যায় এবং যে নিয়ম পালন করিলে রোগের মূল বা শিকড় আলগা হইয়া দেহ হইতে বিচ্যুত হইয়া পড়ে তাহাই ত চিকিৎসা।

যাভিঃ ক্রিয়া ভির্জায়ন্তে শরীরে ধাতবঃ সমা।
সা চিকিৎসা বিকারাণাং কর্ম্ম তৎ ভিষজাং মতং॥

অর্থাৎ যে সকল ক্রিয়া দ্বারা শরীরে ধাতুর সমতা হয়, রোগীর জন্য সেই সকল ক্রিয়া করার নামই চিকিৎসা এবং সেই সকল কর্ম্ম করিলে প্রকৃত চিকিৎসকের কর্ম্ম করা হয়। এই জন্যই আমাদের শাস্ত্রকার বলেন, চিকিৎসা শাস্ত্র স্বার্থশূন্য এবং ঋষি সদৃশ লোকের হাতে থাকা উচিত। ব্যারাম ভাল হউক বা না হউক, কতগুলা ঔষধ খাওয়ান চিকিৎসার উদ্দেশ্য হইতে পারে না, কিন্তু আজ কাল তাহাই ভয়ানক রকম হইয়া দাঁড়াইয়াছে! এ স্থলে চিকিৎসা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

প্রায় এক শত বৎসর পূর্ব্বে পাশ্চাত্য দেশে কোন প্রকার ব্যারাম হইলেই রক্ত মোক্ষণ করিয়া চিকিৎসা হইত। আমাদের দেশেও ৫০।৬০।৭০ বৎসর পূর্ব্বে নাপিতরা ঐরূপ রক্ত মোক্ষণ

করিয়া কোন কোন ব্যারাম আরাম করিত। তৎ সম্বন্ধে একটী প্রবাদ আমাদের দেশে প্রচলিত আছে, যথা :—

"চালিয়ে দিলাম নরুন, তায় রোগী মরুণ বাঁচুন।"

জগতের শিরোমণি জর্জ্জ ওয়াসিংটন ঐ রক্ত মোক্ষণ প্রণালীর চিকিৎসায় প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। আজ কাল প্রমাণীকৃত হইয়াছে যে, ঐ মহাত্মা অকালে সমন সদনে প্রেরিত হইয়াছেন। ঐ রূপ প্রণালীতে চিকিৎসা না হইলে মহাত্মার জীবন আরও কিছু কাল থাকিত যদ্দ্বারা জগতের আরও অনেক উপকার হইতে পারিত। যিনি মরিলেন এবং যাঁহারা ঐ প্রণালীর চিকিৎসায় মরিয়াছেন, তাঁহারা জানিতেন না যে শত বৎসর পরে লোকে বলিবে, তাঁহাদের জীবনপ্রদীপ অযথারূপে অসময়ে গোটা কতক হাতুড়ে ও অনভিজ্ঞ চিকিৎসক নির্ব্বাপিত করিয়া দিয়াছে। ঐ প্রণালীর চিকিৎসা আজ কাল আর নাই, উঠিয়া গিয়াছে, লোকের আর উহাতে বিশ্বাসও নাই। তৎপরিবর্ত্তে যে প্রকার চিকিৎসা বর্ত্তমান সময়ে চলিতেছে তাহাও যে অভ্রান্ত নয় এ কথা অনেকেই স্বীকার করেন; আজ কাল কার ডাক্তার ও কবিরাজগণের মুলমন্ত্র এই, "যদি এই এই প্রকার ব্যারাম হাতে পড়ে, তবে এই এই ব্যবস্থা করিও, তাহাতে কোন ফল না পাইলে ঐ ঐ ব্যবস্থা করিবে"। অর্থাৎ সমস্তই সন্দেহ ও অনিশ্চিতের মধ্যে রহিয়া গেল। তবে বলুন দেখি কোন্ রোগটা এ প্রকার অনিশ্চিৎ চিকিৎসায় আরাম হইবে? এই অনিশ্চিত চিকিৎসা করিয়া রোগটা যখন পুরাতন ও জটিল হইয়া যায় তখন

তো আর কিছুতেই আরোগ্য করিতে পারেন না, জ্বরই বলুন, আর হৃদ্‌রোগই বলুন বা শিরঃপীড়াই বলুন বা পেটের ব্যারামই বলুন। এ কথা ভুক্তভোগী রোগী যত উপলব্ধি ও হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন, অন্যে ততটা পারিবেন না। আমার একটী আত্মীয় চক্ষু রোগাক্রান্ত হইয়া অনেক ডাক্তারকে রোগ দেখাইয়াছিলেন। প্রায় ছয় বৎসর অনেক বড় বড় ডাক্তারের দ্বারা চক্ষুর চিকিৎসা করানতেও স্থায়ী ফল বা বিশেষ উপকার হয় নাই। যখন একটী নূতন ডাক্তারের নিকট যাইতেন, তিনি পুরাতন ডাক্তারের প্রদত্ত ঔষধ ও ব্যবস্থা শুনিয়া নিন্দা করিতে করিতে বলিতেন "Some of the medicines have done you positive injnry অর্থাৎ "কতগুলি ঔষধ আপনার বিশেষ অনিষ্ট করিয়াছে"। তিনি আবার নূতন ঔষধ ও নূতন ব্যবস্থা দিতেন। সেই রূপ আবার তাঁহার ব্যবস্থা অন্য আর এক জনের নিকট খারাপ ও অনিষ্টকর বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। চক্ষুর অবস্থা ক্রমেই খারাপ হইতে চলিল এবং হাজার হাজার টাকাও চিকিৎসায় খরচ হইয়া গেল! এই রূপ হইতে হইতে আমার সেই আত্মীয়ের মনে প্রচলিত চিকিৎসা প্রণালীর উপর অবিশ্বাস কেবল মাত্র হইতে-ছিল এমন সময় মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। সামান্য একটু জ্বর তাঁহার হইল। জ্বরের ঔষধের সঙ্গে দাস্তের ঔষধও মিশ্রিত করিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু পথ্যাদির কোন সুবন্দবস্ত হইল না, অর্থাৎ যে সকল কুপথ্য সকল ক্ষেত্রেই হইয়া থাকে, এ ক্ষেত্রেও

তাহাই হইয়াছিল। ১০।১২ দিন পরে আবার পেটের গোলমাল বেশি রকম হইতে লাগিল। রাত্রি দশটার সময় ডুস্ অর্থাৎ অল্প সাবান মিশ্রিত ঈষদুষ্ণ জল গুহ্যদ্বারে প্রবেশ করানর একটু পরেই দাস্ত হইল। এই কাল-স্বরূপ মল-ত্যাগ করিতে করিতেই বলিয়া উঠিলেন "ওরে আমাকে কিছু খেতে দে"। অব্যবহিত পরেই জল-বারলি খাইতে দেওয়া হইল। অস্বাভাবিক রূপে দাস্ত করানতে যে দুর্ব্বলতা আসিল, যে একটী শক্তির অভাব হইল তাহা জীবনীশক্তি পূরণ করিতে পারিল না। উত্তেজনার পর অবসন্নতা সকলেই বুঝিতে পারেন, এবং কোন উত্তেজক দ্রব্য বা ঔষধ খাইলেই ঐ অবসন্নতা দূর হয়, তাহাও সকলে বুঝিতে পারেন। কিন্তু ঐ অবসন্নতা দুরীকরণ বা শক্তির-অভাব-পূরণ কোথা হইতে হয়? একটী সঞ্চিত শক্তি (Reserve force) দেহের মধ্যে লুক্কাইত ভাবে না থাকিলে ঐ অভাব পূরণ হইতে পারে না। কিন্তু ঐ সঞ্চিত শক্তি বা জীবনীশক্তিরূপ কোষাগার আজীবন অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে ৩০।৪০ বৎসর পর্য্যন্ত নানাপ্রকারের অতিরিক্ত অভাব পূরণ করিতে করিতে যখন শূন্য হইয়া যায় তখন যে কি প্রকার অভাব বোধ হয় তাহা বর্ণনা করা কঠিন। সর্ব্ব শরীরে একটা মহা অশান্তি খেলিতে থাকে, পিঞ্জরাবদ্ধ প্রাণপাখিটী একটু অবলম্বনের সামগ্রী পাইবার জন্য ছট্‌পট্ করিতে থাকে, কিন্তু হায়! সে সামগ্রীর অতিরিক্ত খরচ হওয়ায় তাহা অসময়ে শেষ হইয়া গিয়াছে! আমার সেই আত্মীয়েরও সর্ব্ব শরীরে একটা মহা অশান্তি খেলিতে লাগিল।

গাত্রে, মাথায়, সর্ব্বদেহে এবং দেহের প্রত্যেক স্থানে হাত বুলান হইতে লাগিল এবং রীতিমত শুশ্রূষা করাতে একটু তন্দ্রাভাব আসিল; স্বপ্নময় নিদ্রা ৫।৬ ঘণ্টা হইল; তারপর আবার ক্ষুধা বোধ হওয়ায় আবার বারলি দেওয়া হইল। এবার স্বহস্তে খাইতে পারিলেন না। খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। তার পর পুনরায় দাস্ত হইল; এবার পাইখানায় ধরাধরি করিয়া লইয়া যাইতে হইল এবং ধরাধরি করিয়া লইয়া আসিতে হইল। দাস্তর পর আরও দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেন। প্রাতঃকালে চা পান করার পর পুনরায় আর একটী দাস্ত হইল ও সেই সঙ্গে প্রাণ-বায়ু বাহির হইয়া গেল! উপরোক্ত মৃদু বিরেচকই মৃত্যুর কারণ হইল! কত সময় কত লোক কত প্রকার উত্তেজক দ্রব্য, কত প্রকার উগ্র-বিরেচক ব্যবহার করে, তাহার ফলে দেহ-যন্ত্রটী কিছু সময় যাবৎ শিথিল অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় সতেজ অবস্থা প্রাপ্ত হয়. কিন্তু দেখুন সেই প্রকার একটী লোক সামান্য ও মৃদু-বিরেচক ব্যবহার করায় দেহ-যন্ত্রটী এতই উত্তেজিত হইল যে, তাহাতে দেহের সমুদয় বন্ধন গুলি ছিঁড়িয়া গেল। জীবনী-শক্তির অবস্থা বিশেষরূপ বুঝিয়া কোন্ চিকিৎসক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন? উত্তরে বলিবেন, "তাহা না বুঝিলে তো ঔষধ প্রয়োগ করাই যায় না"। ঔষধের গোলা গুলি খাইয়া সামান্য রকম জখম হইয়া যদি রোগী বাঁচিয়া উঠে, অর্থাৎ যদি রোগী পূর্ব্বের সুস্থতা সম্পূর্ণ রূপে

লাভ না করে, তবে কেমন করিয়া বুঝিব যে, তাহার পক্ষে ঔষধ প্রয়োগ ঠিক হইয়াছে? এইটী অনুসন্ধানের বিষয়। অনুসন্ধান করিয়া দেখিবেন, কয়জন রোগী ঔষধের গোলা খাইয়া বেদাগ বাহির হইয়া আইসে। গোলা খাইয়া যদি চারি আনা লোক মরে এবং বার আনা লোক কোন প্রকারে শরীর লইয়া বাহির হইয়া আইসে অর্থাৎ কেহ যদি একটী চক্ষু হারাইয়া, কেহবা যদি একটি পা হারাইয়া, অথবা কেহবা একটু শক্তি হারাইয়া পুনরায় ধরাধামে অবস্থান করিতে পারে, অল্পকালের জন্যও অবস্থান করিতে পারে, তাহা হইলেই সকলে বলিয়া থাকে যে ঔষধ প্রয়োগ ঠিক হইয়াছে। অনুসন্ধিৎসু পাঠকের এবং পুরাতন রোগীর এইটী চিন্তার বিষয়।

উক্ত রোগীকে অস্বাভাবিক রূপে দাস্ত না করাইলে সে দিন কখনই তাঁহার মৃত্যু হইত না! তবে সর্ব্ব প্রকারে প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভাবে জীবনযাপন করার ফল অবিলম্বেই অর্থাৎ ২।৩ বৎসরেই ফলিত। কিন্তু এই রূপ রোগী প্রাকৃতিক নিয়মে থাকিয়া আরও কত কাল বাঁচিয়াছে তাহা পূর্ব্বের উদাহরণ পাঠে জানিয়াছেন। ডাক্তার কবিরাজগণ হতাশ হইয়া যে সকল রোগীকে মৃত্যুর অনতি পূর্ব্বে অত্যন্ত তেজস্কর ঔষধ দিয়া থাকেন, তাহাতে রোগী মরিয়া গেলেও রোগীর শরীর অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত গরম থাকে; লোকে ইহাকে "ঔষধের গরম" বলে। কিন্তু ভাবে না যে, নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপকে উস্কাইয়া নির্ব্বাপিত করা হইয়াছে। তেজস্কর ঔষধটী প্রয়োগ না করিলে

আরও বিলম্বে মৃত্যু হইত। এ সকল তত্ত্ব অনুসন্ধান করা ত দূরের কথা,—কবিরাজ ও ডাক্তারকে আমি দেখিয়াছি তাহারা দ্বিধাশূন্য হইয়া অত্যন্ত তেজস্কর ঔষধ অতি শিশুর উপরে এবং অতি বৃদ্ধের উপরে মাত্রার দোহাই দিয়া সমানে মৃত্যু পর্য্যন্ত অনবরত প্রয়োগ করিয়া থাকে, তাহাতে রোগের কিছুমাত্র উপশম না হইয়া যদি রোগ বৃদ্ধিও হয় তবুও কেহ বাঙনিষ্পত্তিটী পর্য্যন্ত করেন না; কারণ প্রত্যেকের বিশ্বাস যে, ঔষধের ষোল আনাই গুণ, দোষের ভাগ উহাতে নাই। সমস্ত দোষ কপালের উপর পড়ে। "অচিকিৎসায় মরা ভাল তবু কুচিকিৎসা করা উচিত নয়," যে রোগী এই চলিত কথাটীর অর্থ বুঝিবে সে দেখিতেও পাইবে দোষ কোথায়, অর্থাৎ দোষটী বাস্তবিক কপালে কিম্বা অন্য স্থানে। পুরাতন রোগী মাত্রই কুপথ্যে এবং ঔষধ রূপ বিষে জর্জ্জরিত হইয়া আরও শীঘ্র মরে তাহাতে আমার অনুমাত্র সন্দেহ নাই। ক্রমাগত ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন অথচ রোগ ভাল হইতেছে না; তবে সে ঔষধে কি ফল প্রসব করিবে? কুফল ব্যতীত সুফল কখনই হইতে পারে না। এই ঔষধরূপ বিষ শরীরকে দগ্ধ করিয়া অকালে পাতন করে।

জীবনীশক্তি কত বার এবং কত কাল ধরিয়া অভাব পূরণ করিবে? ঔষধ শরীরের মধ্যে প্রবেশ করাইলে কোন না কোন যন্ত্রের উত্তেজনা করাইবেই, এবং এই উত্তেজনায় সঞ্চিত শক্তির কিছু না কিছু ক্ষয় হইবেই, যে ক্ষয়ের ফল স্বরূপ অব্যবহিত পরেই

অবসন্নতা আইসে। ঔষধের এই অপকারটী মানুষ সহজে বুঝিবে না। মাদকদ্রব্যসেবী প্রত্যহ উত্তেজিত হয় এবং প্রত্যহ অবসন্নও হয়। মাদক দ্রব্য খাইবার সময় অর্থাৎ 'মওতাতের' সময়টা বড়ই অবসন্নতা বোধ করে। নেশাটী সেবন করার পর,আবার সে দিনমান বেশ উত্তেজনার সহিত চলিতে থাকে; কিন্তু ঐ দৈনিক উত্তেজনার সহিত সঞ্চিত শক্তি ক্রমে ক্রমে ক্ষয় হইয়া জীবনীশক্তি 'দেউলিয়া' প্রাপ্ত হইতেছে, তাহা যদি কোন ৬০।৭০ বৎসর বয়স্ক মাদকদ্রব্যসেবীকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন,তবে সে হাসিয়া বলিবে, "মাদকদ্রব্যটী না খাইলে কোন্ কালে মরিয়া যাইতাম।" জীবনীশক্তির প্রকৃত তত্ত্ব যত দিন মানুষ বিশেষরূপে অবগত না হইবে ততদিন ঔষধের আপাতমধুর গুণে মুগ্ধ হইয়া থাকিবে। জীবনীশক্তিটি কি? উহার স্বরূপ কি কেহ নির্ণয় করিয়াছেন? না, উহা আরও অনেক তত্ত্ব বিষয়ের ন্যায় গুহাতেই অবস্থিত আছে এবং গুহাতেই থাকিবে? খাওয়ার দোষে জীবনীশক্তি কিরূপ আহত প্রতিহত হইয়া কষ্টের সহিত অন্নময় কোষ বা দেহকে বহন করে এবং ঔষধ সেবনে উহা কি প্রকার আহত হয়, তাহা প্রত্যক্ষ অনুভব করিয়া বুঝিতে হইবে; বুঝান বড় কঠিন; কারণ এ তত্ত্বটী অত্যন্ত গভীর। কোন দ্রব্যের আপাতমধুর গুণে কে কত দিন ধরিয়া মুগ্ধ থাকে? কোন না কোন সময় উহার দোষ বাহির হইয়া পড়িবেই। পাশ্চাত্য জগতের অনেক লোক ঔষধের আপাতমধুর গুণে আর মুগ্ধ হয়েন না। পাশ্চাত্য জগত আমাদের নেতা;সুতরাং এ দেশের লোকও

আর অধিক কাল মুগ্ধ থাকিবে না। ব্যক্তিগতভাবে যিনি কোন ঔষধের বা কোন মাদকদ্রব্যের অপকারিতা বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন, তিনি তাহা তৎক্ষণাৎ বা অনতিবিলম্বে পরিত্যাগ করিয়াছেন, পূর্ব্বের উদাহরণ পাঠে তাহা অবগত হইয়াছেন। আমেরিকার একটী লোক ৮০ বৎসর বয়সের সময় তামাকের অপকারিতা বুঝিয়া তাহা পরিত্যাগ করিয়া পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ শরীরে আরও অনেক বৎসর জীবিত ছিলেন। ইচ্ছা, চেষ্টা, দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও অধ্যবসায় থাকিলে কিছুই অসম্ভব হয় না।

পূর্ব্বেকার রক্ত মোক্ষণ করিয়া চিকিৎসা এবং আজকালকার ডাক্তারি কবিরাজি চিকিৎসায় প্রভেদ এই যে, পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে রোগীকে অধিক দিন যাতনা পাইতে হইত না; দুই এক দিনের মধ্যেই "হয় এস্পার, নয় ওস্পার" যা হয় একটা হইয়া যাইত। কিন্তু আজকালকার প্রণালীতে রোগী ক্রমশঃ রক্তহীন, বলহীন এবং রোগের নানা উপসর্গে বিজড়িত হইয়া আস্তে আস্তে অশেষ প্রকার যাতনা পাইয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িতেছে। কিল মারিয়া কাঁটাল পাকাইতে গেলে কাঁটাল যেমন না পাকিয়া 'দরকচা' মেরে যায়, আমাদেরও ঔষধরূপ কিল খাইয়া তাহাই হইতেছে। অর্থাৎ রোগ না সারিয়া "দরকচা মেরে যায়" বা জটিল (complicated) হইয়া যায়। দেখুন, আজকাল সকল ব্যারামই ঐরূপ। সোজা (simple) আর নাই, সব জটিল (complicated) হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই দরকচা মারা কথার ভাবটা আমরা যা ফোড়ার চাক্ষুষ

দেখিতে পাই। একটা ক্ষত রোগে আপনি জলপটি ঢল করিয়া বাঁধিয়া এবং অনুত্তেজক ও অল্প পরিমাণ পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দেখিবেন, ক্ষতস্থানটী অতি অল্প সময়ে বেদাগ আরাম হইয়া যাইবে; কিন্তু ঐ প্রকার আর একটী ক্ষত স্থানে নানাপ্রকার ঔষধ দিয়া কসিয়া বাঁধিয়া রাখুন, অথবা অস্ত্রাদি প্রয়োগ করিয়া চিকিৎসা করুন, দেখিবেন, ঐ স্থানটী অর্থাৎ রোগটী দরকচা মেরে যাবে। শীঘ্র আরাম হইবে না; জীবনী-শক্তি সতেজ থাকিলে বহু দিন পরে বহুকষ্ট পাইয়া যদিও বা ভাল হইবে কিন্তু বেদাগ সারিবে না। জন্মের মত একটা দাগ থাকিয়া যাইবে; অথবা আবের মত একটা মাংস বৃদ্ধি হইয়া থাকিবে। ভাবুন দেখি, দেহের অভ্যন্তরস্থ কোন যন্ত্রের যদি ঐরূপ দশা হয় তবে রোগীর অবস্থাটা কি ভয়ানক হইয়া দাঁড়াইবে। আপনার শত চেষ্টা বা পরিশ্রমে বৃক্ষের একটী পত্রও পড়িবে না, যতক্ষণ উহা আপনি খসিয়া না পড়ে। জোর করিয়া টানিয়া ছিঁড়িলে পাতার সঙ্গে গাছের ছাল ছিঁড়িয়া আসিবে। প্রকৃতির নিয়ম বার বার উল্লঙ্ঘন করিয়া, কত শত বার অবহেলা করিয়া যখন জ্বর, মাথাধরা, খাইবার অনিচ্ছা প্রভৃতি উপসর্গ সহ পড়িয়া থাকা যায়, এই অবস্থায় ঔষধরূপ কিল খাইয়া মরিতেছি কি না তাহা রোগা এবং চিকিৎসক উভয়েরই বুঝা উচিত। বুঝিলে প্রকৃতি অনুযায়ী ব্যবস্থাই হইবে। যাহা দুই এক দিন উপবাসে এবং রোগের কারণগুলি সরাইলে নির্দোষ হইয়া সারিত, তাহা তদপেক্ষাও শীঘ্র সারাইতে গিয়া এক দিন দুই

দিনের স্থানে এক মাস দুই মাস কষ্ট হয়, এবং শরীরটা আরও বিকৃতভাবাপন্ন হইয়া পড়ে। ঔষধে তো এইরূপ ফল হয়, তবুও লোকে বলিবে, "ঔষধ তো হ'লো', বাঁচা মরা ভগবানের হাত"। যেমন সেই পূর্ব্বকালের নাপিতের কথা,—"চালিয়ে দিলাম নরুন, তাতে রোগী বাঁচুন মরুন।" যে কথার আজ কাল কার পাঠান্তর,—"ভাল কর্‌তে পারিনে, মন্দ কর্‌তে পারি, কি দিবি তা বল্‌"।

আমি অনেক রোগীর মুখে শুনিয়াছি এবং অনেক চিকিৎসকের নিকটও শুনিয়াছি যে, "ঔষধে বড় কিছু হয় না, রোগ তো প্রায় আপনিই সারে," এবং মা জননীগণ তো প্রায়ই বলেন, "ওষুদে অসুখটা আঁটকে রাখে"। কথাটী ঠিক। অসুখের অর্থ শরীরের বিষ বা গ্লানি; ঐ বিষের উৎপত্তিস্থান হইল পেট; শরীরের ঐ বিষকে বাহিরে নির্গত করিবার চেষ্টার নাম রোগ বা ব্যারাম। ঐ চেষ্টাকে ঔষধ দিয়া বাধা দিলে, যেমন কুইনাইন প্রভৃতি দিয়া জ্বরকে বাধা দিলে, শরীর কুইনাইনের প্রভাবকে পরাজয় করিয়া আবার জ্বররূপে স্বীয় গ্লানি সমুদয় নির্গত করিবে। স্বভাবের এই নিয়ম। সুতরাং ঐ নিয়মের অনুযায়ী ঔষধ যদি দিতে পারেন তবে দেন; নচেৎ প্রচলিত প্রণালীতে ঔষধ দিয়া এ নিয়ম অতিক্রম করিতে গেলে তাহাতে তো কোন ফল হইবেই না, অধিকন্তু শরীরের ঐ গ্লানি নির্গত করিবার জন্য দুনো মেহনত (পরিশ্রম) করিতে হয়। প্রথমতঃ ঔষধের বিষের পরাক্রমকে

জয় করা, দ্বিতীয়ত জ্বর বা গ্লানিকে নির্গত করা। কারণ, ঔষধের ক্রিয়া শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অথবা পরে যখন শরীরে গ্লানি অনুভব হয় তখন বুঝিতে হইবে গ্লানিটা সমূলে বাহির হয় নাই ; ঔষধে চাপা পড়িয়াছিল। প্রথম শত্রুকে অর্থাৎ ঔষধকে জয় করিবার শক্তি যদি শরীরে না থাকে তবে সে শরীরের পতন হইল ; অর্থাৎ রোগী মরিল। জীবনীশক্তি অধিক না থাকিলে উভয় শত্রুকে যুগপৎ পরাজয় করিতে পারা যায় না। এই প্রকার যুদ্ধে জীবনীশক্তি যে হ্রাস হইয়া যায় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অথচ ঔষধরূপ আর একটা শত্রু না ঢোকাইলে শরীর স্বীয় প্রভাবে ব্যাধিটাকে সমূলে উচ্ছেদ করিয়া বাহির করিয়া দিত। ইহাকেই বলে "রোগ আপনিই সারে" এবং এই টুকু যদি চিকিৎসকেরা বুঝাইতে চেষ্টা করেন, অর্থাৎ "কুপথ্য করিব অথচ ঔষধ খাইয়া ব্যারাম ভাল হইবে, এ কিছুতেই হইতে পারে না," এই সার কথা যদি রোগীকে বুঝাইয়া দিতে পারেন তবেই তাঁহাদিগকে ও তাঁহাদের চিকিৎসাকে ধন্যবাদ দিব। এই বিষয়টি চীন দেশের লোক ভাল বুঝে। শরীর যতদিন সুস্থ থাকে ততদিন চীনবাসীগণ চিকিৎসককে বেতন দেয়। অসুস্থ হইলেই তাহারা চিকিৎসকের বেতন বন্ধ করিয়া দেয়। সুতরাং চিকিৎসক তাঁহার প্রভুর স্বাস্থ্য যাহাতে সর্ব্বদা ভাল থাকে তজ্জন্য সর্ব্বদাই বিশেষরূপ চেষ্টা করিয়া থাকেন। আমাদের শাস্ত্রে কি বলে? সুস্থ ব্যক্তিকে সুস্থ রাখা এবং অসুস্থকে সুস্থ করা চিকিৎসার একমাত্র উদ্দেশ্য।

এক বৎসরের ঊর্দ্ধকাল যাবৎ যে রোগ শরীরকে আক্রমণ করিয়া থাকিবে তাহা প্রায়ই অসাধ্য অর্থাৎ সে সকল ক্ষেত্রে ঔষধ চলিবে না। সাধ্যব্যাধিও আবার নিম্ন লিখিত ব্যক্তির পক্ষে দুঃশ্চিকিৎস্য হইয়া থাকে, যথা,—শ্রোত্রীয় (অতি বুদ্ধি সম্পন্ন বিদ্বান বা খুব শেয়ানা লোক), নৃপতি, স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, ভীরু, রাজসেবক (চাকুরে), শঠ, দুর্ব্বল, বৈদ্যবিদগ্ধ (চিকিৎসককে বুঝিতে দিবে না), ব্যাধিগোপক (রোগ গোপন করিয়া রাখে), দরিদ্র, কৃপণ, ক্রোধী, অসংযত-চরিত্র এবং অনাথ। এমন লোক কে আছে যাহার উপর উক্ত বিশেষণ পদের একটীরও ব্যবহার হয় না? নাই। সুতরাং বর্ত্তমান ক্ষেত্রে ঔষধ প্রয়োগ হইতেই পারে না। যে আর্য্যঋষিগণ অন্তর্জ্জগতের সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতম বিভাগে প্রবেশ করিয়া প্রাণায়াম ও নানা প্রকার আসনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, কোন্ তিথিতে কি আহার করা কর্ত্তব্য, এ সকল কথাও যাঁহারা বলিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের অধম সন্তানসন্ততিগণ দু পাতা উলটাইয়া বা খল উদুখল লইয়া চিকিৎসা শাস্ত্রটা একটা খেলার সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছে! তাহাতে ঔষধ মুষলবৎ কার্য্যকরী হইয়া আমাদিগকে ত্বরায় ধ্বংশ করিতেছে! তাহাদেরই বা কি দোষ? যজমান যেমন, তাঁর যাজকও তো তেমনি হইবে! পাশ্চাত্য জগতের স্রোতে পড়িয়া চিকিৎসাকে ঔষধ বেচায় পরিণত করিয়াছে! বুদ্ধিবৃত্তিও তদনুরূপ হইয়াছে। চিকিৎসা শাস্ত্র বলিতেছে,—স্ত্রীলোকের সহিত একাসনে উপবেশন, পরস্পর আলাপ, পরিহাস ত্যাগ করিবে।

তাহাদের নিকট হইতে প্রদত্ত অন্ন ভিন্ন অন্য উপহার গ্রহণ করিবে না। লোভে পড়িয়া বাজারের জিনিষের ন্যায় চিকিৎসা বিক্রয় করিবে না। ধনশালীর নিকট হইতে প্রাণ যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী মাত্র অর্থ লইবে। এই তো শাস্ত্র বলে। কিন্তু চিকিৎসক শাস্ত্র অধ্যয়ণ শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই উপদেশ ভুলিয়া গিয়া ঔষধ বেচিতে আরম্ভ করেন! নিত্যই নূতন একটা ব্যবস্থা দেওয়া চাই; প্রথম ব্যবস্থা পত্রে রোগীর রীতিমত উপকার হওয়া সত্ত্বেও প্রাত্যহিক দর্শনি আদায় ও ঔষধ বিক্রয় করার উদ্দেশ্যে এবং রোগীরও অনেক স্থলে মন বুঝাইবার জন্য সেই সকল ব্যবস্থাও পরিবর্ত্তন করিয়া থাকেন!

পাশ্চাত্য দেশে আজ কাল অনেক চিকিৎসক প্রাকৃতিক নিয়মে চিকিৎসা করেন; এবং তদ্দ্বারা যেরূপ মঙ্গল জনক ফল প্রাপ্ত হয়েন, বোতল বোতল ঔষধ খাওয়াইয়া তাহার সিকি ফলও পান না। এই নবপদ্ধতির চিকিৎসায় তাঁহাদের বিশ্বাস, এবং যে সকল রোগী নানা প্রকার ঔষধ ব্যবহার করিয়া হতাশ হইয়া প্রাকৃতিক নিয়মে থাকিয়া আরোগ্য লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের বিশ্বাস, যত অচল অটল হইবে, তত অন্যের হওয়া বড়ই কঠিন। ইঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে ঔষধে পুরাতন জ্বর সারে না, গ্রহনি সারে না, হৃদরোগ সারে না, হাঁপানি আরাম হয় না, অর্শ আরোগ্য হয় না, শূলে ঔষধ নিষ্ফল, দন্তশূল, অম্লবেদনা, উদরি, সঙ্কুচিত আমাশয়, উন্মাদ, মূর্চ্ছা, ম্যালেরিয়া, কলেরা, কুষ্ঠ, বসন্ত, বাত, অর্দ্ধাঙ্গ, ভগন্দর,

অজীর্ণ (dyspepsia), অনেক প্রকার শির রোগ ও চক্ষু রোগ, গলগণ্ড, আব, রক্তপিত্ত, যক্ষ্মা, হারনিয়া (hernia), শোথ, কোষবৃদ্ধ, প্রমেহ অর্থাৎ জননেন্দ্রিয়ের যাবতীয় রোগ, বহুমূত্র, যকৃতের দোষ, প্রদর, বাধক বেদনা, সুতিকা, দন্ত রোগ, এবং আরও অনেক রোগ ঔষধ দ্বারা যায় না। এমন কি, সামান্য ব্যারাম যথা—ঘাড়ে বেদনা, অথবা দাঁতে বেদনা, অথবা মাথার বেদনা তাহাও ঔষধে সারে না। ১০।১২ বার দাঁতের গোড়া ফুলিল, ১০।১২ বার অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া বা তথায় কত প্রকার ঔষধ প্রয়োগ করিয়াও সারিল না, অথচ সেই দাঁতের টাটানি ও ফোলা পূর্ব্বোক্ত স্বাভাবিক আহারের গুণে ভাল হইল! যে স্বপ্নদোষ কত শত ঔষধ ও বটিকা, এমন কি, আফিম সেবন করিয়াও সারিল না, তাহা অনুত্তেজক আহারে এবং রাত্রে অনাহারে অথবা ক্ষুধা অনুসারে বৈকালে বা সন্ধ্যার পূর্ব্বে কম আহারে এবং প্রত্যহ দিবা রাত্রে তিন বার তলপেট ধৌত করিয়া সারিল! মাংস বৃদ্ধি রোগ হইল, দশ বার কাটাইল, তবুও মাংস বৃদ্ধি হইল! প্রতি বার কষ্ট করিয়া কাটায়, প্রতি বারেই আবার আস্তে আস্তে মাংস বৃদ্ধি হয়, তবুও কেন কাটায়? কেননা, ঐ স্রোতে পড়িতেই হইবে;—"মরা ভগবানের হাত, বাঁচা ডাক্তারের হাত," এই বিপরীত ভুল বিশ্বাস হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া আছে! এবং একবারও মনে ভাবে না, রোগের মূল কোথায়!

মূল ব্যারাম কি, ও কোথা হইতে উহার উৎপত্তি তাহা যতক্ষণ নির্ণয় না হইবে, ততক্ষণ যত ঔষধ দেওয়াই হউক না

কেন, কোন ফল হইবে না। বরং অযথা ঔষধ প্রয়োগে পেট বিপর্য্যস্ত হইয়া, পরিপাক ক্রিয়া ঠিক না হইয়া শরীর যত দুর্ব্বল হইবে ব্যারামও তত তেজ করিয়া উঠিবে। "লক্ষণের উপর ঔষধ প্রয়োগ করিবে" ঐ মূল মন্ত্রে আর কাজ হয় না। এক অজীর্ণ হইতে, না হইতে পারে এমন ব্যারাম নাই। অজীর্ণ হইতে কোষ্ঠবদ্ধ, তাহা হইতে অর্শ, তাহা হইতে ভগন্দর, তাহা হইতে রক্তপিত্ত, তাহা হইতে হাঁপানি, তাহা হইতে যক্ষ্মা, জ্বর, অনিদ্রা, প্রমেহাদি প্রভৃতি সমস্ত ব্যাধিই হইতে পারে। তখন এক বৃক্ষ অঙ্কুরিত হইয়া নানা প্রকার শাখা প্রশাখা সহ বর্দ্ধিত হইলে, ঐ বৃক্ষের মূলে আঘাত না করিয়া শাখা প্রশাখা সকল কর্ত্তন করিতে যাওয়া মূর্খতা নয় কি? মূল ব্যারামটী এবং তাহার কারণ থাকিয়া গেল; তাহার গোটা কয়েক শাখার উপর চিকিৎসা হইতে লাগিলে কোন ফল হইতে পারে না। বরং ডাল পালা ছেঁটে গাছকে শাসিয়ে দিলে যেমন হয় সেইরূপ ফল ঐরূপ চিকিৎসায় হইয়া থাকে। কিন্তু মূলে আঘাত করিলেই সকল লক্ষণ বা উপসর্গ একে একে দূর হইয়া যাইবে। প্রাকৃতিক চিকিৎসকগণের মূল মন্ত্র এই—"ব্যারামের উৎপত্তি স্থানে চিকিৎসা কর, স্থান ভ্রষ্ট হইলে রোগ সমূলে উৎপাটিত হইবে; শরীর রোগশূন্য হইবে; এবং ব্যারামের অঙ্কুর অবস্থা হইতেই এই প্রণালীতে চিকিৎসা করা যায়"। এ কথা আমাদের দেশে নূতন না হইলেও, নূতন বলিতে হইবে, কারণ, উহা পাশ্চাত্য দেশ হইতে আসিতেছে! আমাদের শাস্ত্রে আছে,—"অজীর্ণ দমায়তে

রোগস্তস্মাদ্ রক্ষেদজীর্ণতঃ;" অর্থাৎ "অজীর্ণ হইতে সমুদয় রোগের উৎপত্তি, অতএব অজীর্ণ হইতে রোগীকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিবে"। কিন্তু কোন্ চিকিৎসক সেরূপ করেন? সকলেই ডাল পালার উপর চিকিৎসা করিতেছেন। চক্ষুরোগে চক্ষে ঔষধ বা প্রলেপ, দন্তরোগে দন্তে আরক বা গালে প্রলেপ, বাতের ব্যথায় ব্যথা স্থানে মালিষ বা প্রলেপ প্রভৃতি কিছুই প্রয়োগ করিতে হয় না, যদি রোগের কারণ গুলিকে সরাইবার চেষ্টা করা যায়। ঔষধে ব্যথাস্থানটী ক্ষণকালের মত অসাড় করিয়া দেয় মাত্র, তাহাতে রোগটী সমূলে উৎপাটিত হয় না।

আহারের গুণে শরীর সুস্থ থাকে, এবং আহারের দোষ হইলে দোষ জন্মিয়া শরীরকে অসুস্থ করে। আবার এক আধ্ দিন না খাইলেই দোষ চলিয়া যায়, শরীরটীও সুস্থ হইয়া যায়। কিন্তু ঐ দোষকে সামান্য মনে করিয়া কে না উপেক্ষা করে? ক্রমাগত উপেক্ষা করিয়া যখন রোগের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করে তখন রোগীকে চিকিৎসক এই বলিয়া বুঝাইবেন;—"এই জ্বরটী বা রোগটী সামান্য অত্যাচারে হয় নাই, শরীর খুব সহ্য করিয়াছে, যথেচ্ছাচার করিবে বলিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সংসারে আইস নাই, যথেচ্ছ ইন্দ্রিয় অত্যাচার করিতে কোন বাধা পাও নাই; আহার করিবার জন্য জীবনধারণ নয়, কিন্তু জীবনধারণ করিবার জন্যই আহার; ইহা জান না বলিয়াই যথেচ্ছাচার করিয়াছ এবং আজীবনটা আহার দুই চারিবার মুখে আলোড়ন করিয়া গিলিয়া খাইয়াছ; কি করিয়া খাইতে হয়

অর্থাৎ মুখের গ্রাস চর্ব্বণ করিতে করিতে উহা সম্পূর্ণ আস্বাদ-বিহীন যতক্ষণ না হইবে ততক্ষণ পর্য্যন্ত চর্ব্বণ করিতে হইবে, কেহই তাহা শিখাইয়া দেয় নাই; চর্ব্ব্য খাদ্য জীর্ণ করিতে মুখের লালা নিতান্ত দরকার; যদি চর্ব্বণ করিতে না পার তবে চর্ব্ব্য খাদ্য খাইও না; কেবলমাত্র দুগ্ধ পান শরীরের অবস্থা বুঝিয়া করিবে; কারণ দুগ্ধ জীর্ণ করিতে লালার আবশ্যক হয় না। আহার করিবার সময় ক্রমাগত জল উদরস্থ করিয়া পেটের আগুন নিবাইয়া ফেলিয়াছ; তদ্ব্যতীত দূষিত জল ক্রমাগত পান করিয়া থাক; মেঘের বারি সর্ব্বাপেক্ষা বিশুদ্ধ, মৃত্তিকায় পতিত হইয়া যত উহাতে নানা প্রকার ময়লা মিশ্রিত হইবে ততই উহা দূষিত হইবে; কি কি দ্রব্য খাওয়া উচিৎ কেহই তাহা বলিয়া দেয় নাই; এ সম্বন্ধে প্রকৃতির আদেশ বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে লঙ্ঘন করিতেই শিক্ষা পাইয়াছ! আহারের মাত্রা দেখিলে এই বিশ্বাস হয় যে, কতগুলা খাদ্য, হজম করিতে পার বা না পার, উদরে প্রবেশ করাইয়া দাও; উদরের লইবার শক্তি থাক্ বা না থাক্, মুখরোচক হইলেই হইল; গাত্রে কতগুলা আহার বাঁধিয়া গাত্রের সহিত জড়াইয়া রাখিতে যদি কেহ বলিত, বোধ হয় তাহাও করিতে; কেমন করিয়া মলত্যাগ করিতে হয় তাহাও জান না, কেহই তাহা শেখায় নাই, এ কথা শুনিয়া বোধ হয় হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছ। দুর্গন্ধময় বা রুদ্ধ পাইখানায় অপেক্ষা ফাঁকা স্থানে বা মাঠে মলত্যাগ করা যে কত উপকার জনক তাহা বোধ হয় এ জনমে উপলব্ধি হইল না! এবং

রোগাবস্থায় বায়ু নিঃসরণের বা মলের বেগ হওয়া মাত্রই উহা ত্যাগ করিলে যেরূপ সত্বর রোগ উপসম হয়, পাইখানায় গিয়া পৌঁছান পর্য্যন্ত উহাকে চাপিয়া রাখিলে তত শীঘ্র উপসম হইবে না, অথবা উপসম হইলেও ঐ প্রকৃতি বিরুদ্ধ কর্ম্মের কুফলের বীজ অন্য রকম রোপিত হইয়া থাকিবে। এইরূপে মলত্যাগের বন্দবস্ত বিছানার উপর বা শয্যার নিকট সরা পাতিয়া যদি করিতে হয় তাহাও ভাল। যেরূপ যথেচ্ছাচারিতা করিয়াছ তাহাতে লৌহময় শরীর হইলেও থাকে না; একটী পিপীলিকার এক কণা মিষ্ট দ্রব্য হইলেই যথেষ্ট, তাহার সম্মুখে যদি এক হাঁড়ি গুড় রাখা যায়, সে তাহা খাইতে গিয়া যেমন মারা পড়ে, তোমারও দেখিতেছি সেইরূপ হইতে বসিয়াছে; তাই এখন দায়ে ঠেকিয়া চিকিৎসকের নিকট ঔষধ খাইতে আসিয়াছ! স্বেচ্ছাপূর্ব্বক চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পরের দ্বারা আপনাকে দেখিতে আসিয়াছ! তোমার সমুদয় ব্যাপারই আত্মহত্যার দিকে, বলিতেছ, "ঔষধ দাও": তোমার গলার ফাঁস দিনে দিনে কসিয়া যাইতেছে, এমন কি রোগাবস্থায়ও সে কসুরের কসুর নাই, অথচ "ঔষধ ঔষধ, চিকিৎসক চিকিৎসক" বলিয়া অস্থির হইতেছ! কোথায় ঔষধ প্রয়োগ করিব? তোমার নিজের হাতে যে উপায়গুলি আছে তাহা অগ্রে কর, অর্থাৎ পূর্ব্বলিখিত নিয়মগুলি পালন কর, দেখিবে উহাই তোমার পক্ষে মহৌষধ হইবে। সপ্তাহান্তে বা দুই সপ্তাহান্তে, এমন কি অবস্থাবিশেষে মাসান্তে, অবগাহন করিয়া স্নান কর; প্রত্যহ স্নান করা একটা বদ্ অভ্যাস

হইয়া গিয়াছে, একদিন স্নান বন্দ করিলেই হয়তো মাথা ধরিবে, গা জর জর করিবে; এরূপ যদি হয়, কখন মনেও ভাবিও না যে উহা স্নান বন্দ করার কুফল; স্নান করিলেও যে রকম এবং শরীর স্বভাবতঃ উত্তপ্ত না হওয়া পর্য্যন্ত স্নান বন্দ রাখিলেও যদি শরীরের অবস্থা একই রকম থাকে, তাহা হইলেই জানিবে যে স্নান ঠিকমত হইতেছে অর্থাৎ স্নানের উদ্দেশ্য সাধিত হইতেছে; মধ্যে মধ্যে এবং অবস্থা বিশেষে প্রত্যহ ভিজা গামছা দিয়া সর্ব্বশরীর রগড়াইয়া মুছিবে; (সুস্থ শরীরে দিবসে চারিবার ঐরূপ গাত্র মার্জ্জন কর্ত্তব্য; বেলা ১২টায়, ৩টায়, ৬টায় এবং শয়নের পূর্ব্বে রাত্রি ৯টায়।) এবং তলপেট প্রত্যহ দুই তিনবার উত্তমরূপে ধৌত করিবে। ত্বগেন্দ্রিয়কে কার্য্যকরী রাখা, এবং শরীরের ময়লা তোলা, যদি নানা প্রকারে হইতে পারে এবং অঙ্গমর্দ্দনে যদি তাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট প্রকারে হয়, তবে প্রত্যহ অবগাহন স্নান করিয়া অনর্থক কতক পরিমাণ জল শরীরে প্রবেশ করান এবং সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা লাগানর কোন আবশ্যক নাই। অতিরিক্ত শৈত্য ক্রিয়া করিয়া জীবনীশক্তিকে অতিরিক্ত খাটান দরকার নাই। সপ্তাহে দুইদিন অথবা অন্ততঃ একদিনও যদি ভাপড়া লইয়া অঙ্গমর্দ্দন পূর্ব্বক গাত্রের ময়লা তোলা যায় তবে প্রত্যক্ষ দেখিবে, সেইরূপ স্নানে এবং যেরূপ স্নান প্রত্যহ করিয়া থাক তাহাতে কত প্রভেদ। পরীক্ষা করিলেই বুঝা যাইবে কোন্‌টীতে কত উপকার পাওয়া যায়।

শীত এবং উষ্ণের সামঞ্জস্যই জীবনধারণের হেতু। অতি

শীতে জীবন থাকে না, এবং অতি উষ্ণেও জীবন থাকিতে পারে না। একটী বৃক্ষের প্রত্যেক ফলের প্রতি বিশেষ নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবে, সকল ফলগুলি সমান নহে; পাতার আড়ালে যে ফলগুলি থাকে সেইগুলি বৃহদাকার প্রাপ্ত হয় এবং সম্পূর্ণরূপ পরিপুষ্ট হয়, পাতার ছায়া যে ফলগুলি পায় না, অথবা অল্প ছায়া পায়, সেগুলি ছোট হয় এবং তাহার অনেকগুলি শুকাইয়া যায়। পাতার আড়ালে থাকিলে সূর্য্যের তাপে দগ্ধ হইতে পায় না. বরং শীত ও উষ্ণ এই দুইটী কারণ সমভাবে পাইতে থাকে সেইরূপ পৃথিবীর মধ্যে অতি শীত বা অতি উষ্ণ স্থানে জীবকুল ভালরূপ বর্দ্ধিত হয় না। এই কারণে একজন পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলিতেছেন যে, সে সকল স্থান মানুষের বাসের অযোগ্য গ্রীনল্যাণ্ডে যাহারা বাস করে তাহারা দীর্ঘজীবন লাভ করে না তাহাদের পরমায়ু খুব কম: এবং সাহারার ন্যায় স্থানে থাকিয়া কে বাঁচিতে পারে? নাতিশীত ও নাতুষ্ণ. দেশই মনুষ্যের বাসের যোগ্য। কিন্তু সেরূপ দেশ কোথায়? প্রায় সকল দেশেই কোন সময় অতি শীত এবং কোন সময় অতি উষ্ণ হইয়া থাকে। অতি শীত এবং অতি উষ্ণতা বশতঃ প্রাকৃতিক বিপর্য্যয় অনিবার্য্য; সেই হেতু মানুষের দেহও বিপর্য্যয় অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহার উপর আহারাদির অনিয়ম হওয়ায় এবং প্রকৃতিবিরুদ্ধভাবে থাকায় দেহটী আরও বিকৃতভাবাপন্ন হয়। শীত এবং উষ্ণের সমতা হইলে যেমন প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়টী দূর হইয়া যায়, সেইরূপ দেহের মধ্যে শীতোষ্ণ সমভাবে রক্ষিত হইলে দেহের

কোন প্রকার বিপর্য্যয় হইতে পারে না। সুতরাং যে যে ক্রিয়া দ্বারা দেহের মধ্যে শীতোষ্ণ সমভাবে রক্ষিত হয় তাহাই করিতে হইবে। ভাপ্‌ড়ায় উক্ত দুইটী হেতু সমভাবে পাওয়া যায় এবং উহাদের সাম্যভাব ঐ প্রক্রিয়াতে দেহের মধ্যে সম্যকরূপে রক্ষিত করিতে পারে বলিয়া একমাত্র ভাপ্‌ড়াই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম ঔষধ। আমরা সমস্তজীবন যে প্রণালীতে স্নান করিয়া থাকি, তাহাতে শৈত্য ক্রিয়াই অতি মাত্রায় করা হইয়া থাকে। অনেক লোক দেখিতে পাই, তাহারা ঘর্ম্মাক্ত কলেবর সহ্য করিতে পারে না; ঘর্ম্ম হইলেই শৈত্য ক্রিয়া দ্বারা তাহা বন্ধ করিবার চেষ্টা করে। কেহ কেহ দুইবার, এমন কি তিনবারও, অবগাহন স্নান করে, এবং গাত্রে সর্ব্বদা শীতল বাতাস লাগায়, যেন ঘাম না হয়। ঘাম না হইলেই তাহারা সচ্ছন্দতা বোধ করে। প্রত্যহ এই প্রকার অতিরিক্ত শৈত্য ক্রিয়া যতবার করিবে ততবারই দেহের সঞ্চিত শক্তি দেহকে পুনঃ পুনঃ উষ্ণ করিবে; সুতরাং এমন স্নান করিতে হইবে এবং এমন ভাবে থাকিতে হইবে যাহাতে সঞ্চিত শক্তির অতিরিক্ত খরচ না হয়। প্রত্যহ সঞ্চিত শক্তির অতিরিক্ত খরচ হইলে উহা অকালে নিঃশেষিত হইয়া যায়, এবং তাহারই কুফল স্বরূপ অকালে বার্দ্ধক্য বা জরা বা মৃত্যু আসিয়া আক্রমণ করে। অত্যন্ত দুর্ব্বল ও নানা রোগে জড়িত রোগী যদি তলপেট ধৌত করে, তবে সেই ধৌত ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে সঞ্চিত শক্তি ঐ স্থানে সবেগে আসিয়া উত্তাপ যোগাইবে, তাহার ফলে পেটের যন্ত্রের ক্রিয়া ভালরূপে হইবে, এবং তাহা হইলে রোগেরও

উপসম হইবে ; এই মৃদু প্রক্রিয়া দ্বারা শীত ও উষ্ণ সমভাবে রাখা দুর্ব্বলের কর্ত্তব্য। সবল রোগী ভাপড়ায় যে সুফল অল্প সময়ে পাইবে, সেই ফল কিছু বিলম্বে দুর্ব্বল রোগী তলপেট ধৌত করিয়া, অথবা আতপ স্নান (Sun bath) করিয়া, অথবা অঙ্গ মর্দ্দন করিয়া পাইবে। দেহমধ্যস্থিত আবদ্ধ ময়লা নির্গত করাই উক্ত সমুদয় স্নানের একমাত্র উদ্দেশ্য। দাস্ত ও প্রস্রাবের ন্যায় ঘর্ম্ম নির্গত হওয়াও নিতান্ত আবশ্যক। কোন কাজ কর্ম্ম না থাকিলে বাগানে কাজ লইবে ; ক্লান্তি বোধ না হওয়া পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবে, তাহাতে যদি ৬।৭ মাইল পথ ভ্রমণ হইয়া যায়, অতি উত্তম। ফাঁকা মাঠে বা যে রাস্তার দুই ধার জনাকীর্ণ বা জঙ্গলপূর্ণ নয় সেই রাস্তায় বেড়াইবে। নগ্নপদে ভ্রমণ করিবে, কারণ, শরীরস্থ বিষময় পদার্থ বা বদ-রস মৃত্তিকা যেরূপ আকর্ষণ করিয়া লয় সেরূপ কোন ঔষধে হওয়া অসম্ভব, এই জন্যই ঘা, ফোড়া, ক্ষত, ফোলা, জ্বালা, বেদনা প্রভৃতি বহুপ্রকার রোগে মাটির প্রলেপ, বা পুলটিস্ দিতে হয়। সত্যানুসন্ধিৎসু ব্যক্তি নগ্নপদে ভ্রমণ কখনই অপমান সূচক জ্ঞান করেন না। মধ্যে মধ্যে অন্ততঃ একবেলা উপবাসও করিবে ; স্ত্রীসংসর্গ যত কম হয় ততই ভাল ; সংসর্গেচ্ছা উদয় হওয়া মাত্রই কোন প্রকার শারীরিক পরিশ্রম করিলে রিপুটী দমন হইয়া যায় ; অস্বাভাবিক ও অতিরিক্ত আহারের কারণে অতিরিক্ত উত্তেজনা হইয়া থাকে ; গাত্র খোলা রাখার এবং শীতকালে অল্প শীত বস্ত্র ব্যবহারের অভ্যাস দেহের উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত ক্রমে ক্রমে হইয়া যাইবে ;

রাত্রে নিদ্রাকালে ঘরের হাওয়া যাহাতে চলাচল হয় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে; বিশুদ্ধ বায়ু ও শ্বাস প্রশ্বাসে যে যে নিয়ম বলা হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিবে; বায়ু মনুষ্যের প্রধান খাদ্য; ঐ খাদ্যকে সর্ব্বদা বিশুদ্ধ অবস্থায় লইতে হইবে, কিন্তু এমনি স্বার্থপূর্ণভাবে জীবন যাপন করিতে শিখিয়াছ যে, পচা শ্যাওলা বা পত্রাদি বা পচা-জলাভূমি প্রভৃতির দিকে লক্ষ্য করা ত দূরের কথা, নিজের বাটীর পচা নর্দ্দামা ও অপরিষ্কার পায়খানার দিকেও দৃষ্টি কর না; কিন্তু সুস্থ শরীরটী সর্ব্বদা চাও! প্রকাণ্ড একটী পচা ডোবার জলনিকাসের বন্দবস্ত করিয়া স্বদেশবাসীদিগকে মড়করোগ হইতে রক্ষা করিয়া জনৈক পুরাকালের পণ্ডিত ঈশ্বরের ন্যায় আদর ও সম্মান পাইয়াছিলেন। যম মড়করূপদণ্ড প্রহারে উদ্যত, উক্ত পণ্ডিত সেই উদ্যমে বাধা দিয়া মড়ক হইতে দিতেছেন না, এইরূপ চিত্রাঙ্কিত মুদ্রা পর্য্যন্ত তাঁহার সম্মানার্থ প্রচলিত হইয়াছিল! আমাদের শাস্ত্রকার বলেন যে, উচ্চ ভূমির উপর বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিবে। ভূমি উচ্চ হইলে তথায় জল দাঁড়াইতে পায় না। জল দাঁড়াইয়া পচিতে পাইলেই বায়ু দূষিত হইতে থাকে, এবং অসংখ্য দেহধ্বংশকারী রোগের সৃষ্টি হয়। এক লক্ষ মশা, মাছি প্রভৃতি কীট যদি কোন উচ্চ স্থানে অর্থাৎ কোন গিরিশৃঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তবে উক্ত সমুদয় কীটগুলি নিচে আসিয়া পড়িবে, উপরে থাকিতে পারিবে না, কারণ, তাহাদের জীবন ধারণের উপযুক্ত পদার্থ উচ্চ স্থানের বায়ুতে নাই; সমুদ্র হইতে সূর্য্যতাপে উত্থিত বাষ্প যেরূপে

পরিণত হয়, এবং ঐ মেঘ হইতে যে জল পড়ে সেই জলই আম ব্যবহার করি। নদী, হ্রদ, প্রস্রবণ, কূপ, পুষ্করিণী প্রভৃতির জ মেঘজাত। জল মৃত্তিকার উপর পড়িলে নানা পদার্থ সংযো এবং লবণ, গলিত উদ্ভিদ ও জীব শরীরের অংশ এবং কর্দ্দম প্রভৃ সংযোগে দূষিত হয়। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ ভূমির জল হাও নিম্নভূমি অপেক্ষা ভাল থাকে বলিয়া তথাকার স্বাস্থ্যও ভা..। সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য ত্যাগ করিবে, হরীতকী বা ধনে মৌরি ব্যতীত পান সুপারী খয়ের চুণ ও অন্যান্য মসলা মুখে দিও না; অগ্রে এই সমুদয় কর, বসতবাটীতে রৌদ্র এবং বাতাস যাহাতে খেলে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখ; জঙ্গল ময়লা পরিষ্কার কর, দেখিবে চিকিৎসকের নিকট দৌড়াইতে হইবে না, দেখিবে, প্রকৃতি অবাধে আধিপত্য স্থাপন করিবে। তোমার কুপথ্যের ভাণ্ড যোলআনা পূর্ণ দেখিয়াও যিনি অগ্রে তাহা পরিষ্কার না করিতে বলিয়া ঔষধ বিক্রয় করিবেন, তিনি আমাদের শাস্ত্রমতে ঘৃণিত ব্যবসায়ী।" মহাশয় হয়তো বলিবেন, "ঔষধ না খাইলে মরিয়া যাইব, রোগের এমন গুরুতর অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, ঔষধ না হইলেই নয়"। এরূপ গুরুতর অবস্থায় পূর্ব্বোক্ত ব্যবস্থাই মহৌষধের কার্য্য করিবে; যে ভাবে চলিয়া প্রাকৃতিক বিপর্য্যয়টী আনয়ন করিয়াছেন, ঠিক তাহার বিপরীত ভাবে চলিলেই প্রাকৃতিক সামঞ্জস্য হইবেই হইবে। রোগীর মন বুঝাইবার জন্য অথবা স্বার্থের জন্য ঔষধ প্রয়োগ করা কখনই উচিৎ নয়। ঐরূপ গুরুতর অবস্থায় ঔষধ খাইলে কি হইত

এবং ঔষধ না খাইয়া কি ফল হইয়াছে তাহা পূর্ব্বলিখিত উদাহরণ পাঠে জানিয়াছেন। উদাহরণগুলি পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া দেখুন, প্রচলিত ঔষধের পরিবর্ত্তে কি কি মহৌষধের ব্যবস্থা হইয়া রোগী সকল বাঁচিয়াছিল। সেইরূপ উদাহরণ অনেক আছে, কিন্তু অধিক দিবার স্থান নাই। তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, প্রাকৃতিক নিয়মে থাকিয়া চিকিৎসাই সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম চিকিৎসা। এই নিয়মে থাকিলে আপনি পূর্ব্ব হইতেই সতর্ক রহিলেন, আপনার নিকট রোগ আসিতেই পারিবে না। আর যদি আপনি ঐ নিয়মগুলি উপেক্ষা করেন, ধরুন, প্রত্যহই দাস্তের প্রতি অবহেলা করিয়া যাইতেছেন, স্বাভাবিক দাস্ত হইতেছে না, তথাপি তাহাকে স্বাভাবিক করিবার জন্য কোনই চেষ্টা করিতেছেন না। প্রত্যেক নিয়ম অবহেলা করতঃ ক্রমাগত ঔষধ খাইয়া নেশার জোরে শরীরস্থ যন্ত্রগুলিকে জবরদস্তি কাজ করাইতেছেন, এবং পূর্ব্ববৎ আহার বিহারের কুঅভ্যাস ষোলআনাই বজায় আছে, বলুন দেখি আপনি ব্যারামকে উপেক্ষা করিয়া, মনকে চোখঠারার মতন চিকিৎসক-দত্ত ঔষধ খাইয়া, উহাকে প্রশ্রয় দিতেছেন কি না? রোগ অনবরত প্রশ্রয় পাইয়া শরীরে এমন বিষ সঞ্চার করিতেছে যে, হয় আপনাকে অকস্মাৎ এক দিনের ব্যারামে মরিতে হইবে, অথবা রোগ এমন কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে যাহাতে জীবন্মৃত হইয়া টিকাইয়া টিকাইয়া অশেষ যন্ত্রণা পাইয়া মরিতে হইবে! অতএব পূর্ব্বোক্ত নিয়মগুলি পালন করিয়া সর্ব্বদা সতর্ক থাকা ভাল, না, ব্যারামকে এবং

ব্যারামের সমস্ত কারণগুলিকে উপেক্ষা করিয়া ঔষধ খাওয়া ভাল? প্রাকৃতিক নিয়মের চিকিৎসা দাস্তর প্রতি লক্ষ্য করিয়া হয়; কিন্তু প্রচলিত প্রণালীর চিকিৎসা একটী ব্যারাম দস্তর মত আক্রমণ করিলে, তাহার লক্ষণের উপর লক্ষ্য করিয়া হয়। কোনটী ভাল তাহা বিচার করুন। এক মাত্র দাস্তই স্বাস্থ্যের মূল। দাস্ত যাহাতে ঠিক স্বাভাবিক থাকে সেইরূপ করিয়া ভাল থাকা ভাল, না, দাস্তর প্রতি অবহেলা করিয়া রীতিমত একটা ব্যারাম সৃষ্টি করিয়া তাহার ডাল পালায় ঔষধ দেওয়া ভাল? পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছে, কেবল দাস্তর প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য করতঃ সেইরূপ প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যবস্থা করিয়া অনেক দুরারোগ্য ও হতাশ রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছে। কোন্ মূল মন্ত্রটী ভাল? আজকালকার চিকিৎসকগণ একটী ব্যারাম শাখা প্রশাখাসহ না বাড়িলে বলিতে পারেন না, কি ব্যারাম হইয়াছে; এবং অনেক স্থলে রোগীর মৃত্যুর পরও রোগ সম্বন্ধে তর্ক বিতর্ক করেন, প্রত্যেকেরই মত বিভিন্ন; রোগী মরিয়া উহার হাড় জুড়ায়, চিকিৎসকগণ তর্ক বিতর্ক করিতে থাকেন! কিন্তু প্রাকৃতিক চিকিৎসক ব্যারামের অঙ্কুর হইবা মাত্রই উহা জানিতে পারিবেন এবং তদনুরূপ ব্যবস্থাও করিতে পারিবেন। কাহার মত অনুসরণ করা ভাল?

একটী লোকের শরীর খুব ভাল। বাতির ন্যায় মল বিনা কুন্থনে বাহির হইয়া যায়। তাহার একদিন একটু পাতলা দাস্ত হইল, এবং মলদ্বার অপরিস্কৃত হইল, অথবা কোষ্ঠবদ্ধ হইল।

প্রাকৃতিক চিকিৎসক তৎক্ষণাৎ জানিলেন যে, ব্যারামের অঙ্কুর হইতেছে, ব্যবস্থা করিয়া আহারাদির নিয়ম বলিয়া দিলেন, সে তাহা শুনিল না; ২।১ দিন বা ২।১ মাস অথবা ২।১ বৎসর পরে শরীর একটু কম জোর বোধ করিল। প্রাকৃতিক চিকিৎসকের কথা না শুনিয়া তাহার নিজের মনমত চিকিৎসকের নিকট গেল; ঔষধ দাম দিয়া কিনিল, খাইয়া মাতালের ন্যায় কাজ করে, এবং পরে ক্রমে ক্রমে যে অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শরীর এক্ষণে নানা ব্যাধির মন্দির হইয়াছে। এখন হতাশ হইয়া আবার প্রাকৃতিক চিকিৎসকের ব্যবস্থা লইয়া ভাল হইতেছে। আপনার হাঁপানি অথবা অজীর্ণ হইয়াছে, হজম হয় না, পাতলা দাস্ত হয়, স্বাভাবিক দাস্ত এক দিনও হয় না, হজমশক্তি এত কম যে, যাহাই আহার করেন না কেন, পাত্‌লা দাস্ত বা অস্বাভাবিক দাস্ত আপনার কিছুতেই যাইতেছে না। এ অবস্থায় তেল বা ধাতু ঘটিত ঔষধ দেওয়া কি যুক্তি সংগত? অথবা পুঁথিগত বিদ্যানুসারে ঘৃত দুগ্ধ ঘটিত ঔষধ কি দেওয়া ভাল? যে রোগী অতি লঘু আহার ও অতি সামান্য পরিমাণ আহার জীর্ণ করিতে পারে না, পথ্যের কোন নিয়ম মানিয়া চলিতে পারে না, তাহার পাকস্থলীকে ঐরূপ ঔষধ দিয়া আরও বিপর্য্যস্ত করা হয় না কি? ঐরূপ চিকিৎসায় সে আরও শীঘ্র মরে। চিররুগ্ন রোগীগণ ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। কত ক্ষয় রোগ গ্রস্ত এবং জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, বাত প্রভৃতি রোগগ্রস্ত রোগীকে আমি দেখিয়াছি, তাহাদের চিকিৎসা কিরূপ বিপরীত

ভাবে হইয়াছে এবং হইতেছে! রোগীর অগ্নিবল কত এবং কত পরিমাণ আহার এবং কোন্ প্রকার খাদ্য সে জীর্ণ করিতে পারে, এবং কি ভাবে রাখিলে সে ভাল থাকিতে পারে, সে সব দিকে কোন লক্ষ্য নাই; কিন্তু ব্যবস্থা হইতেছে তৈল, অথবা ঘৃত বা ধাতু ঘটিত ঔষধ, এবং গাছ গাছড়ায় প্রস্তুত কোন একটী তেজস্কর ঔষধ, এবং মাংসের যুস প্রভৃতি গুরুপাক খাদ্য! রোগীর হয়তো মলভঙ্গ হইতেছে, এবং উপসর্গ সকল দিন দিন বাড়িয়াই যাইতেছে, তবুও ঐ ব্যবস্থা! রোগীর জীবন ক্রমেই সংশয়াপন্ন হইতেছে তবুও ব্যবস্থার দোষ কেহ দিবে না, সে দিকে কাহারও দৃষ্টি পড়িবে না! ব্যবস্থায় কোন উপকার হইতেছে না তাহাও চিকিৎসক হয়তো বুঝিয়াছেন, তবুও তিনি রোগীকে মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ ব্যবস্থাই দিবেন! ইহাকে কি চিকিৎসা বলিবেন, না, বীভৎসকাণ্ড বলিবেন? এ সকল ক্ষেত্রে কেবলমাত্র পথ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া আমাদের দেশে কি চিকিৎসা করা যায় না? এবং তাহাতে উপকার দেখাইয়া রোগীর মনে কি সাহস উৎপাদন করা যায় না? তাহা যদি না পারেন তবে এ সকল ক্ষেত্রে বীভৎস প্রকারের ব্যবস্থা দিয়া মৃত্যুকে ডাকিয়া আনা অপেক্ষা রোগীকে জবাব দেওয়াই শতগুণে ভাল; কারণ, তাহাতে আত্মনির্ভরতা আসিয়া অনেক স্থলে উপকার হইতে পারে; এবং তদ্দ্বারা প্রাকৃতিক চিকিৎসার অনেক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইতে পারে। পাশ্চাত্য ভূমণ্ডলে প্রাকৃতিক চিকিৎসার জন্মদাতাগণ চিকিৎসক কর্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াই এই নূতন

চিকিৎসার তত্ত্বসকল আবিষ্কার করিয়াছেন, যাহা তথায় আজ কাল বড় বড় চিকিৎসকগণ সাদরে অবলম্বন করিতেছেন, এবং ঐ মতে চিকিৎসা করিয়া কত শত রোগীকে আরোগ্য করিতেছেন। উপরোক্ত বীভৎস প্রকার চিকিৎসায় থাকিয়া মরিতে পড়িয়াছে এরূপ রোগীও প্রাকৃতিক নিয়মে থাকিয়া ভাল হইয়াছে। ঘাড়ে বেদনা হইলে, কোন স্থানে ক্ষত হইলে অথবা কাটিয়া গেলে সেই স্থানে কত ঔষধ প্রয়োগ এবং কত প্রকার গুরু ও পুষ্টিকর আহারের ব্যবস্থা চিকিৎসকগণ করিয়া থাকেন, অতিশয় জখম হইলে সে অঙ্গটী একেবারে কাটিয়া ফেলিয়া কতই যাতনা দিয়া রোগীকে চিকিৎসা করেন। কিন্তু বিনা যাতনায়, বিনা ব্যয়ে, কেবল শীতল জলের পটি অথবা মৃত্তিকার প্রলেপ এবং উপবাসে অথবা অতি লঘু আহারে, তদপেক্ষা কত যে শীঘ্র আরাম করা যায় এবং এই প্রণালী সম্পূর্ণ প্রকৃতি অনুযায়ী, এবং প্রচলিত প্রণালী কেন প্রকৃতি-বিরুদ্ধ, এ সকল রোগেও গুরু ও পুষ্টিকর ও উত্তেজক খাদ্য ব্যবস্থা করিলে কিরূপে তাহা ক্ষত স্থান উত্তেজিত করিয়া আরোগ্য লাভে বিলম্ব ঘটায় তাহার একটী করিয়া উদাহরণ দিতে পারিলে, এবং স্ত্রীলোকদের কত শত ব্যাধি বিনা যাতনায় ও লজ্জাশীলতার কোনরূপ হানি না করিয়া, এবং রোগ পরীক্ষার যন্ত্রণা ও লাঞ্ছনা না দিয়া কিরূপে এই প্রাকৃতিক নিয়মে নির্দ্দোষরূপে আরোগ্য হয় তাহারও একটী করিয়া দৃষ্টান্ত দিতে পারিলে বড়ই মন মুগ্ধকর হইত, কিন্তু পুস্তকের কলেবর বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে, সে সকল

উদাহরণ দিতে গেলে অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া পড়িবে। পুনশ্চ, আব, মাংসবৃদ্ধি যাহা চিকিৎসকগণ অসাধ্য বলিয়া ছাড়িয়া দেন তাহাও এ প্রণালীর চিকিৎসায় আরাম হইয়াছে। সূচীপত্র দিয়া প্রত্যেক ব্যারাম উল্লেখ করা এবং তাহার চিকিৎসা ও উদাহরণ এই সমুদয় এ সংস্করণে স্থানাভাবে হইয়া উঠিল না। এবং তৎসমুদয়ের উল্লেখও নিস্প্রয়োজন বিবেচনা করিতেছি; কারণ, যাহা বলা হইয়াছে তাহাতেই প্রত্যেক রোগের চিকিৎসা প্রদর্শিত হইয়াছে।

এক্ষণে প্রার্থনা এই, কেহ যেন পরের হাতে প্রাণ সঁপিয়া না ঠকেন। অন্যান্য বিষয়ে ঠকিলে তাহার পূরণ হইতে পারে, কিন্তু প্রাণের উপর দাগা লাগিলে তাহার পূরণ হওয়া বড়ই কঠিন। ত্রিশ বৎসর এইরূপ ঠকিয়াছি। যে চিকিৎসক উপরোক্ত রূপে উপদেশ দিয়া বলিবেন,—"সামান্য পীড়াই হউক বা কঠিন পীড়াই হউক, হাপানি হউক বা অর্শই হউক, তিনটীর উপর দৃষ্টি রাখিবে। (১) প্রতিগ্রাস একশত বার চর্ব্বণ করিয়া মুখের দলাকে মাখনবৎ নিস্পেষিত করিয়া এবং উহাকে সম্পূর্ণরূপে আস্বাদবিহীন করিয়া গলাধঃকরণ করিবে; (২) আহারের সময় জলপান করিবে না, এবং (৩) দাস্ত স্বাভাবিক যাহাতে হয় তাহার চেষ্টা অনবরত করিবে, অর্থাৎ তজ্জন্য উপবাসাদি ও পূর্ব্বলিখিত আহারাদির নিয়ম পালন করিবে। ইহাতে সামান্য সর্দ্দিবোধ বা মাথাধরা, বা সামান্য জ্বর হইতে আরম্ভ করিয়া অতি কঠিন রোগ পর্য্যন্তও ভাল হইবে।" সেই চিকিৎসকের নিকট আপনি কখনও

প্র[illegible]ত হইবেন না। আর যে চিকিৎসক আপনাকে (রোগা[illegible]) পাইবা মাত্র তিন চারিটী ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন বা বিক্রয় করিলেন, অথচ যে বিহিত পথ্যের উপর সমস্ত শুভ ফল নির্ভর করিতেছে, সেই বিহিত পথ্য বিষয়ে কিছু মাত্রই উপদেশ দিলেন না; আপনিও কেবল ঔষধের গুণগুলি শুনিয়া মোহিত হইলেন, এবং ক্রয় করিয়া যেই সেবন করিতে লাগিলেন, জানিবেন অমনি আপনি এক মহাজালে জড়িত হইলেন! উদ্ধার হওয়া বড়ই কঠিন! চ্যবনপ্রাশের অতি চমৎকার গুণ, কিন্তু কিছুকাল যাবৎ চ্যবনমুনির মত না হইতে পারিলে উহা আপনার পক্ষে সুধা না হইয়া গরল হইবে, শিবতুল্য হইয়া থাকিতে না পারিলে হলাহল বা বজ্রসম বটিকা কি আপনার আমার মত লোক সহ্য করিতে পারে? ও সকল আমাদের অসংযত দেহে মুষলের ন্যায় কার্য্য করিবে। তখন আপনি বলিবেন, ঔষধ খাঁটি নয়, চিকিৎসক ভাল নয়, সময় ভাল নয়, কপাল ভাল নয়, অথবা পরমেশ্বর ভাল নয়, প্রভৃতি কত কথাই বলিবেন; মানিলাম সমস্তই সত্য, কিন্তু আপনি নিজে পথ্য বিষয়ে কতদূর খাঁটি তাহা যতদিন না জানিবেন ততদিন ঐরূপ চিকিৎসা বিভ্রাটে পড়িয়া থাকিবেন! অনেক রোগীকে আমি দেখিয়াছি, তাহারা তাহাদের দেহে রোগের অস্তিত্বই স্বীকার করে না; রোগের সামান্য অর্থাৎ অঙ্কুর অবস্থা যাহা অস্বাভাবিক দাস্তে বিশেষরূপ লক্ষিত হয় সেই সামান্য অজীর্ণ রোগের ত কথাই নাই, উহা উপেক্ষিত হইয়া একটা বড় রকম রোগ হইলে তাহারও অস্তিত্ব সহজে স্বীকার করে না, অথচ চিকিৎসকের নিকট বসিয়া কতই আবদারের কথা বলে, ইহা এক বিষম বিভ্রাট! একজনের অর্শ রোগ হইয়াছে, অজীর্ণ দোষ বারবার কত হাজারবার উপেক্ষা করিয়া রোগটী আনয়ন করিয়াছে, এ কথা কিছুতেই আমি তাহাকে স্বীকার করাইতে

পারি নাই। অজীর্ণ দোষের কথা বলিলেই অথবা জীর্ণ উপেক্ষিত হইয়া অর্শটা হইয়াছে এ কথা বলিলেই, রাগ করিয়া বলে,—"আমি খুব হজম করিতে পারি"। একজনের মাজায় ব্যথা হইয়াছে, যদি বলিলাম অজীর্ণ দোষের দিকে একটু লক্ষ্য করুন, তিনি তাহা করিবেন না, অথচ প্রত্যহই চিকিৎসককে জিজ্ঞাসা করিবেন, "কিসে মাজার ব্যথা যাবে?" একজনের চক্ষুরোগ হইয়াছে, জিজ্ঞাসা করিলাম, "দাস্ত স্বাভাবিক হয় কি"? তিনি বিরক্ত হইয়া উত্তর দিলেন, "দাস্তর সঙ্গে চক্ষুরোগের সম্বন্ধ কি"? সকল রোগের মূল হইল পরিপাক শক্তির হীনতা, এবং সকল রোগের চিকিৎসাও হইল পরিপাক শক্তি রক্ষা করা; এ কথা কেহ বুঝিবে না। মনে এবং জ্ঞানে সর্ব্বরকমে আপনার চিতার আয়োজন আপনিই স্বহস্তে করিতেছে তাহা দেখাইয়া দিলেই ক্রোধ অথবা বিরক্তি প্রকাশ করিবে। নিজে দেখিবে না, দেখাইয়া দিলেও তাহা দেখিবে না, তবে কি চিতায় শয়ন করিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া দেখিবে? এই সকল বিভ্রাট বিশেষরূপ বুঝিয়া এবং হৃদয়ঙ্গম করিয়া যে দিন চিকিৎসক প্রাকৃতিক নিয়মে রোগীকে চিকিৎসা করিবেন, এবং যে দিন রোগীও চিকিৎসকের নিকট গিয়া "একটা ঔষধ দেন" এ কথা না বলিয়া বলিবে "এই এই অসুখ হইয়াছে, বলিয়া দেন কি করিলে ভাল থাকিব" সেই দিন, এবং যে দিন চর্ব্ব্য খাদ্য চর্ব্বণ না করিয়া ভোজনকে বিষ ভোজন মনে করিবে সেইদিন, এবং যে দিন স্বাস্থ্য বিষয়ের চিন্তা প্রত্যেকের হৃদয়ে সর্ব্বোচ্চস্থান অধিকার করিয়া তথা হইতে অন্যান্য বৃথা চিন্তা ও তুচ্ছ আন্দোলন সকলকে ফুৎকারে উড়াইয়া দিবে সেই দিন, এবং যে দিন রোগ হওয়াটাই একটা লজ্জার কথা বলিয়া পরিগণিত হইবে, সেইদিন এই উপদেশ সমুদয়ের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

সমাপ্ত।